সাহাবায়ে কেরামের মতভিন্নতায় উম্মাহর করণীয়

মুশাজারাতে সাহাবা

ইমরান রাইহান

অর্পণ ০২

আবদুল্লাহ আল মামুন

কিছু মানুষ থাকেন আড়ালে, তারা আড়াল থেকেই প্রেরণা জোগান, উৎসাহ দেন, পথ বাতলান। তারা কখনো সামনে আসেন না, সাফল্যের ভাগ দাবি করেন না। আমার জীবনে এমন একজন মানুষ আপনি।

২০১৫ সাল থেকে কতবার আপনার সাথে আলাপ হয়েছে, আমাকে লেখালেখি করার প্রেরণা জুগিয়েছেন, বিভিন্ন প্রকাশকের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছেন, নতুন নতুন বইয়ের সন্ধান দিয়েছেন, কিন্তু কখনো সামনে আসেননি। আপনার জন্য ভালোবাসা। যেখানেই থাকুন, ভালো থাকুন।

📖

সূচিক্রম

ভূমিকা

এক.

সাহাবায়ে কেরামের ইজতিহাদভিত্তিক মতভিন্নতা ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে অবধারিত। কোনোরূপ দ্বিধা ছাড়া এ কথা অকপটে বলা যায়, পারতপক্ষে কোনো সাহাবির অন্তঃকরণে বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিল না, মুসলিমদের মাঝে অনাকাঙ্ক্ষিত অনাহুত কোনো হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটুক, কিংবা তারা একে অন্যের রক্তে রঞ্জিত হোক! বরং তাঁরা সকলে আপন জায়গা থেকে সাধ্যমতো চেষ্টা করেছিলেন, যেন অযথা রক্তপাত না হয়, এবং যথাসাধ্য যুদ্ধ এড়ানো যায়। কিন্তু যদি আরশে আজিমে পূর্ব নির্ধারিত কোনো ফায়সালা থেকে থাকে, তাহলে কী-ই বা আছে করার, এবং কার-ই বা সাধ্য আছে তা খণ্ডাবার?

দুই.

মনে রাখতে হবে, ঐতিহাসিক বর্ণনা আমাদেরকে কেবল কিছু তথ্য দেয়, কিছু ব্যাপারে ধারণা দেয়। প্রকৃতপ্রস্তাবে কী হয়েছিল বা ঘটেছিল, তা পুঙ্খানুপুঙ্খ জানা কেবল আলিমুল গাইব মহান আল্লাহর অধিকার। কোনো বান্দার সাধ্য নেই, এ ব্যাপারে পুঙ্খানুপুঙ্খ হুবহু জ্ঞান লাভ করার, বা এই দাবি করার যে, সে এ ব্যাপারে সবকিছু জানে। বান্দা সর্বোচ্চ তার স্বচক্ষে দেখা বা বিশুদ্ধ বর্ণনামতে প্রাপ্তজ্ঞানটুকুই বলতে পারে, এর বেশি না। এরপরও কত ভুল হয়ে যায়! কারণ, মানুষ তার সীমাবদ্ধতার কারণে আপন সময়ে-ই জগতের সবকিছু হুবহু বলতে পারে না। তাহলে কী করে হাজার বছর পূর্বে ঘটিত কোনো ঘটনাকে অক্ষরে অক্ষরে বর্ণনা করে, এক পক্ষকে সত্য সাবিত করে, অন্য পক্ষকে মিথ্যা পর্যবসিত করবে! অথচ এ-সংক্রান্ত ঘটনার বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের বাইরে শিয়া, খারিজি, রাফিজি, নাসিবি-সহ একাধিক অনির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী এবং ইসলাম ও মুসলমানদের ধ্বংসের লক্ষ্যে তাদের জালকৃত অসংখ্য মিথ্যা বর্ণনা বিদ্যমান।

তাই পরিমিত শাস্ত্রজ্ঞান, প্রাজ্ঞ আলেমের সোহবত ও আল্লাহ-প্রদত্ত সঠিক দীনি অভিরুচি না থাকলে, যেকোনো বর্গের ভুল-শুদ্ধ যেকোনো বর্ণনাকে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করে, যে কাউকেই ওপরে উঠাবে, নচেৎ নিচে পাঠিয়ে লাঞ্ছিত করবে। অথচ শাস্ত্রজ্ঞান, প্রাজ্ঞ আলেমের সোহবত ও আল্লাহ-প্রদত্ত সঠিক

দীনি অভিরুচিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ, কেবল একান্ত প্রয়োজনে বিশুদ্ধ বর্ণনাগুলো সামনে রেখে জেনে নেয়, আসলে ঘটনা কী ঘটেছিল।

তিন.

প্রসঙ্গ টেনে বলতে হয়, ফিতরাত বা সত্তাগত সত্যগ্রহণের যোগ্যতা যদি কোনো কারণে কারও নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তার পক্ষে সত্যগ্রহণ করা ভারী দুষ্কর হয়ে পড়ে। সত্যের বদলে মিথ্যা, সাদার বদলে কালো তার কাছে অধিক উজ্জ্বল ও শোভন বলে ভ্রম হয়। বান্দার প্রতি আল্লাহর বিশেষ ইহসান এই যে, তিনি তাকে সত্যের প্রতি আজন্ম আকর্ষণ ও মিথ্যার প্রতি নিপাট ঘৃণা, জন্মগতভাবে তার ভেতর সৃষ্টি করে দিয়েছেন। যদি সে এই গুণগুলো কোনো কারণে নষ্ট করে ফেলে, তাহলে তার সত্যগ্রহণ করা হয়ে উঠে না। কারণ সে সত্যগ্রহণে তার মৌল যোগ্যতা বিনষ্ট করে ফেলেছে।

সীমিত সময়ের জন্য অন্য ব্যাপারগুলো বাদ দিয়ে, কেউ যদি শুধু তার ভেতর উপ্ত সত্তাগত সততার যোগ্যতা দিয়ে চিন্তা করে, তাহলে সে কীভাবে মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহর সাহাবিদের নিয়ে জবান দারাজি করতে পারে? তাবৎ পৃথিবী-চষে সে কী তাঁদের অনুরূপ কাউকে দেখাতে পারবে? তাহলে তাঁদের ইজতিহাদভিত্তিক মতভিন্নতার প্রতি সে কীভাবে বিদ্বেষ পোষণ করে? বদগুমান রাখে? এ অসম্ভব! একদম অসম্ভব! চূড়ান্ত অসম্ভব! তার অবচেতন মন ও স্বাভাবিক বোধের স্তর, তাকে এমন করতে দেবে না। সে মুখ খুলতে পারে না। দীনের সামান্য বুঝ, নগণ্য সমঝ আর আত্মমর্যাদাবোধ থাকলে সে এমন করতে পারে না। এই দীনের জন্য সাহাবায়ে কেরাম কোন কুরবানিটা দেন নাই? ইমান আনার পর গোটা জীবনটাই তো তাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলে জন্য বিলিয়ে দিয়েছেন! তো সে সাহাবিদের পারস্পরিক সামান্য উনিশ-বিশ নিয়ে, কোনো দীনপালনে দাবিদার ব্যক্তি মুখ খুলতে পারে, বা পারে কি তার জবান নাপাক করতে?

চার.

ইতিহাস পাঠে আমরা স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার বাইরে ভিন্ন ইঙ্গিতবহ কোনো বর্ণনা দেখলেই হকচকিয়ে যাই, বিহ্বল হয়ে পড়ি! অথচ এ-সংক্রান্ত পাঠের একদম প্রাথমিক ও মোটাদাগের একটি মূলনীতি হলো, খটকাবহ কিছু পেলে শুরুতেই সেটির সততা ও প্রমাণসিদ্ধতা নিয়ে ধৈর্য-সহ আন্তরিকভাবে মূল থেকে যাচাই করার চেষ্টা করা। তারপর ঘটনাটি যে সময়ের, যে পরিবেশের এবং যে অবস্থার, ইত্যাদি সবকিছু বিবেচনা করে দেখা যে, আসলেই উর্দিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে এর বাইরে যাওয়া সম্ভব ছিল কি না, বা বিকল্প কিছু করার সাধ্য ছিল কি না?

তাই বলা হয়, আমরা ইতিহাস পড়ি, কিন্তু সময় পড়ি না, পরিবেশ পড়ি না, অবস্থা পড়ি না, এবং উর্দিষ্ট ব্যক্তির সক্ষমতা-অক্ষমতা বিচার করি না। শুধু পড়ি, আর নিজের বোধের গম্য-অগম্য কোনো ব্যাপারে ফসকরে সিদ্ধান্ত দিয়ে রাখি। নিজের যোগ্যতার বাইরে অন্য সকলের ব্যাপারে ভুল ধরি আর অবান্তর প্রশ্ন করি। বলছি না আমি, ভুলধরা বা প্রশ্নকরা যাবে না। কিন্তু সব বিষয়ে সকলেই ভুল বা প্রশ্ন উত্থাপন করতে থাকলে, পৃথিবীর সাধারণ নীতি-শৃঙ্খলা স্থিতিশীল থাকবে না। কেউ একজন ভুল করলে, তা শোধরানোর পথ এই নয় যে, এর বিপরীতে আরেকটি ভুল করা।

পাঁচ.

হজরত উসমান রাজিয়াল্লাহু আনহুমের শাহাদাতের পর, মুসলিম-বিশ্বে যে অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছিল, সেটার পূর্ব নজির ছিল না। একবারেই নতুন ও অনাকাঙ্ক্ষিত ছিল ব্যাপারটা। ফলে এ সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের মাঝে ফিকহি ইখতিলাফ থাকাটাই ছিল স্বাভাবিক ও যুক্তিসংগত। যদি পূর্ব থেকেই নিষ্পত্তিকৃত বিষয় হতো, তাহলে দুপক্ষই একমত হতেন, এবং এর সহজ সমাধান বের করে বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তি করতেন।

যেহেতু সংকটটি ছিল সম্পূর্ণ নতুন, এবং পূর্ব থেকে এর কোনো ধারণা ছিল না। তাই খলিফায়ে রাশিদ হজরত আলি রাজিয়াল্লাহু আনহুমের চিন্তা ছিল,

'উসমান রাজিয়াল্লাহু আনহুমের হত্যার বিচার অবশ্যই করা হবে। কিন্তু বর্তমানে রাজনৈতিক যে অস্থিরতা চলছে এর মধ্যে বিচার শুরু করলে অনেক নির্দোষ মানুষকেও হত্যা করা হতে পারে। তাই সবার আগে প্রয়োজন ইসলামি ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা। তারপর সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে অপরাধীদের চিহ্নিত করে শাস্তি দেওয়া।'

জেনে রাখা প্রয়োজন, বিদ্রোহীদের অনেকে পরে তওবা করে হজরত আলি রাজিয়াল্লাহু আনহুমের হাতে বাইআত হয়েছিল। এদের অনেকেই ভুল বুঝেছিল এবং হত্যায় জড়িত ছিল না। ফলে তাদেরকেও ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছিল। তা ছাড়া সাহাবিদের একাংশের ধারণা ছিল, এখন বিচার শুরু করলে ষড়যন্ত্রকারীরা পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে অনেক নিরপরাধ মানুষকেও ফাঁসিয়ে দিতে পারে। তাই উত্তম হবে, তাড়াহুড়া না করে সময় নিয়ে বিষয়টির সমাধান করা।

হজরত আলি রাজিয়াল্লাহু আরও চিন্তা করেন দেখেন, একাধিক কারণে ঠিক এখনই খুনিদের শাস্তি নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। কারণ খুনিরা কয়েক ভাগে বিভক্ত।

❑ আবদুল্লাহ ইবনে সাবা সবসময় পর্দার আড়ালে ছিল। সে কোনো প্রমাণ রাখেনি নিজের কাজের। এ অবস্থায় তাকে নাটের গুরু হিসেবে চিনলেও আইনিভাবে শাস্তি দেওয়া সম্ভব ছিল না।

❑ কিছু মানুষ ছিল নিরপরাধ, অথচ তাদেরকে খুনি বলে প্রচার করা হচ্ছিল। যেমন আমর ইবনুল হামিক ও আবদুর রহমান ইবনু উদাইস।

❑ হত্যাকারীদের অনেকে ঘটনাস্থলেই নিহত হয়, ফলে তাদের শাস্তি দেওয়ার প্রসঙ্গই রইল না। আবার অনেককে চিহ্নিত করা যাচ্ছিল না। ঘটনার সবচেয়ে বড় সাক্ষী ছিলেন উসমান রাজিয়াল্লাহু আনহুমের স্ত্রী নায়িলা ও উসমান রাজিয়াল্লাহু আনহুমের গোলাম। গোলাম তো যুদ্ধ করতে করতে শহিদ হন। অপরদিকে নায়িলা স্বামীকে রক্ষা করার জন্য তার ওপর উপুড় হয়ে পড়েছিলেন। ফলে মরণাঘাত কে করেছিল তা তিনি দেখেননি।

❑ হত্যাকারীদের অনেকে সিরিয়া ও মিশরের সীমান্তে পালিয়ে যায়। এই এলাকাটি আলি রাজিয়াল্লাহু আনহুমের নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল। এমনকি দীর্ঘদিন এটা জানাও যায়নি তারা এখানে অবস্থান করছে।

❑ অনেকে খুন করেনি, কিন্তু বিদ্রোহে জড়িয়েছিল। এদের বড় অংশ আলি রাজিয়াল্লাহু আনহুমের হাতে বাইআত হয়, তাই তিনি চাচ্ছিলেন না কোনো যাচাই-বাছাই ছাড়াই ব্যাপকভাবে সবাইকে শাস্তি দিতে।

আলি রাজিয়াল্লাহু আনহুমের এসব বিষয় সামনে রেখে সিদ্ধান্ত নেন, বিস্তারিত অনুসন্ধান সেরে অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া হবে। অপরদিকে শুধু বিদ্রোহে জড়িত যারা ক্ষমা চাইবে, তাদের মাফ করে বাইআত গ্রহণ করা হবে।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর ঐকমত্যে, সার্বিক বিচারে হজরত আলি রাজিয়াল্লাহু আনহুমের এই সিদ্ধান্ত ছিল, সবচেয়ে বাস্তবসম্মত ও হকের অধিক নিকটবর্তী।

অপরদিকে হজরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহা, তালহা ও যুবাইর রাজিয়াল্লাহু আনহুমের মত ছিল, খেলাফত লাভের পর আলি রাজিয়াল্লাহু আনহুমের দায়িত্ব হলো উসমান রাজিয়াল্লাহু আনহুমের খুনিদের বিচার করা। তিনি যদি এই কাজে বিলম্ব করেন, তাহলে আমরা নিজ হাতে তাদের শাস্তি দেবো। পাশাপাশি তাঁরা এও মনে করতেন, বিদ্রোহে জড়িত সবাই সমান অপরাধী। তাদেরকেও হত্যা করতে হবে। তাঁরা হজরত আলি রাজিয়াল্লাহু

আনহুমের বাইআত ঠিক রেখে শুধু তাঁর একটি সিদ্ধান্তের সাথে দ্বিমত পোষণ করতেন।

অন্যদিকে হজরত মুআবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহুম ও শামবাসীর মত ছিল, আলি রাজিয়াল্লাহু আনহুমের বাইআত নেওয়ার আগে খুনিদের শাস্তি নিশ্চিত করা জরুরি। তাঁরা জানিয়ে দেন, আলি রাজিয়াল্লাহু আনহুম যদি খুনিদের কিসাস কার্যকর করেন, তাহলে তাঁরা বাইআত হবেন, নইলে হবেন না। তারা বাইআতকে শর্তযুক্ত করেছিলেন কিসাস কার্যকরের সাথে।

এর বাইরেও কিছু সাহাবি ছিলেন। তারা এসব ঝামেলা থেকে মুক্ত থেকে নীরব থাকতে পছন্দ করতেন।

এ হলো, হজরত উসমান রাজিয়াল্লাহু আনহুমের হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে সাহাবিদের মতপার্থক্য ও তাঁদের অবস্থান। মনে রাখতে হবে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর সকল ফকিহ, মুহাদ্দিস, মুফাসসির, মুতাকাল্লিম, উসুলবিদ এ ব্যাপারে একমত যে, হজরত উসমান রাজিয়াল্লাহু আনহুমের হত্যাকাণ্ডের মাসআলায় হজরত আলি রাজিয়াল্লাহু আনহুর মতটিই ছিল সত্যের অধিক নিকটবর্তী ও বাস্তবসম্মত। অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম, যাঁরা নিজ নিজ ইজতিহাদের ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করতেন, তারাও ইজতিহাদের কারণে সওয়াবপ্রাপ্ত হবেন, ইনশাআল্লাহ।

তাই আমরা শিয়া-রাফিজিদের মতো আলি রাজিয়াল্লাহু আনহু ও আহলে বাইতের শান-মান বর্ণনা করতে করতে অন্য সাহাবিদের ব্যাপারে অশোভন মন্তব্য করব না। তেমনইভাবে নাসিবিদের মতো অন্য সাহাবিদের মর্যাদা বলতে গিয়ে আলি রাজিয়াল্লাহু আনহু ও আহলে বাইতের নির্লজ্জ বিরোধীও হব না। প্রান্তিকতা ও বাড়াবাড়ির বাইরে ভারসাম্যপূর্ণ সঠিক মতটিই হলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর মত।

মাঝে মাঝে মনে হয়, কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা গাভির অভ্যন্তর দুধ-উৎপত্তির প্রকৃতি বর্ণনা করে যে উপমাটি টেনেছেন, সেটিই যেন আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর দৃষ্টান্ত। একবিন্দু এদিকে গেলে বর্জ্য, একবিন্দু সেদিকে গেলে রক্ত। আর প্রান্তিকতামুক্ত ভারসাম্যপূর্ণ থাকলে খাঁটি দুগ্ধ।

ছয়.

যুগ যুগ ধরে উপরিউক্ত সমাধান ও বিশ্বাসটিই মুসলিম উম্মাহর কাছে স্বীকৃত ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে প্রাচ্যবিদ ও তাদের মানসসন্তানরা, শিয়া, রাফিজি, নাসিবি ও বিদআতিরা স্বীকৃত এ বিষয়টি নিয়ে মুসলিম-সমাজে

নতুন প্রোপাগান্ডা ও সাহাবিদের শানে অশ্লীল ও কটুবাক্যের সয়লাব বইয়ে দিতে লাগল। একে কেন্দ্র করে তারা হাদিস অস্বীকার করে, প্রকারান্তরে গোটা দীন-ইসলামকে বাতিল সাব্যস্ত করতে মরিয়া হয়ে উঠল। যার কারণে আহলুস সুন্নাহর স্বীকৃত মতটি এ অঞ্চলের সাধারণ মুসলিমদের উপযোগী ভাষায় আবার নতুনরূপে তুলে ধরা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ল।

আল্লাহ তাআলা সংকলক মাওলানা ইমরান রাইহানের কলমে বারাকাহ দিন। তিনি যথেষ্ট চৌকান্ন ও হুঁশিয়ারির সাথে এ ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর বিশুদ্ধ মতগুলো বিশ্লেষণপূর্বক তুলে ধরেছেন। আশা করি পাঠক বইখানা হাতে নিলেই বুঝতে পারবেন। পুরো ব্যাপারটিকে তিনি প্রয়োজনীয় সকল দিক উল্লেখ করে বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এ ক্ষেত্রে সমকালীন তিনজন ইতিহাসবিদ মাওলানা ইসমাইল রেহান, ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি ও ড. সুবহ আল বাদ্দাহর রচনাশৈলীকে সামনে রেখেছেন। তাঁদের লেখনী থেকে যথেষ্ট তথ্য-উপাত্ত গ্রহণ করেছেন। এ ছাড়া প্রাচীন ও উৎসগ্রন্থসমূহ থেকেও প্রচুর পরিমাণে উদ্ধৃতি নিয়েছেন। বিশেষকরে *তারিখে তবারি*, *তারিখে খলিফা ইবনু খইয়াত* ও যাহাবির *তারিখুল ইসলাম*-এর কথা তো বলাই যায়। এর বাইরে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের শেষে, আলোচনা সংশ্লিষ্ট সংশয় ও সেগুলোর সমাধান নিয়ে অল্প-বিস্তর আলাপ করেছেন, এবং পুরো ব্যাপারটির যথাসাধ্য হক আদায় করে লেখার চেষ্টা করেছেন। আল্লাহ তাঁর কলমে ও কলবে বারাকাহ দান করুন!

ওয়াহিদুর রহমান

আন্তর্জাতিক ইসলামী
বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম
২৭ রবিউল আউয়াল ১৪৪৪
৮ কার্তিক ১৪২৯
২৪ অক্টোবর ২০২২
রাত ৩টা

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসকে ঘিরে কিছু সংশয় ও তার অপনোদন

ইসলামের সূচনাকাল থেকেই শুরু হয়েছে ইসলামের বিরুদ্ধে তথ্যসন্ত্রাস। মক্কার রাস্তায় নবিজিকে পাগল বলার মাধ্যমে আবু জাহলের দল যে তথ্যসন্ত্রাসের সূচনা করেছিল, পরবর্তী দিনগুলোতে সে ধারা আরও বেগবান হয়েছে। ইউরোপিয়ান রেনেসাঁসের ফলে কুফফার গোষ্ঠী আরও একবার ইসলামের বিরুদ্ধে নিজেদের অন্ধ আক্রোশ মেটানোর সুযোগ পায়। ইসলামচর্চার নামে ইসলামের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করাকে দেওয়া হয় 'জ্ঞানতাত্ত্বিক' রূপ। নির্লজ্জ মিথ্যাচারকে নাম দেওয়া হয় 'গবেষণা'। ওরিয়েন্টালিস্টদের হাত ধরে নানা মিথ্যাচার ও সংশয় ছড়িয়ে পড়ে ইসলামের বিরুদ্ধে। মুসলিম বিশ্বে ওরিয়েন্টালিস্ট প্রভাবিত গবেষকরা এসব মিথ্যাচার গ্রহণ করেন সাদরে। তারাও একেকজন হয়ে ওঠেন তথ্যসন্ত্রাসের অন্যন্য হাতিয়ার।

ইসলামের ওপর যে-সকল আপত্তি ও সংশয় ছড়িয়ে দেওয়া হয়, তার বড় একটি অংশ আবর্তিত হয় ইসলামের ইতিহাস ঘিরে। ইসলামের ইতিহাসের কিছু ঘটনাকে ভুল ব্যাখ্যা ও অপব্যাখ্যার মাধ্যমে মুসলমানদের অন্তরে সংশয় সৃষ্টির চেষ্টা চালানো হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এর সূচনা হয় মৃদুভাবে, ব্যক্তি নিজের অজান্তেই জড়িয়ে যায় বিভ্রান্তির জালে। ইতিহাসের কোনো বর্ণনাকে পুঁজি করে প্রশ্ন তোলা হয়, সাহাবিদের ব্যক্তিত্বের ওপর, তারা কেউ নিষ্পাপ নন বলে ভেঙে ফেলা হয় শ্রদ্ধার প্রাচীর, তারপর স্রোতের মতো ঢুকে পড়ে ইলহাদ ও ইরতিদাদ।

ওরিয়েন্টলিস্ট ও তাদের মানস-সন্তানদের বড় পুঁজি আমাদের অজ্ঞতা। ফিকহ-আকিদা ও ইতিহাসে আমাদের অজ্ঞতা তাদের জন্য তথ্যসন্ত্রাসের কাজটি করে দেয় সহজ। নিজেদের অজ্ঞতার কারণেই সহজে কুফফারদের বক্তব্যে প্রভাবিত হয় মুসলিমসমাজের একাংশ। অনেকে প্রবেশ করে ইরতিদাদের সীমানায়। আধুনিক যুগে প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে নানা অপপ্রচার বেড়েছে, মানুষও সহজে বিভ্রান্ত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে নিজেকে রক্ষার হাতিয়ার হচ্ছে, আকিদা-ফিকহ ও ইতিহাসের সমন্বিত জ্ঞানার্জন। নেককারদের সান্নিধ্য গ্রহণ।

ইসলামের ইতিহাসের ওপর সংশয় ও আপত্তি তোলার জন্য ওরিয়েন্টালিস্ট ও তাদের মানস-সন্তানরা বেশ কিছু মাধ্যম ব্যবহার করে। এই মাধ্যমগুলো সম্পর্কেও যথেষ্ট জানা থাকা প্রয়োজন।

১। মিথ্যা ইতিহাস নির্মাণ

ওরিয়েন্টালিস্টদের একটি বড় অস্ত্র হলো মিথ্যা ইতিহাস নির্মাণ। যে ঘটনা কখনো ঘটেনি তা তারা নির্মাণ করে কল্পনার মাধ্যমে। তারপর একেই প্রকৃত ইতিহাস বলে চালিয়ে দেওয়া হয়। কখনো কখনো ঐতিহাসিক উপন্যাসের মোড়কে মিথ্যা কাহিনি নির্মাণ করে একেই প্রকৃত ইতিহাস বলে প্রচার করা হয়। গত শতাব্দীতে জুরজি জায়দান, এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ, হাবিব জামাতি তাদের লিখিত বইপত্রে মিথ্যা ইতিহাস নির্মাণ করেছে। এই শতাব্দীতে তারিক আলি, ইউভাল নোয়া হারিরিসহ অন্যরা কাজ করে যাচ্ছে। এদের কেউ সরাসরি প্রাচ্যবিদ আবার কেউ প্রাচ্যবিদদের মানসপুত্র। এভাবে মুসলিম সমাজে প্রবেশ করছে মিথ্যা ইতিহাস, অনেকে তা গ্রহণ করছে বাছবিচার না করেই। মিথ্যা ইতিহাস প্রচারের জন্য রচিত হচ্ছে বইপত্র, কাজে লাগানো হচ্ছে মিডিয়াকে।

২। ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা

মুসলিম অধ্যুষিত বেশিরভাগ রাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থা হলো সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থা। এই শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলাম ও ইসলামের ইতিহাস বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হলেও তা পড়াচ্ছে সেক্যুলার কিংবা সেক্যুলার চিন্তায় প্রভাবিত শিক্ষকরা। ফলে তাদের আলোচনায় কিংবা লেখায় ফুটে উঠছে সেক্যুলার চিন্তার প্রতিফলন। ইসলামের ইতিহাস হারাচ্ছে তার আবেদন ও রুহানিয়াত। শিক্ষকদের মাধ্যমে প্রভাবিত হচ্ছে শিক্ষার্থীরাও। তাই ইসলামিক স্টাডিজ কিংবা ইসলামের ইতিহাস পাঠ করেও তাদের জীবনযাত্রায় আসছে না কোনো পরিবর্তন। চিন্তার জগৎও আচ্ছন্ন হয়ে থাকছে পশ্চিমা বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনায়।

সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থার বড় সমস্যা হলো, পূর্ববর্তী ইতিহাসবিদদের লেখার ধরন ও শৈলী সম্পর্কে অজ্ঞতা। ইতিহাসবিদরা তাদের লেখার ক্ষেত্রে কোন নীতি সামনে রেখেছিলেন, তা না জেনেই তাদের সকল বর্ণনা গ্রহণ করে ফেলা হয়। ইমাম তবারির কথাই ধরা যাক। একজন দক্ষ ইতিহাসবিদ হিসেবে তিনি পরিচিত। অনেকেই *তারিখুত তবারির* যেকোনো বর্ণনা সামনে পেলে তা গ্রহণ করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। অথচ ইমাম তবারি তার গ্রন্থের ভূমিকাতেই লিখেছেন,

> ‘আমার এই গ্রন্থে এমন কিছু বর্ণনাও আছে যা পাঠক পছন্দ করবে না, শ্রোতারাও গ্রহণ করবে না। এর সত্যতা ও বিশুদ্ধতা নিয়ে তারা প্রশ্ন

> তুলবে। তাহলে জেনে রাখুন, এসব বর্ণনা আমাদের পক্ষ থেকে নয়, বরং আমাদের কাছে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে আমরা সেভাবে উদ্ধৃত করেছি শুধু।'[১]

ইমাম তবারি স্পষ্টতই জানাচ্ছেন, তাঁর বর্ণিত সকল ইতিহাস বিশুদ্ধ নয়। বাস্তবতাও এমনই। তিনি শুধু নির্দিষ্ট বিষয়ে সকল তথ্য জমা করেছেন। নির্দিষ্ট কোনো তথ্যকে প্রাধান্য দেননি। যেমন *তারিখুত তবারিতে* আবু মিখনাফের ৫৮৫টি বর্ণনা আছে। অথচ একজন মিথ্যুক রাবি হিসেবে সে সবার কাছে পরিচিত। এভাবে সাইফ বিন উমর তামিমি ও মুহাম্মদ বিন সায়িব কালবি থেকেও এনেছেন অনেক বর্ণনা যাদের কেউই গ্রহণযোগ্য নন।[২] কিন্তু সেক্যুলার ধারায় এই বিষয়গুলো আলোচিত হয় না। বরং আগ বেড়ে এও বলা যায় যে, তাদের জ্ঞানতত্ত্বে এ ধারার আলোচনার কোনো পদ্ধতিই নেই। ফলত তারা সকল ধরনের বর্ণনাকে এক মান দিয়ে দেয়।

সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি হলো, এর কারণে ইসলামের ইতিহাস পাঠের পদ্ধতি বদলে দেওয়া হয়। দুর্বল করা হয়, ইতিহাস যাচাইয়ের মূলনীতিগুলো। ফলে এখানে যাহাবি ও মাসউদি দুজনের ইতিহাসের মানই ধরা হয় সমান। মিথ্যুক শিয়া রাবিদের বর্ণিত ইতিহাস আর সিকাহ বা নির্ভরযোগ্য রাবিদের বর্ণিত ইতিহাসে করা হয় না কোনো তফাৎ। ফলে প্রকৃত ইতিহাস আর বানোয়াট ইতিহাস মিশ্রিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। ইসলামের ইতিহাস পাঠে যে সঞ্জীবনী চেতনা জাগ্রত হওয়ার কথা ছিল, তাও হচ্ছে না অর্জিত। মুসলমানদের ইতিহাসের প্রতি সংশয় সৃষ্টির জন্য আরেকটি প্রধান প্রভাবক এই ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা।[৩]

৩। প্রাচ্যবাদী বিশ্লেষণের প্রতি অতিরিক্ত সুধারণা ও আস্থা

মুসলিম সমাজে শিক্ষিত লোকজনের একটি বড় অংশ এখনো ইতিহাস ব্যাখ্যার প্রাচ্যবাদী ধারার প্রতি অতিরিক্ত সুধারণা ও আস্থা রাখেন। তাদের মতে প্রাচ্যবাদীরা সঠিক ইতিহাস বর্ণনা করেন, এবং নিরপেক্ষ ও নির্মোহ বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেন। ফলে ইতিহাসের বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রাচ্যবাদীদের বইপত্র পড়ার বিকল্প নেই।

---

১. *তারিখুত তবারি*, ১/৮

২. এই বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন, *তাহযিবুত তাহযিব*, *মিযানুল ইতিদাল*।

৩. বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনার্স ও মাস্টার্স লেভেলে যে ইতিহাসগ্রন্থ পড়ানো হয় সেগুলো মূলত রচিত হয়েছে পি. কে. হিট্টি, আমির আলি ও প্রমুখের বইয়ের ওপর ভিত্তি করে। এই বইগুলোর বেশিরভাগ লেখকই আরবি জানেন না, ফলে তারা ইতিহাসের মূল উৎস থেকে তথ্য নেওয়ার বদলে ইংরেজিতে রচিত অনির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে তথ্য নেন।

ওরিয়েন্টালিস্টদের মধ্যে দুয়েকজন নিরপেক্ষ গবেষক থাকলেও তাদের বেশিরভাগ নিরপেক্ষ নন। তারা ইসলামি জ্ঞানশাস্ত্রের নানা দিক নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা করেন, ইসলামি জ্ঞানশাস্ত্র বিকশিত করার জন্য নয়, বরং এর ওপর আপত্তি ও সংশয় তুলে দেওয়ার জন্য। তাদের বইগুলো রচিত হয়, আকর্ষণীয় উপস্থাপনায়, তাতে থাকে তথ্যের সমাহার, কিন্তু একইসাথে তাতে থাকে সন্দেহ ও সংশয়ের বিষ। ইসলামি জ্ঞানশাস্ত্র নিয়ে কথিত গবেষণা মূলত একেকটি বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেড, যেখানে তারা কেবলই একজন শত্রু যোদ্ধা। ফলে ইসলামের ওপর আক্রমণের যতগুলো সুযোগ আসে, তার কোনোটিই হাতছাড়া করতে তারা নারাজ। যেমন প্রসিদ্ধ ওরিয়েন্টালিস্ট মন্টেগোমারি ওয়াট (Montgomery watt)[৪] তার লিখিত *মুহাম্মদ এট মক্কা* (Muhammad at mecca) গ্রন্থে লিখেছেন, 'মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হেরা গুহায় যেতেন মক্কার তাপদাহ থেকে বাঁচার জন্য, এর পেছনে ইবাদত বা ধার্মিকতার কোনো কারণ ছিল না।'[৫] (নাউজুবিল্লাহ)

২০০৬ সালে রয় জ্যাকসন (Roy jackson)[৬] নামে একজন ওরিয়েন্টালিস্ট *ফিফটি কে ফিগারস ইন ইসলাম* (Fifty key figures in islam) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাতে তিনি দাবি করেন, সাহাবায়ে কেরামের যুদ্ধাভিযানের উদ্দেশ্য ছিল সম্পদ উপার্জন। যদি সম্পদ উপার্জনের কোনো প্রয়োজনীয়তা তাদের না থাকত, তাহলে তারা আরবের সীমানার বাইরে যেতেন না।[৭]

মাইকেল এইচ হার্ট (Michael H. hart)-এর[৮] কথাই ধরা যাক। তার লিখিত *দ্যা হান্ড্রেড* (The ১০০) বইটি এখনো মুসলিম সমাজের অনেকে আগ্রহভরে পাঠ করে। এমনকি নবিজির নবুয়তের দলিল দিতে গিয়েও অনেকে এই বইয়ের উদ্ধৃতি দেন। অথচ এই বইয়ের শুরুতেই নবিজির চরিত্র বিশ্লেষণ করা হয়েছে সেক্যুলার

---

৪. ডব্লিউ মন্টেগোমারি ওয়াট W. Montgomery watt–এর জন্ম ১৯০৯ সালে স্কটল্যান্ডে। দীর্ঘসময় তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি *মুহাম্মদ এট মক্কা* ও *মুহাম্মদ এট মদিনা* নামে দুটি গ্রন্থ রচনা করে বেশ প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। ২০০৬ সালে তিনি মারা যান।

৫. *মুহাম্মদ এট মক্কা*, ১০২

৬. রয় জ্যাকসন Roy jackson–এর জন্ম ১৯৬২ সালে। বর্তমানে তিনি ইউনিভার্সিটি অব গ্লস্টারশায়ারে ধর্ম ও দর্শন বিভাগে অধ্যাপনা করছেন।

৭. *ফিফটি কি ফিগারস ইন ইসলাম*, ৬৭

৮. মাইকেল এইচ হার্ট Michael H. hart–এর জন্ম নিউ ইয়র্কে, ১৯৩২ সালে। তিনি প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করেন। ১৯৭৮ সালে তিনি *দ্যা হান্ড্রেড* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যেখানে ইতিহাসের বিখ্যাত ১০০ মানুষের জীবনী তুলে ধরা হয়। প্রকাশের পর বইটি সাড়া ফেলে। অল্পদিনেই এর ৫ লক্ষ কপি বিক্রি হয় এবং নানা ভাষায় বইটি অনুবাদ হয়। এই বইয়ের প্রথম স্থান নবিজি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেওয়ায় মুসলিম সমাজেও বইটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

মাপকাঠিতে। এই বইয়ে এক নাম্বার স্থান নবিজিকে দেওয়া হলেও ১০০ শ্রেষ্ঠ মানুষের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, চেংগিস খান ও হিটলারের মতো খুনিদেরকেও। এই বইয়ে লেখক ভালো মানুষ ও অপরাধীর কোনো তফাত করেনি, যোগ্য-অযোগ্যের ভেদ করেনি।

আলোচনা দীর্ঘ হওয়ার আশঙ্কায় একটি উদাহরণ দিয়েই আলোচনা শেষ করতে হচ্ছে। ওরিয়েন্টালিস্টদের প্রায় সবার লেখাই এমন বিষে পরিপূর্ণ। তারা নিরপেক্ষ নন, বরং তারা বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেডের একেকজন ক্রুসেডার। তাদের লেখা পাঠে ইসলামের প্রতি জ্ঞান দৃঢ় হওয়ার বদলে সৃষ্টি হয়, নতুন নতুন সংশয়।

৪। ভ্রান্ত ফিরকাদের কর্মতৎপরতা

বিভিন্ন বাতিল ফিরকা তাদের নিজেদের স্বার্থে নানা সময় ইতিহাস বিকৃত করে। যেমন শিয়াদের একটি বড় অংশ বাগদাদ পতনের ইতিহাস বিকৃত করে ইবনুল আলকামির অপরাধ আড়াল করে। কেউ কেউ তৈমুর লং কিংবা চেংগিস খানের জুলুম-অত্যাচার আড়াল করে। ভারতে হিন্দুত্ববাদী শক্তি মুসলিম শাসনের ইতিহাস বিকৃত করে এবং মুসলিম শাসকদের চরিত্রে কালিমা লেপন করে।

প্রখ্যাত মিশরীয় লেখক মাহমুদ ইসমাইল محمود إسماعيل [৯] তার লিখিত *আল-হারাকাতুস সিররিয়্যাহ ফিল ইসলাম* الحركات السرية في الإسلام। গ্রন্থে দাবি করেছেন, বিভিন্ন সশস্ত্র ফিরকা যেমন ইসমাইলি, কারামেতা, খাওয়ারিজ, জাঞ্জ, উবাইদি ইত্যাদির জন্ম হয়, সমাজে চলমান জুলুম, বেইনসাফি ও অন্যায় প্রতিরোধে। তারা ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করতে থাকে।[১০]

বলাবাহুল্য, মাহমুদ ইসমাইলের এমন দাবির পক্ষে, কোনো ঐতিহাসিক দলিল-প্রমাণ নেই। এই দলগুলো ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেনি, উলটো তারা সমাজে অস্থিরতা, বিশৃঙ্খলা ও অন্যায় ছড়িয়েছে। নিরপরাধ মানুষের রক্তে নিজেদের হাত রাঙিয়েছে। ইতিহাসের সকল তথ্যপ্রমাণ এদিকেই নির্দেশ করে। তবু মাহমুদ ইসমাইল নিজের ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাসের কারণে তাদের প্রতি পক্ষপাত করেছেন।

এভাবে বাতিল আকিদাপন্থী লেখকের কারণেও ইতিহাস বিকৃত হয় এবং বিশুদ্ধ ইতিহাসের প্রতি সংশয় সৃষ্টি হয়।

---

৯. মাহমুদ ইসমাইলের জন্ম ১৯৪০ সালে। তাকে ইসলামের ইতিহাস ও সভ্যতা বিষয়ের একজন গবেষক বলে গণ্য করা হয়।

১০. *আল-হারাকাতুস সিররিয়্যাহ ফিল ইসলাম*, ১২-১৬

৫। নাটক, সিরিয়াল ও সিনেমাকে ইতিহাস শেখার বিশ্বস্ত মাধ্যম মনে করা

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ঐতিহাসিক নাটক, সিরিয়াল ও সিনেমা নির্মাণের প্রবণতা বেড়েছে। সামান্য একটু ইতিহাসের উপাদান আর স্বাধীন কল্পনা দিয়ে নির্মিত হচ্ছে এসব সিরিয়াল, সিনেমা। এসব সিরিয়াল-সিনেমায় ইতিহাসের নির্দিষ্ট কোনো অংশ কিংবা ঐতিহাসিক কোনো চরিত্রের জীবন চিত্রায়ণ করা হচ্ছে। একে সত্য ইতিহাস মনে করে লুফে নিচ্ছে অনেকে।

এসব সিরিয়াল-সিনেমায় বিকৃত করা হচ্ছে ইতিহাস, ঐতিহাসিক চরিত্রের উপস্থাপন করা হচ্ছে ভিন্নভাবে। ফলে প্রকৃত ইতিহাস ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। মানুষ জানছে ভুল ইতিহাস ও ভুল তথ্য। ভুল মাধ্যম থেকে ইতিহাস শেখার কারণেও ইতিহাসের প্রতি সংশয়-সন্দেহ তৈরির প্রবণতা বাড়ছে।

সংশয়ের প্রতিকার

১। ইসলামের ইতিহাস-দর্শন অনুধাবন ও এর সুষ্ঠু প্রয়োগ

ইসলামের ইতিহাস কোনো নীরস শাস্ত্র নয়, যেখানে কিছু তথ্য নেওয়াই মূল উদ্দেশ্য। বরং ইসলামে ইতিহাসচর্চার রয়েছে নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। কুরআন কারিম ইতিহাসচর্চার উদ্দেশ্যকে ব্যক্ত করেছে এভাবে,

﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾

তাদের কাহিনিতে বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে প্রচুর শিক্ষণীয় বিষয়।[১১]

এই আয়াতে আল্লাহ ইতিহাসচর্চার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন শিক্ষা অর্জনকে। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ জাতিসমূহের পতনের কারণ নির্দেশ করেছেন যা থেকে ইতিহাস দর্শনের মূলনীতিগুলো জানা যায়। এসব সামনে রেখেই আমাদের ইতিহাস পাঠ করতে হবে। ত্যাগ করতে হবে বস্তুবাদী ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। ইসলামের ইতিহাস দর্শনের আলোকে ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করা না হলে ইতিহাস থেকে প্রকৃত জ্ঞান ও শিক্ষা অর্জন করা সম্ভব হবে না। কুরআনের আলোকে ইসলামের ইতিহাস দর্শন এবং তা ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের উপায় সম্পর্কে জানতে নিম্নের বইগুলো পড়া যেতে পারে।

দিরাসাতুন লিসুকুতি সালাসিনা দাউলাতিন ইসলামিয়্যাতিন – আবদুল হালিম উওয়াইস।[১২]

---

১১. সুরা ইউসুফ, ১১১

১২. মিশরীয় একজন ইতিহাসবিদ। জন্ম ১৯৪৩ সালে, মৃত্যু ২০১২ সালে। তার লিখিত বইটির নামের আরবিরূপ হলো, دِرَاسَةٌ لِسُقُوطِ ثَلَاثِينَ دَوْلَةٍ إِسْلَامِيَّةٍ

ফিকহুত তামকিন ইনদা দাওলাতিল মুরাবিতিন – আলি মুহাম্মদ আস-সাল্লাবি।[১৩]
আত-তাফসিরুল ইসলামিয়্যু লিত-তারিখ – ইমাদুদ্দিন খলিল।[১৪]

২। ইতিহাস পর্যালোচনার ক্ষেত্রে ইলমি মানহাজ (পদ্ধতি) অনুসরণ করা

ইসলামে ইতিহাসশাস্ত্র কোনো রূপকথা কিংবা লোককথা নয়। বরং এই শাস্ত্র প্রণয়ন করা হয়েছে সুবিন্যস্তভাবে। এর রয়েছে নিজস্ব উসুল ও মূলনীতি। সুতরাং ইতিহাসের কোনো বর্ণনা বা বিশ্লেষণ গ্রহণের ক্ষেত্রে এর নিজস্ব উসুলের আলোকেই গ্রহণ করতে হবে। সেক্যুলার ধারার মতো ইতিহাসকে লাগামহীন ছেড়ে দিলে হবে না, বরং একে শাস্ত্রীয়ভাবেই পাঠ করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত ইতিহাসশাস্ত্রের মূলনীতির আলোকে একে পাঠ করা না হবে ততক্ষণ এ থেকে উপকৃত হওয়া যাবে না। ইতিহাসশাস্ত্রের মূলনীতিগুলো জানতে দেখুন—

আল-ইলান বিত-তাওবিখ লিমান যাম্মা আহলাত তারিখ – আল্লামা সাখাবি।[১৫]
দিরাসাতুন তারিখিয়্যাতুন মানহাজিয়্যাতুন নকদিয়্যাহ – ডক্টর মুসা শরিফ।[১৬]

৩। তাহকিক ও বিশ্লেষণের প্রতি জোরদান

ইতিহাসশাস্ত্রে রচিত বইগুলোর বেশিরভাগ নানা মিথ্যা ও ভুল বর্ণনা দ্বারা পরিপূর্ণ।[১৭] নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনে ওরিয়েন্টালিস্টরা প্রায়ই এসব বর্ণনাকে কাজে লাগায়। ফলে ইতিহাস পাঠের ক্ষেত্রে বিস্তারিত তাহকিক ও বিশ্লেষণ করার বিকল্প নেই। তাহকিকের মাত্রা যত বাড়বে ততই নানা আপত্তি ও সংশয়ের জবাব স্পষ্ট হবে।

সাধারণ মানুষের জন্য তাহকিকের কাজটি কঠিন, ফলে তাদের উচিত সমকালীন আলেমদের রচিত গ্রন্থ পাঠ করা যেখানে তারা পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলোর তথ্য তাহকিক করে প্রকাশ করেছেন। যেমন মাওলানা ইসমাইল রেহান, আলি সাল্লাবি প্রমুখের লেখার কথা বলা যায়।

---

১৩. বইটির নামের আরবিরূপ হলো, فِقْهُ التَّمْكِينِ عِنْدَ دَوْلَةِ الْمُرَابِطِينَ

১৪. ইতিহাস বিষয়ক একাধিক গ্রন্থ প্রণেতা। ১৯৬৩ সালে লিবিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ওপরে বর্ণিত তার বইটির নামের আরবিরূপ হলো, التَّفْسِيرُ الإِسْلَامِيُّ لِلتَّارِيخِ

১৫. আল্লামা সাখাবির জন্ম ১৪২৮ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি ছিলেন ইবনে হাজার আসকালানির ছাত্র। ইতিহাস ও হাদিস বিষয়ে তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। ১৪৯৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইনতিকাল করেন। ওপরে বর্ণিত তার বইটির নামের আরবিরূপ হলো, الإِعْلَامُ بِالتَّوْبِيخِ لِمَنْ ذَمَّ أَهْلَ التَّارِيخِ

১৬. শায়খ মুসা শরিফের জন্ম সৌদি আরবে, ১৯৬১ সালে। ইতিহাস বিষয়ক আলোচনা ও লেখালেখির জন্য তিনি প্রসিদ্ধ। বর্তমানে তিনি সৌদি আরবের কারাগারে আছেন। ফাক্কাল্লাহু আসরাহু। ওপরে বর্ণিত তার বইটির নামের আরবিরূপ হলো, دِرَاسَةٌ تَارِيخِيَّةٌ مَنْهَجِيَّةٌ نَقْدِيَّةٌ

১৭. এর কারণ সম্পর্কে সামনে আলোচনা হবে। ইনশাআল্লাহ।

মুশাজারাতে সাহাবা - মূলনীতি ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মুশাজারাহ শব্দটি শাজারুন (শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট বৃক্ষ) ধাতুমূল থেকে নির্গত। বাতাসের দোলায় শাখাপ্রশাখার পরস্পর সংঘর্ষ থেকে রূপক অর্থে পারস্পরিক বিরোধ-সংঘর্ষকে মুশাজারাহ বলা হয়। মাজলুম সাহাবি উসমান রা.-এর শাহাদাতের পর নানা ঘটনাবলির প্রেক্ষিতে সাহাবায়ে কেরামের মাঝে সৃষ্ট মতবিরোধ ভয়াবহ গৃহযুদ্ধের রূপ ধারণ করেছিল, কিন্তু উম্মতের উলামায়ে কেরাম আদবের খাতিরে সেই যুদ্ধকে মুশাজারাহ নামে অভিহিত করেছেন। তারা বোঝাতে চেয়েছেন, শাখাপ্রশাখার পারস্পরিক সংঘর্ষ যেমন বৃক্ষের জন্য দোষণীয় নয়, তেমনই পারস্পরিক ভিন্ন ইজতিহাদের কারণে সাহাবিদের অন্তর্বিরোধও সামগ্রিক বিচারে দোষণীয় নয়।[১৮]

মুশাজারাতে সাহাবা ইসলামের ইতিহাসের এমন এক সত্য, যা বিব্রতকর, কিন্তু একে এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। এটি এমন স্পর্শকাতর বিষয়, যেখানে বোঝার সামান্য ভুল ডেকে আনে আকিদার বিচ্যুতি। মুশাজারাতে সাহাবা নিয়ে আমাদের সমাজে যে আলোচনা প্রচলিত, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা ভুল তথ্য ও ভুল বিশ্লেষণে পরিপূর্ণ। মুশাজারাতে সাহাবা, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যকার সেই ইখতিলাফ বা মতভিন্নতা যা নবিজির ইনতিকালের ৩০ বছরের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল। যেখানে দুপক্ষেই শীর্ষ সাহাবিরা অবস্থান করেছিলেন। এই ইখতিলাফের ফলে 'জংগে জামাল' ও 'জংগে সিফফিন' নামে দুটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যেখানে দুপক্ষেরই রক্ত ঝরে। মুশাজারাতে সাহাবাকে কেন্দ্র করেই আকিদার ক্ষেত্রে নতুন নতুন দল-উপদল গড়ে ওঠে, পরবর্তী সময়ে যারা আকিদার বিচ্যুতি ছড়ায় সমাজে।

মুশাজারাতে সাহাবা এমন এক কাঁটাযুক্ত ঝোপ, যেখানে পথ চলতে হয় সাবধানে, সতর্ক হয়ে। যেখানে পদে পদে অপেক্ষা করছে সাবায়ি, শিয়া, খাওয়ারিজ ও নাসিবিদের তৈরি জাল বর্ণনার ফাঁদ। এ ফাঁদ সতর্কতার সাথে এড়াতে না পারলে আটকা পড়তে হয় বিভ্রান্তির জালে। আকিদা হয়ে ওঠে নড়বড়ে। তাই মুশাজারাতে সাহাবার ইতিহাস আলোচনার আগে আমরা এ সংক্রান্ত কিছু মূলনীতি জেনে নিই।

---

১৮. *মাকামে সাহাবা*, ৭২

মূলনীতিসমূহ

১। সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আকিদা-বিশ্বাসের মূল মাপকাঠি হলো কুরআন, সুন্নাহ ও আকিদার গ্রন্থাবলি। এই তিন উৎস থেকে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আকিদা নির্ধারণ করার পর ইতিহাসের কোনো সূত্র যদি এর বিপরীত আকিদা উপস্থাপন করে, তাহলে তা পরিত্যাজ্য। কারণ ইতিহাসের কোনো বর্ণনা আকিদা নয়, তা কেবল ঐতিহাসিক তথ্য মাত্র, এবং যার নির্ভরযোগ্যতা বিশ্লেষণ ও যাচাই-বাচাইকরণের ওপর আরোপিত।

২। জুমহুর বা সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমদের মতে নবিদের পর উম্মতের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হলেন হজরত আবু বকর রা., তারপর হজরত উমর রা., তারপর হজরত উসমান রা., তারপর হজরত আলি রা.। তারা সবাই-ই খুলাফায়ে রাশিদিন, হেদায়াতের ইমাম।

৩। নবিজির সকল সাহাবিকে আমরা ভালোবাসব। কারও ভালোবাসার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করব না, কাউকে ঘৃণা বা গালমন্দ করব না। আমরা শুধু তাদের ভালো দিকগুলোই আলোচনা করব, কারণ তাদের ঘৃণা করা কুফর, মুনাফিকি ও চরম অবাধ্যতা।[১৯]

৪। সাহাবিদের মধ্যকার সর্বনিম্ন স্তরের সাহাবিও, সাহাবি নয়, এমন সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ থেকে উত্তম। সাহাবি নয়, এমন ব্যক্তি যত নেক আমল নিয়েই আল্লাহর সামনে উপস্থিত হন, তার চেয়ে একজন সাহাবির মর্যাদা ও সম্মান অনেক বেশি। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারককে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কে উত্তম? হজরত মুআবিয়া নাকি উমর ইবনে আবদুল আজিজ। তিনি জবাব দিয়েছিলেন, হজরত মুআবিয়া রা. নবিজির সাথে যুদ্ধ করা অবস্থায় তার নাকে যে ধুলা লেগেছিল তাও উমর ইবনে আবদুল আজিজ থেকে উত্তম।[২০]

৫। সাহাবিদের গালমন্দ করা রাফিজিদের কাজ। আহলে বাইতের নিন্দা করা নাসিবিদের কাজ। এই দুই দলই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআত থেকে বিচ্যুত। আমরা দুদলের কোনো দলের সাথেই সম্পর্ক রাখি না। তাদের বিশ্বাস লালন করি না। ফলে মুশাজারাতে সাহাবার ইতিহাস পাঠকালে আমরা কোনো সাহাবির নিন্দা করব না, আহলে বাইতের কোনো সদস্যের অমর্যাদা করব না।

৬। অনেকে সাহাবিদের দোষ ধরার জন্য বিভিন্ন হাদিস উপস্থাপন করে। তারা প্রমাণ করতে চায়, হাদিসের আলোকেই সাহাবিদের অপরাধী সাব্যস্ত করা

---

১৯. *আল-আকিদাতুত তহাবিয়্যা*, ৮১
২০. *ওফায়াতুল আয়ান*, ৩/৩৩

যায়। এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে এ ধরনের বেশিরভাগ হাদিসই বানোয়াট বা জাল। এর বাইরে কিছু হাদিস আছে যেখানে ভুল ব্যাখ্যা করা হয়। অর্থাৎ হাদিসটি ছিল প্রশংসার কিন্তু ভুল ব্যাখ্যা করে একে নিন্দার হাদিস বলা হয়। কিছু হাদিসের ভুল অনুবাদ উপস্থাপন করা হয়। অল্প দুয়েকটি হাদিসের মাধ্যমে সাহাবিদের কিছু ভুল প্রমাণ হয়। এ ক্ষেত্রে আমাদের আকিদা সাহাবিরা মাসুম (নিষ্পাপ) নন, মাগফুর (ক্ষমাপ্রাপ্ত)।

এই মূলনীতি মাথায় রেখে হাদিসগুলো পাঠ করলে দেখা যাবে হাদিসটি কোনো না কোনো শ্রেণিতে পড়ে যাচ্ছে। ফলে বিভ্রান্তি থেকে বেঁচে থাকা সহজ হবে।

৭। সাহাবিদের মধ্যকার দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে প্রতিটি পক্ষের সামনেই দলিল ছিল, এবং ছিল নিজ নিজ ইজতিহাদ। ইজতিহাদের ক্ষেত্রে তাদের কারও ভুল হয়েছে, কেউ সঠিক মতের ওপর ছিলেন। কাদের ইজতিহাদ সঠিক ছিল, তাও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআতের আলেমরা জানিয়েছেন, কিন্তু কারও পক্ষ নিয়ে কাউকে গালমন্দ করার অনুমতি দেননি কেউই। সুতরাং মুশাজারাতে সাহাবার ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে আমরা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআতের অবস্থান জেনে নেব, কিন্তু সাহাবিদের কারও ব্যাপারে কোনো বাজে মন্তব্য করব না, এমনকি নেতিবাচক মানসিকতাও লালন করব না।

৮। মুশাজারাতে সাহাবার ইতিহাসগুলো বর্ণিত হয়েছে বিশ্বস্ত-অবিশ্বস্ত দুই মাধ্যমেই। তাই কোনো বর্ণনা সামনে এলে প্রথমে যাচাই করতে হবে, মাধ্যমটি বিশ্বস্ত কি না। বর্ণনার সনদ সহিহ কি না। এই যাচাইয়ের আগে কোনো বর্ণনা দেখেই সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না।

৯। ইতিহাসবিদরা তাদের গ্রন্থে কোনো তথ্য বা বিবরণ উল্লেখ করার মানে এই নয় যে, এর সাথে তিনি শতভাগ একমত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইমাম তবারি তার *তারিখুত তবারি*তে একই বিষয়ে বিপরীতমুখী দুটি বর্ণনাও এনেছেন। অর্থাৎ তার উদ্দেশ্য ছিল, শুধু সংকলন। নির্দিষ্ট তথ্যকে প্রাধান্য দেওয়া নয়। মুফতি শফি রহ. এ সম্পর্কে লিখেছেন, ইতিহাসশাস্ত্রের আলোচনার সময় ইতিহাসবিদদের অনেকেই চেয়েছেন সকল ধরনের বর্ণনাকে একত্র করে ফেলতে। তারা চাচ্ছিলেন এসব যাচাই-বাছাইয়ের কাজটি পরে অন্য কেউ এসে করুক। সুতরাং কেউ যদি ঐতিহাসিক বর্ণনা দ্বারা আকিদা সম্পর্কিত কোনো বিষয় প্রমাণ করতে চায় তাহলে জরাহ-তাদিল (কোনো বর্ণনাকারীর নির্ভরযোগ্যতা বা অনির্ভরযোগ্যতা বিষয়ক শাস্ত্র)-এর মূলনীতি অনুসারে সেসবকে যাচাই করতে হবে। বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়া এসব বর্ণনা গ্রহণের কোনো

সুযোগ নেই। অমুক ইমাম উল্লেখ করেছেন, তমুক মুহাদ্দিসের ইতিহাসগ্রন্থে পাওয়া গেছে, স্রেফ এটুকু বলে দায়িত্বমুক্ত হওয়ার সুযোগ নেই।[২১]

১০। মুশাজারাতে সাহাবা পাঠের উদ্দেশ্য এই নয় যে, সাহাবায়ে কেরামের মাঝে কে অপরাধী ছিলেন, কে জালেম ছিলেন তা নির্ধারণ করা। বরং মুশাজারাতে সাহাবা পাঠের উদ্দেশ্য, এ সম্পর্কে বিশুদ্ধ ইতিহাস জানা এবং আরোপিত সংশয় ও সন্দেহের জবাব দেওয়া। মুশাজারাতে সাহাবা পাঠের মূল উদ্দেশ্য সাহাবায়ে কেরামের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করা। এই বিষয়টি মাথায় রেখে মুশাজারাতে সাহাবার ইতিহাস পাঠ করলে, অনেক বিভ্রান্তি থেকে বেঁচে থাকা যাবে ইনশাআল্লাহ।

কয়েকটি ইতিহাসগ্রন্থ ও ইতিহাসবিদ - মুশাজারাতে সাহাবাসংশ্রান্ত ইতিহাস গ্রহণে সতর্কতা

মুশাজারাতে সাহাবার ইতিহাস বিবৃত হয়েছে নানা মাধ্যমে। এর সবগুলো বিশ্বস্ত নয়। সুতরাং মুশাজারাতের ইতিহাস পাঠের আগে এসব মাধ্যম সম্পর্কেও আলোকপাত করা প্রয়োজন। প্রথমে আমরা মুশাজারাতে সাহাবার কয়েকজন বর্ণনাকারী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা নেব।

বর্ণনাকারী

মুশাজারাতে সাহাবা ও সাহাবি যুগের বেশিরভাগ ঘটনা বিবৃত হয়েছে ১১ জন রাবি বা বর্ণনাকারীর মাধ্যমে। এই ১১ জনের অবস্থা জানা গেলে মুশাজারাতসংক্রান্ত বেশিরভাগ বর্ণনার মান জানা সহজ হয়ে যায়। এই ১১ জন রাবি হলেন—

১। ইবনু শিহাব যুহরি (মৃত্যু ১২৪ হিজরি)
২। মুহাম্মদ ইবনু সায়িব কালবি (মৃত্যু ১৪৬ হিজরি)
৩। মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক (মৃত্যু ১৫১ হিজরি)
৪। লুত বিন ইয়াহইয়া, আবু মিখনাফ (মৃত্যু ১৫৭ হিজরি)
৫। সাইফ ইবনু উমর (মৃত্যু ১৮০ হিজরি)
৬। হিশাম ইবনু মুহাম্মদ ইবনু সায়িব কালবি (মৃত্যু ২০৪ হিজরি)
৭। মুহাম্মদ ইবনু উমর ওয়াকিদি (মৃত্যু ২০৭ হিজরি)
৮। আবুল হাসান মাদায়িনি (মৃত্যু ২২৫ হিজরি)
৯। মুহাম্মদ ইবনু সাদ (মৃত্যু ২৩০ হিজরি)
১০। খলিফা ইবনু খইয়াত (মৃত্যু ২৪০ হিজরি)
১১। উমর ইবনু শাব্বাহ (মৃত্যু ২৬২ হিজরি)

এবার এই ১১ জনের অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করা যাক।

ইবনু শিহাব যুহরি

ইমাম বুখারি ও মুসলিম তাঁর বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। বেশিরভাগ আলেম তাঁকে সিকাহ বা নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করেছেন। তবে কিছু ক্ষেত্রে তিনি তাঁর জন্মের আগের ঘটনাও বর্ণনা করেছেন, কিন্তু কার থেকে বর্ণনা করেছেন, তা উল্লেখ

করেননি। এ ধরনের বর্ণনাকে মুরসাল বলা হয়। যেহেতু যাচাইয়ের সুযোগ থাকে না, তাই মুরসাল বর্ণনায় কিছুটা দুর্বলতা দেখা দেয়। ইয়াহইয়া ইবনু সাইদ আল-কাত্তান বলেন, 'যুহরির মুরসাল বাতাসের মতো।'[২২]

মুহাম্মদ ইবনু সায়িব কালবি

তার সম্পর্কে ইবনু হাজার আসকালানি বলেন, 'সে মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত। তার ব্যাপারে রাফিজি হওয়ার অভিযোগও আছে।'[২৩]

মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক

ইমাম মালিক ও দারা কুতনি তার সমালোচনা করেছেন, তবে অন্য আলেমরা সিরাত ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে তাকে নির্ভরযোগ্য বলে মেনে নিয়েছেন।

লুত বিন ইয়াহইয়া, আবু মিখনাফ

তার সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু মা'য়িন বলেন, 'তার কোনো মর্যাদা নেই।' ইমাম যাহাবি বলেন, 'তার ওপর নির্ভর করা যায় না।' ইবনু আদি বলেন, 'সে খাঁটি শিয়া, সে তাদের সংবাদ সংরক্ষক।'[২৪]

সাইফ ইবনু উমর

ইবনু হাজার আসকালানি তার সম্পর্কে বলেন, 'সে হাদিসের ক্ষেত্রে দুর্বল, তবে ইতিহাসের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য।'[২৫]

হিশাম ইবনু মুহাম্মদ কালবি

ইবনু আসাকির তার সম্পর্কে বলেন, 'সে রাফিজি, অগ্রহণযোগ্য।' ইমাম যাহাবি বলেন, 'তার ওপর নির্ভর করা যায় না।'[২৬]

মুহাম্মদ ইবনু উমর ওয়াকিদি

ওয়াকিদির রচনাবলিতে প্রচুর দুর্বল, অগ্রহণযোগ্য বর্ণনা এসেছে। তাই ইমাম যাহাবি বলেন, 'তার দুর্বলতার ওপর উম্মতের ইজমা আছে।'[২৭]

আবুল হাসান মাদায়িনি

ইবনু মায়িন তাকে সিকাহ বলেছেন। ইমাম যাহাবি তাকে হাফিজ, সাদিক, সুদুক বলেছেন।[২৮]

---

২২. *আল-জারহু ওয়াত-তাদিল*, ১/২৪৬
২৩. *তাহযিবুত তাহযিব*, জীবনী নং-৫৯০১
২৪. *মিযানুল ইতিদাল*, ৩/৪১৯
২৫. *তাকরিবুত তাহযিব*, জীবনী নং-২৭২৪
২৬. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ৯/৪৬২। *মিযানুল ইতিদাল*, ৪/৩০৪
২৭. *তাহযিবুল কামাল*, ২১/৩৯০

মুহাম্মদ ইবনু সাদ

তিনিও সিকাহ বলে গণ্য। তার লিখিত *আত-তবাকাতুল কুবরা* শুরুর দিকে রচিত একটি বিস্তৃত ইতিহাসগ্রন্থ। এখানে তিনি যেমন সিকাহ রাবিদের থেকে বর্ণনা এনেছেন, তেমনই ওয়াকিদি থেকেও বর্ণনা এনেছেন। ফলে কিছু বর্ণনা যাচাই করে গ্রহণ করতে হয়।

খলিফা ইবনু খইয়াত

নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। *সহিহ বুখারিতে* তার বর্ণিত হাদিস আছে। ইমাম যাহাবি তাকে সিরাত, রিজাল ও ইতিহাসশাস্ত্রের ইমাম বলেছেন।[২৯]

উমর ইবনু শাব্বাহ

তিনি ছিলেন ইমাম ইবনে মাজাহর শিক্ষক। ইমাম দারা কুতনি, ইবনে হিব্বান ও খতিব বাগদাদি তাকে সিকাহ বলেছেন।[৩০]

মুশাজারাতে সাহাবার ১১ জন রাবির মধ্যে চারজন রাবি যথাক্রমে ১. লুত বিন ইয়াহইয়া, আবু মিখনাফ, ২. মুহাম্মদ ইবনু সায়িব কালবি, ৩. হিশাম ইবনু মুহাম্মদ ইবনু সায়িব কালবি, ৪. মুহাম্মদ ইবনু উমর ওয়াকিদি মারাত্মক দুর্বল। প্রথমদিকের ইতিহাসগ্রন্থগুলোর বিরাট অংশজুড়েই রয়েছে এই চারজনের বর্ণিত বিবরণ। এর মাঝে কিছু আছে সাহাবাবিদ্বেষে ভরা। রাফিজি, নাসিবি ও ওরিয়েন্টালিস্টরা এসব বর্ণনা টেনে নিজেদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার চেষ্টা চালায়। এই মৌলিক বিষয়টি স্মরণ রাখা দরকার।

এবার কিছু ইতিহাসগ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে, যেখানে মুশাজারাতে সাহাবা সম্পর্কে বিস্তৃত বর্ণনা এসেছে।

তারিখুত তবারি

ইবনু জারির তবারি রচিত সুবিশাল এই ইতিহাসগ্রন্থে বিস্তৃত অংশজুড়ে মুশাজারাতে সাহাবার আলোচনা এসেছে। তবে এখানে বর্ণনা নেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি কোনো বাছবিচার করেননি। এমনকি ১১ রাবির প্রথম চার অগ্রহণযোগ্য রাবি থেকেও তিনি প্রচুর বর্ণনা এনেছেন। কিছু ক্ষেত্রে একই বিষয়ে বিপরীতমুখী দুই বর্ণনাও এনেছেন। ফলে *তারিখুত তবারি* থেকে কিছু গ্রহণ করতে হলে শুরুতে এর

---

২৮. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১০/৪০১
২৯. প্রাগুক্ত, ১১/৪৭৩
৩০. *তাহযিবুত তাহযিব*, ৭/৪৪০

সনদ যাচাই করতে হবে। শুধু ইবনু জারির তবারি উল্লেখ করেছেন বলেই তা গ্রহণ করা যাবে না।

আল-কামিল ফিত-তারিখ

ইবনুল আসির জাযারি রচিত এই গ্রন্থটিতে হিজরি সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। তবে মুশাজারাতে সাহাবা সম্পর্কে তিনি যে আলোচনা করেছেন তাকে বলা যায় *তারিখুত তবারির* সারনির্যাস। প্রথম তিন শতাব্দীর ইতিহাসের ক্ষেত্রে ইবনুল আসির আর কারও ওপর নির্ভর করেননি। সরাসরি *তারিখুত তবারির* বর্ণনাগুলোকেই সংক্ষিপ্ত করেছেন। এর সনদ ও পুনরুক্তি বাদ দিয়ে মূল ঘটনাটি তিনি লিখেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি রাবিদের মান যাচাইয়ের মাধ্যমে কোনো বর্ণনা বাদ দেননি, ফলে কিছু অগ্রহণযোগ্য বিষয় তার লেখাতেও চলে এসেছে। যেহেতু তিনি লেখায় কোনো সনদ উল্লেখ করেননি, ফলে তার বর্ণিত বিবরণের মান যাচাই করা বেশ কষ্টসাধ্য। এ ক্ষেত্রে দেখতে হবে তার আনা বর্ণনা প্রমাণিত বাস্তবতার বিপরীত কি না। এমন হলে তা পরিত্যাজ্য হবে।

আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া

আগের দুই ইতিহাসবিদের চেয়ে ইবনু কাসির ছিলেন বেশ সতর্ক। তার রচিত *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়ায়* তিনি চেষ্টা করেছেন বানোয়াট, মাওজু ও দুর্বল বর্ণনা এড়িয়ে চলার। তবে কিছু ক্ষেত্রে তিনি পুরো সফল হননি। যেমন কারবালার ইতিহাস অংশে তিনি আবু মিখনাফের বর্ণনা এনেছেন, কিন্তু বর্ণনা ধরে ধরে এর মান যাচাই করেননি। শুধু কয়েক পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনা সমাপ্ত হওয়ার পরে আবু মিখনাফ সম্পর্কে বলেছেন, সে ছিল শিয়া।

এই তিনটি গ্রন্থ পর্যালোচনা করে বোঝা গেল, সনদ যাচাই করা ব্যতীত এই গ্রন্থগুলো থেকে মুশাজারাতে সাহাবাসংক্রান্ত বর্ণনা গ্রহণ করা যাবে না।

আল-ইমামাহ ওয়াস-সিয়াসাহ

এই গ্রন্থটিতেও মুশাজারাতে সাহাবার অনেক আলোচনা এসেছে। সাধারণত এই গ্রন্থটিকে ইবনু কুতাইবা দিনাওয়ারির গ্রন্থ বলে প্রচার করা হয়। ইবনু কুতাইবা দিনাওয়ারি ছিলেন আহলুস সুন্নাহর বিশিষ্ট আলেম। ইবনু হাযম ও খতিব বাগদাদি তাকে বিশ্বস্ত মনে করতেন।[৩১] ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, 'ইবনু কুতাইবা দিনাওয়ারি ছিলেন ইমাম আহমাদের একজন অনুসারী ও আহলুস সুন্নাহর বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।'[৩২] গবেষকরা *আল-ইমামাহ ওয়াস-সিয়াসাহ* গ্রন্থটি পর্যালোচনা শেষে

---

৩১. *লিসানুল মিযান*, ৩/৩৫৭

৩২. *তাহকিকু মাওয়াকিফিস সাহাবাহ*, ২/১৪৪

জানিয়েছেন, 'এই গ্রন্থটি ইবনু কুতাইবার লেখা নয়। বরং কোনো রাফিজি এটি রচনা করে ইবনু কুতাইবার নামে চালিয়ে দিয়েছে। এই গ্রন্থের লেখক ইবনু কুতাইবা নন, কারণ—

১। ইবনু কুতাইবার জীবনীকারদের কেউ তার জীবনীতে এই গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেননি।

২। ইবনু কুতাইবা জীবনে বাগদাদ থেকে বের হননি কখনো, অথচ এই গ্রন্থের লেখকের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, তিনি দামেশক ও উত্তর আফ্রিকায় অবস্থান করতেন।

৩। ইবনু কুতাইবার স্বভাব ছিল বইয়ের শুরুতে দীর্ঘ ভূমিকা দেওয়া, অপরদিকে এই বইতে মাত্র তিন লাইনের একটি ভূমিকা আছে।

৪। ইবনে কুতাইবা কখনো মিশর যাননি, কিন্তু এই বইতে মিশরের অনেক আলেম থেকে বর্ণনা করা হয়েছে।

৫। এই গ্রন্থে এমন অনেক বর্ণনা এসেছে যা থেকে বোঝা যায় এর লেখক কট্টর রাফিজি।

এই গ্রন্থে সাহাবিদের অনেককে গালমন্দ করা হয়েছে। এই গ্রন্থ নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা শেষে ডক্টর আলি নুফাই আল-উলয়ানি লিখেছেন, 'বইটি ইবনু কুতাইবার লেখা নয়, কোনো রাফিজির লেখা।'[৩৩]

দুঃখজনক হলেও সত্য, মুসলিম লেখকদের অনেকেই *আল-ইমামাহ ওয়াস-সিয়াসাহ*কে ইবনু কুতাইবার কিতাব ধরে নিয়ে এখান থেকে অনেক বিভ্রান্তিকর তথ্য গ্রহণ করেছেন, এবং সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। যেমন গত শতাব্দীতে মাওলানা মওদুদি তার *খিলাফত ওয়া মুলুকিয়্যত* গ্রন্থে ইবনু কুতাইবার বরাত দিয়ে অনেক তথ্য উল্লেখ করেন,[৩৪] যার সাথে ইবনু কুতাইবার কোনো সম্পর্ক নেই। যা মূলত রাফিজিদের লেখা *আল-ইমামাহ ওয়াস-সিয়াসাহ* গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।

নাহজুল বালাগাহ

সাহাবিদের ইতিহাসকে বিকৃত করে লেখা হয়েছে গ্রন্থটি। এর রচনা হয় রাফিজিদের হাতে, হজরত আলি রা.-এর ইনতিকালের সাড়ে তিনশ বছর পর, কিন্তু তারা একে চালিয়ে দেয় হজরত আলি রা.-এর রচিত গ্রন্থ বলে। ইমাম যাহাবি স্পষ্ট লিখেছেন, 'এই গ্রন্থ পাঠ করলেই বোঝা যায় এর বক্তব্যগুলো হজরত আলি রা.-এর নামে মিথ্যাচার। কারণ এই গ্রন্থে সরাসরি হজরত আবু বকর ও উমর রা.-কে

---

৩৩. *আকিদাতুল ইমাম ইবনু কুতাইবা*, ৯১

৩৪. আধুনিক প্রকাশনী থেকে অনূদিত সংস্করণে এই বইয়ের গ্রন্থপঞ্জিতে দেখা যায় ৫৮ নং বইটিই *আল-ইমামাহ ওয়াস-সিয়াসাহ*। এই বইয়ের লেখক হিসেবে সেখানে ইবনু কুতাইবাকে উল্লেখ করা হয়েছে।

গালি দেওয়া হয়েছে।'[৩৫] ইবনে তাইমিয়া, ইবনু হাজার আসকালানিও এই গ্রন্থকে রাফিজিদের রচনা বলেছেন।[৩৬] খতিব বাগদাদি এই বইয়ের সকল খুতবাকে বানোয়াট বলেছেন।[৩৭] কাজি ইবনুল খাল্লিকান বলেন, 'এই বইটি আলি রা.-এর রচনা নয় বরং মুরতাজার ভাই রাজির সৃষ্টি।'[৩৮]

এই বইয়ের ভাষারীতি সাহাবিযুগের ভাষারীতির সাথে মেলে না, যা থেকে বোঝা যায় বইটি অনেক পরে রচিত হয়েছে। এই বইয়ে সরাসরি আল্লাহর সিফাতকে অস্বীকার করে তা সম্পৃক্ত করা হয়েছে হজরত আলি রা.-এর দিকে। অথচ এটি কোনোভাবেই সম্ভব নয়। এই বইতে অনেক হাদিসকে আলি রা.-এর কথা বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমনকি অন্য সাহাবি ও তাবিয়িদের অনেক কথাকেও বলা হয়েছে আলি রা.-এর উক্তি।

এককথায় চরম অগ্রহণযোগ্য একটি বই। কিন্তু শিয়ারা এই বইকে শতভাগ বিশুদ্ধ মনে করে। এই বই থেকে তারা সাহাবিদের বিরুদ্ধে নানা দলিল উপস্থাপন করে। একই কাজ করে ওরিয়েন্টালিস্টরাও। শায়খ আলি সাল্লাবি লিখেছেন, যেসব গ্রন্থ সাহাবায়ে কেরামের সময়কালকে সবচেয়ে বেশি বিকৃত করেছে তার মধ্যে রয়েছে *নাহজুল বালাগাহ* নামক গ্রন্থটি। সনদ ও মতন উভয় বিচারেই গ্রন্থটি পরিত্যাজ্য। এই গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে আলি রা.-এর ইনতিকালের তিন শতাব্দী পর, তাও কোনো সনদ ছাড়া। এই গ্রন্থের লেখক শরিফ রেজা মুহাদ্দিসদের কাছে অগ্রহণযোগ্য। এই কিতাব থেকে সতর্ক থাকা আবশ্যক, বিশেষ করে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কিত কিছু গ্রহণ করার ক্ষেত্রে।[৩৯]

কিতাবুল আগানি

আবুল ফারাজ ইসফাহানির লেখা চরম অগ্রহণযোগ্য একটি বই *কিতাবুল আগানি*। খতিব বাগদাদি, ইবনুল জাওযি, ইমাম যাহাবি সবাই একবাক্যে আবুল ফারাজ ইসফাহানিকে মিথ্যুক ও বদ আকিদার লোক বলেছেন।[৪০] তার এই গ্রন্থে সে হজরত মুআবিয়া রা.-এর শাসনকাল নিয়ে অনেক মিথ্যা তথ্য দিয়েছে। এই বইতে হাইসাম বিন আদি আল-কুফি থেকে ৫০টির বেশি বর্ণনা আনা হয়েছে, অথচ

---

৩৫. *মিযানুল ইতিদাল*, ৩/১২৪

৩৬. দেখুন, *মিনহাজুস সুন্নাহ*, ৪/২২৪। *লিসানুল মিযান*, ৪/২২৩

৩৭. *আল-জামি লি-আখলাকির রাবি ওয়া আদাবিস সামি*, ২/১৬১

৩৮. *ওফায়াতুল আয়ান*, ৩/৩১৩

৩৯. *আমিরুল মুমিনিন আল-হাসান বিন আবি তালিব*, ৯

৪০. সবার মতামত জানতে দেখুন, *মুজামুল উদাবা*, ১৩/১০০। *তারিখু বাগদাদ*, ১১/৩৯৮। *আল-মুনতাজাম*, ৭/৪০। *তাসদিরুল আগানি*, ১/১৯। *মিযানুল ইতিদাল*, ৩/১২৩। *লিসানুল মিযান*, ৬/২০৯

তাকে ইমাম বুখারি, ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু মাইন, আহমাদ আল-ইজলি সবাই মিথ্যুক বলেছেন। এই বইতে এমন সব অশ্লীল বিবরণ আর সালাফে সালেহিনদের মদ্যপানের ঘটনা এসেছে যা পাঠ করা মাত্র যেকোনো বিবেকবান পাঠক অস্বীকার করবে। এসবের কোনো ভিত্তিই নেই। ইরাকের বরেণ্য কবি ও গবেষক ওলিদ আযমি এই গ্রন্থ পর্যালোচনা করে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। সেই গ্রন্থের নাম *আস-সাইফুল ইয়ামানি ফি নাহরিল আসফাহানি সাহিবিল আগানি*। সেখানে তিনি এই বইয়ের সমস্যাগুলো ধরে ধরে আলোচনা করেছেন।

তারিখে ইয়াকুবি

শিয়া লেখক ইয়াকুবির লেখা আরেকটি অগ্রহণযোগ্য বই *তারিখে ইয়াকুবি*। ইয়াকুবি ছিল ইমামিয়া শিয়া। এই বইতেও আছে মুশাজারাতে সাহাবা নিয়ে অনেক আজেবাজে বর্ণনা। এমনকি সাহাবিদেরকে গালমন্দও করেছে এই লেখক। প্রথম তিন খলিফার খেলাফতের কোনো স্বীকৃতিই দেয়নি সে। সংক্ষিপ্ত পরিসরের এই বইটিকে বলা যায় ইসলামের ইতিহাসের এক বিকৃত উপস্থাপন। এজন্য ওরিয়েন্টালিস্টদের খুব প্রিয় এই বইটি। সেক্যুলার প্রভাবিত অনেক মুসলিম লেখকও এই বই থেকে তথ্য নেন নির্বিচারে।

ডক্টর মুহাম্মদ বিন সালেহ আস-সালামি বলেন, 'ওরিয়েন্টালিস্ট ও তাদের মানসপুত্রদের মধ্যে যারা ইসলামের ইতিহাস ও ব্যক্তিত্বদের কলঙ্কিত করতে চায়, তাদের কাছে *তারিখুল ইয়াকুবিই* নির্ভরযোগ্য উৎস। অথচ বাস্তবতা হলো, ইলমি দৃষ্টিকোণ থেকে এই বইয়ের কোনো মূল্যই নেই।'[৪১]

ওরিয়েন্টালিস্টদের কাছে *তারিখুল ইয়াকুবি* কেমন প্রিয় তার একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। *তারিখুল ইয়াকুবি*তে আছে, আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান কুব্বাতুস সাখরা নির্মাণ করেছিলেন যেন হজযাত্রীরা কাবাঘরে না যায়। কারণ সেখানে তখন তার প্রতিদ্বন্দ্বী আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর শাসন করছিলেন। এই বর্ণনার কোনো ভিত্তি নেই। ইয়াকুবি ছাড়া আর কেউ এই বর্ণনা আনেনওনি। কিন্তু পি কে হিট্টি (P. K. Hitti) তার *হিস্ট্রি অব দ্য এরাবস* (History of the Arabs) গ্রন্থে এই বর্ণনা এনেছেন ইয়াকুবির বরাতে। কারণ এই বর্ণনাটি আনলে আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের ওপর এমন দোষ চাপানো যায়, যার সাথে তার কোনো সম্পর্কই নেই।

---

৪১. *মানহাজু কিতাবাতিত তারিখিল ইসলামি*, ৪৭৪

মুরুজুয যাহাব

ইয়াকুবির মতো আরেক অনির্ভরযোগ্য লেখক মাসউদি। তার সম্পর্কে ইমাম যাহাবি বলেন, 'সে ছিল মুতাযিলি।'[৪২] ইবনে হাজার আসকালানি বলেন, 'সে ছিল শিয়া ও মুতাযিলি।'[৪৩] ইমাম ইবনু তাইমিয়া বলেন, 'মাসউদির ইতিহাসগ্রন্থে এত বেশি ভুল আছে যা আল্লাহ ছাড়া আর কারও পক্ষে গণনা করাও সম্ভব নয়।'[৪৪] কাজি আবু বকর ইবনুল আরাবি বলেন, 'মাসউদি ছিল কৌশলী বিদআতি।'[৪৫] মাসউদি লিখিত *মুরুজুয যাহাব ওয়া মাআদিনুল জাওহার* গ্রন্থে আছে মুশাজারাতে সাহাবা সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর আলোচনা। আধুনিক লেখকদের অনেকে মাসউদিকে অনুসরণ করে নিজেদের লেখায় এনেছেন বিভ্রান্তিকর তথ্য। আদালতে সাহাবা সম্পর্কে তুলেছেন প্রশ্ন। ফলে এই বইটি থেকেও সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট করা দরকার। কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় *তারিখুত তবারি*, *তারিখে ইয়াকুবি* ও *মুরুজুয যাহাবে* একই তথ্য এসেছে। কিন্তু তবু *তারিখুত তবারি*কে শতভাগ অগ্রহণযোগ্য বলা হয় না, যেটা বলা হয় পরের দুই বইয়ের ক্ষেত্রে। এর কারণ হলো, *তারিখুত তবারি* একটি সংকলনধর্মী গ্রন্থ, যেখানে সব ধরনের বর্ণনা আনা হয়েছে। অপরদিকে *তারিখে মাসউদি* ও *তারিখে ইয়াকুবি*তে লেখকেরা শুধু একধরনের তথ্যই উপস্থাপন করেছেন। তারা সনদ উল্লেখ করেননি, আবার নিজেদের আকিদা-বিশ্বাসের বাইরেও কিছু উপস্থাপন করেননি। ফলে তাদের বইয়ের আলোচনা শতভাগই বিভ্রান্তিকর। তাই গবেষক ব্যতীত বাকিদের জন্য পুরো বইটিই পরিত্যাজ্য।
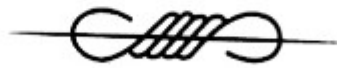
৪২. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১৫/৫৬৯
৪৩. *লিসানুল মিযান*, ৪/২২৫
৪৪. *মিনহাজুস সুন্নাহ*, ৪/৮৪
৪৫. *আল-আওয়াসিম মিনাল কাওয়াসিম*, ১৯২

ফাজায়িলুস সাহাবা

মুশাজারাতে সাহাবাসংক্রান্ত আলোচনায় প্রবেশের আগে সাহাবায়ে কেরামের ফজিলত, মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনার বিকল্প নেই। মুশাজারাতে সাহাবার মতো স্পর্শকাতর বিষয় পাঠের আগে সাহাবায়ে কেরামের সম্মান অন্তরে বদ্ধমূল হলে তাদের ব্যাপারে অনেক নেতিবাচক ধারণা থেকে বেঁচে থাকা যায়, নিজের ঈমানকেও রাখা যায় সুরক্ষিত।

সাহাবায়ে কেরামের ফজিলত ও মর্যাদার বিষয়টি কুরআন কারিম দ্বারাই প্রমাণিত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

আর যারা প্রথম হিজরতকারী ও আনসারদের মাঝে পুরাতন এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কানন-কুঞ্জ, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত প্রস্রবণসমূহ। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটাই হলো মহান কৃতকার্যতা।[৪৬]

এই আয়াতের তাফসিরে ইবনে আশুর রহ. বলেন, সাহাবিদের ওপর আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রকাশের অর্থ হলো, তিনি তাদের ওপর নিজের অপরিসীম অনুগ্রহ, দয়ায় প্রকাশ ঘটিয়েছেন।[৪৭]

অন্য আয়াতে আল্লাহ ইরশাদ করেন,

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾

আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষের নিচে আপনার কাছে শপথ করল। আল্লাহ অবগত ছিলেন যা তাদের অন্তরে ছিল।

---

৪৬. সুরা তাওবা, ১০০

৪৭. *আত-তাহরির ওয়াত-তানবির*, ১৯/১১

অতঃপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাজিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন।[৪৮]

এই আয়াত অবতীর্ণ হয় হুদাইবিয়ার সন্ধিকে কেন্দ্র করে। সেদিন আল্লাহ সাহাবিদের প্রতি নিজের সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। একই দিন নবিজিও একটি হাদিসের মাধ্যমে সাহাবিদের প্রতি নিজের মনোভাব জানিয়েছিলেন। জাবির ইবনু আবদিল্লাহ বলেন, সেদিন নবিজি আমাদেরকে বলেছিলেন, তোমরা পৃথিবীবাসীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সেদিন আমরা ছিলাম ১ হাজার ৪০০ জন। যদি আজ আমি চোখে দেখতাম তাহলে আমি তোমাদেরকে সেই গাছের স্থানটি দেখাতাম।[৪৯]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾

মুহাম্মদ আল্লাহর রাসুল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু ও সেজদারত দেখবেন। তাদের মুখমণ্ডলে রয়েছে সেজদার চিহ্ন। তাওরাতে তাদের অবস্থা এরূপ, এবং ইনজিলে তাদের অবস্থা যেমন একটি চারাগাছ যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর তা শক্ত ও মজবুত হয় এবং কাণ্ডের ওপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে, চাষিকে আনন্দে অভিভূত করে, যাতে আল্লাহ তাদের দ্বারা কাফেরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন।[৫০]

সুরা হাশরে আল্লাহ ইরশাদ করেন,

﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾

---

৪৮. সুরা ফাতাহ, ১৮

৪৯. *সহিহ বুখারি*, ৪১৫৪; *সহিহ মুসলিম*, ১৮৫৬

৫০. সুরা ফাতহ, ২৯

> এই ধনসম্পদ দেশত্যাগী নিঃস্বদের জন্য, যারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টিলাভের অন্বেষণে এবং আল্লাহ তাঁর রাসুলের সাহায্যার্থে নিজেদের বাস্তুভিটা ও ধনসম্পদ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। তারাই সত্যবাদী।[৫১]

﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

> যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদিনায় বসবাস করেছিল এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তারা মুহাজিরদের ভালোবাসে, মুহাজিরদেরকে যা দেওয়া হয়েছে, তজ্জন্য তারা অন্তরে ঈর্ষাপোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দান করে। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম।[৫২]

এই আয়াতগুলোর সবকটিতেই নবিজির সাহাবিদের গুণগান করা হয়েছে।[৫৩] আল্লাহ তাদের শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দিয়েছেন। তাদের প্রতি নিজের সন্তুষ্টি প্রকাশের মাধ্যমে তাদেরকে নবিদের পর উম্মতের মাঝে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছেন। যেহেতু সরাসরি কুরআনের আয়াত দ্বারাই সাহাবিদের সম্মান ও মর্যাদা প্রমাণিত, তাই ইমাম কুরতুবি বলেন,

> সাহাবিদের প্রত্যেকেই আমাদের জন্য ইমাম। তাদের মধ্যকার সংঘটিত মুশাজারাতে সাহাবা সম্পর্কে আমরা বাড়াবাড়ি করব না। আমরা উত্তমভাবে তাদের আলোচনা করব। কারণ তারা নবিজির সুহবত পেয়েছিলেন এবং নবিজি তাদেরকে গালি দিতে নিষেধ করেছিলেন। আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করেছেন এবং তাদের প্রতি নিজের সন্তুষ্টির সংবাদ দিয়েছেন।[৫৪]

কুরআনের মতোই হাদিসের মাধ্যমেও সাহাবিদের সম্মানের বিষয়টি প্রমাণিত। নবিজি বলেন, আমার যুগের লোকেরাই সর্বোত্তম ব্যক্তি, তারপর যারা তাদের নিকটবর্তী তারা উত্তম, তারপর যারা তাদের নিকটবর্তী তারা উত্তম। এরপর এমন লোকেরা আসবে যারা কসম করার আগেই সাক্ষ্য দেবে আবার সাক্ষ্য দেওয়ার

---

৫১. সুরা হাশর, ৮

৫২. সুরা হাশর, ৯

৫৩. সাহাবিদের সম্পর্কে কুরআনের আরও অনেক আয়াতে আল্লাহ প্রশংসা করেছেন। কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় সবগুলো আয়াত উল্লেখ করা হলো না। যাদের আগ্রহ হয় তারা সুরা আহযাব ২৩, সুরা নিসা ৯৫, সুরা হুজুরাত ১৫, সুরা বাকারা ১৩৭, সুরা আলে ইমরান ১১০, সুরা বাকারা ১৪৩, সুরা তাওবা ১০০, সুরা আনফাল ৭৪-৭৫ ইত্যাদি আয়াতগুলো দেখে নিতে পারেন।

৫৪. *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, ১৬/৩২১

আগেই কসম করে বসবে।[৫৫] এই হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম নববি বলেন, 'আলেমরা একমত, সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ নবিজির যুগ আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলেন সাহাবায়ে কেরাম।'[৫৬]

হাসান বসরি বলতেন, 'আমরা প্রথম যুগের মানুষদের পেয়েছিলাম, তারা ছিলেন সাহাবায়ে কেরাম, তাদের পাশে আমরা তো চোরের মতো।'[৫৭]

সাহাবিদের গালমন্দ করতে নিষেধ করে নবিজি বলেন, 'তোমরা আমার কোনো সাহাবিকে মন্দ বলো না। তোমাদের কেউ যদি উহুদ পরিমাণ স্বর্ণও দান করে তবুও তাদের এক মুদ বা তার অর্ধেকের সমপরিমাণও হবে না।'[৫৮] ইবনু হাজার আসকালানি এই হাদিসের ব্যাখ্যায় লেখেন, 'বাইযাবি বলেন, এই হাদিসের অর্থ হলো, এখন কেউ উহুদ পরিমাণ স্বর্ণ দান করেও সাহাবিদের সময়কার এক মুদ পরিমাণ খাবার দানের সমপরিমাণ মর্যাদা ও প্রতিদান পাবে না। এর কারণ তাদের ইখলাস ও নিয়তের বিশুদ্ধতা বেশি ছিল।'[৫৯]

অন্য হাদিসে নবিজি বলেন, 'যে আমার সাহাবিদের মন্দ বলবে তার ওপর আল্লাহ, ফিরিশতা এবং সমস্ত মানুষের অভিশাপ।'[৬০] সাহাবিদের ফজিলত সম্পর্কে অন্য হাদিসে নবিজি বলেন, 'জাহান্নামের আগুন সে মানুষকে স্পর্শ করতে পারে না, যে আমাকে দেখেছে, অর্থাৎ আমার সাহাবিরা।'[৬১] অন্যত্র নবিজি বলেন, 'যখন আমার সাহাবিদের আলোচনা হয় তখন তোমরা জিহ্বার ওপর লাগাম দিয়ো। অর্থাৎ, তাদের কোনো সমালোচনা করো না।'[৬২]

সাহাবিদের সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, 'আল্লাহ প্রথমে তাঁর বান্দাদের অন্তরের দিকে তাকিয়েছিলেন। তখন বান্দাদের মধ্যে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তরকে শ্রেষ্ঠ অন্তর হিসেবে পেলেন। তারপর তাঁকে তিনি নিজের জন্য নির্বাচিত করলেন। তারপর নবিজি বাদে অন্যদের অন্তরের দিকে তিনি তাকালেন। তখন নবিজির সাহাবিদের অন্তরকে শ্রেষ্ঠ অন্তর হিসেবে

---

৫৫. *সহিহ বুখারি*, ২৬৫২
৫৬. *আল-মিনহাজ*, ১৬/৮৪
৫৭. *ফাইজুল কাদির*, ৩/৪৭৯
৫৮. *সহিহ বুখারি*, ৩৬৭৩
৫৯. *ফাতহুল বারি*, ৭/৩৪
৬০. *আল-মুজামুল কাবির*, ১২৭০৯। হাদিসটির সনদ দুর্বল কিন্তু এর শাহেদ থাকায় একে হাসান হাদিস বলা যায়। দেখুন, *আন-নাওয়াফিহুল ইতরাহ*, ৩৮৩
৬১. *সহিহ বুখারি*, ৪৮৯০। *সহিহ মুসলিম*, ২৪৯৪
৬২. *জামিউস সগির*, ৬১৩

পেলেন। তখন তাদেরকে নবিজির সহকারী বানালেন। তারা তার দীনের জন্য লড়াই করে।'[৬৩]

নবিজির প্রতি সাহাবায়ে কেরামের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা কেমন ছিল তার চমৎকার মূল্যায়ন করেছেন উরওয়া ইবনে মাসউদ। ষষ্ঠ হিজরিতে হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় তিনি কুরাইশদের দূত হিসেবে নবিজির কাছে এসেছিলেন। ফিরে গিয়ে কুরাইশদের তিনি বলেছিলেন, 'হে আমার জাতি, আল্লাহর কসম, আমি কাইসার, কিসরা ও নাজ্জাশিসহ আরও অনেক রাজার দরবারে গিয়েছি। কিন্তু মুহাম্মদের সাথিরা তাকে যেভাবে শ্রদ্ধা ও সম্মান করে, তেমন সম্মান আর কাউকে করতে দেখিনি। মুহাম্মদ একবার কফ ফেললে তাঁর এক সাথির হাতে পড়ে। সে তখনই তা চেহারা ও শরীরে মালিশ করে নেয়। তিনি যখন অজু করেন সেই পানি নেওয়ার জন্য তারা প্রবল ভিড় করে। তিনি যখন কথা বলেন সবাই নীরব হয়ে যায়। তারা যখনই তার দিকে তাকায় তখন সম্মান ও ভক্তি নিয়েই তাকায়। তার সম্মানার্থে সাহাবিরা তার দিকে সরাসরি দৃষ্টি দেয় না।'[৬৪]

---
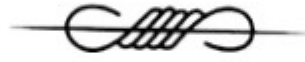
৬৩. *মুসনাদে আহমাদ*, ৩৬০০; *মুসনাদে বাযযার*, ১৮১৬; *আল-মুজামুল কাবির*, ৮৫৮৩; হাইসামির মতে এই সনদের সকল রাবি সিকাহ। দেখুন, *মাজমাউয যাওয়ায়েদ*, ১/১৭৮

৬৪. *সহিহ বুখারি*, ২৭৩১

সাহাবিদের সম্পর্কে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাতের আকিদা

সাহাবিদের সম্পর্কে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাতের আকিদা নিম্নরূপ—

১। প্রত্যেক সাহাবি আদিল ও ন্যায়নিষ্ঠ। এজন্য তাদের আদালত ও ন্যায়নিষ্ঠতা যাচাইয়ের জন্য অন্য কারও কাছে প্রশ্ন করা যাবে না।[৬৫]

২। সাহাবিদের প্রতি বিদ্বেষ রাখা এবং তাদেরকে গালি দেওয়া কুফর।[৬৬]

৩। সাহাবিদের সমালোচনা করা কবিরা গুনাহ।[৬৭]

৪। হজরত আবু বকর ও হজরত উমরের খেলাফতকে যারা অস্বীকার করবে তারাও কাফের।[৬৮]

৫। সাহাবিরা উম্মতের নেককার জামাত। তারা নবিদের মতো মাসুম বা নিষ্পাপ নন, তবে মাগফুর বা ক্ষমাপ্রাপ্ত। তাই তাদের ব্যাপারে কোনো আপত্তি উত্থাপন করা যাবে না। তাদের শানে কোনো কটু কথা বলা যাবে না।

৬। যদিও দুনিয়াতে তাদের কারও কারও গুনাহ হয়েছে, কিন্তু পরকালে তারা কৈফিয়ত থেকে মাহফুজ (নিরাপদ), কারণ গুনাহ হলে সাথে সাথে তারা তাওবা-ইসতিগফার করে নিতেন। আল্লাহ তাদের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন।
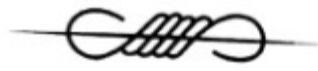
৬৫. *মুকাদ্দামাতু ইবনিস সালাহ*, ৪২৭; *ইখতিসারু উলুমিল হাদিস*, ২০৫

৬৬. *ফাতাওয়া আস-সুবকি*, ২/৫৭৫। ইমাম মালিক বলেন, 'যে নবিজির সাহাবিদের গালি দেয়, তার নসিবে ইসলাম নেই। ইসলামের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই।' দেখুন, *আস-সুন্নাহ*, ২/৫৫৭

৬৭. *শারহু মুসলিম*, ১৬/৩২৬; *তুহফাতুল আহওয়াযি*, ১০/২৪৯; ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল বলেন, 'যদি কাউকে নবিজির সাহাবিদের সমালোচনা করতে দেখো, তাহলে তার ইসলামের ব্যাপারে সন্দেহ করো।' *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৮/১৪২

৬৮. *আল-বাহরুর রায়িক*, ৫/১৩১; *ফাতাওয়া বাজ্জাজিয়া*, ৬/৩১৮

মুশাজারাতে সাহাবাসংশ্লিষ্ট কয়েকজন সাহাবির সংক্ষিপ্ত জীবনী

মুশাজারাতে সাহাবার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বেশ কজন সাহাবির চরিত্রে করা কালিমা লেপন হয়। যেসব বর্ণনার মাধ্যমে সাহাবিদের কলঙ্কিত করার চেষ্টা চালানো হয়, এগুলোর অবস্থান সম্পর্কে আমরা শুরুতে বলেছি। এককথায় বললে, এগুলোর বেশিরভাগই বানোয়াট ও জাল। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আমরা এমন কিছু বিষয় আলোচনা করব যা ইসলামের ইতিহাসের চোরাবালি বলে প্রসিদ্ধ। নানা সময় এই চোরাবালিতে ডুবে গেছেন অনেকেই। আমাদের আলোচনা যাদের ঘিরে এগোবে, তারা উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সন্তান। তাদের ফজিলত প্রমাণ করেছে স্বয়ং কুরআন কারিম। এখানে আমরা মুশাজারাতে সাহাবাসংশ্লিষ্ট কয়েকজন সাহাবির সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করব, যেন তাদের ব্যক্তিত্বটি আমাদের সামনে ফুটে ওঠে এবং মুশাজারাতে সাহাবা পাঠকালে তাদের প্রতি আমাদের মনে কোনো নেতিবাচক ধারণা ও সংশয় তৈরি না হয়।

❑ উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রা.

উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রা. ছিলেন নবিজির একান্ত সহচর ও ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর রা.-এর কন্যা। তার মায়ের নাম উম্মু রুমান বিনতু আমির। নবুয়তের পঞ্চম বর্ষের শেষের দিকে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই আয়েশা রা. ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমতী। অনেক সময় দেখা যেত তিনি বান্ধবীদের সাথে খেলাকালে সেখানে নবিজি উপস্থিত হলে তিনি দ্রুত খেলনাগুলো লুকিয়ে ফেলতেন। তার বান্ধবীরাও এদিক-সেদিক লুকিয়ে যেত। তখন নবিজি আবার শিশুদের ডেকে তার সাথে খেলতে বলতেন।[৬৯]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রথমা স্ত্রী খাদিজা রা.-এর ইনতিকালের পর, নবিজি অত্যন্ত ব্যথিত ও চিন্তিত ছিলেন। সে সময় খাওলা বিনতু হাকিম রা. নবিজিকে বলেন, আপনি কি আর বিয়ে করবেন না? নবিজি জিজ্ঞেস করলেন, কাকে? খাওলা রা. বললেন, কুমারীদের মধ্যে আয়েশা আর বিধবাদের মধ্যে সাওদা বিনতু জামআহকে করতে পারেন।

---

৬৯. *সহিহ মুসলিম*, ২৮১৬

নবিজি এতে সম্মতি দিলে দুজনের সাথেই নবিজির বিয়ে হয়।[৭০]

নবিজির এই বিয়ের সম্মতি এসেছিল স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছ থেকে। বিয়ের পর নবিজি আয়েশা রা.-কে বলেছিলেন, 'তিন রাত তোমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছিল। এক ফিরিশতা এসেছিল সাদা রেশমি কাপড়ের ওপর তোমার ছবি নিয়ে। সে আমাকে বলত, তিনি হবেন আপনার স্ত্রী।'[৭১]

হিজরতের তিন বছর আগে নবিজির সাথে আয়েশা রা.-এর বিয়ে হয়। এ সময় তার বয়স ছিল ছয় বছর। বদরের যুদ্ধের পর আয়েশা রা. বধূ হিসেবে নবিজির গৃহে আসেন। বিবাহিত জীবনের নয় বছর তিনি নবিজির সান্নিধ্যে ছিলেন। কিন্তু স্বীয় মেধার কারণে এই নয় বছর সময়ে তিনি নবিজির কাছ থেকে এত বেশি ইলম ও প্রজ্ঞা অর্জন করেন যে, পরবর্তী সময়ে তিনি শীর্ষস্থানীয় নারী আলেম ও ফকিহে পরিণত হন। সাহাবায়ে কেরাম বলতেন, 'কোনো মাসআলায় আমাদের সন্দেহ হলে আমরা আয়েশা রা.-এর কাছে যেতাম। তার কাছে পেতাম ওই বিষয়ের ইলমের সন্ধান। ইলমের জন্য তার কাছে ছুটে আসতেন সাহাবায়ে কেরাম ও তাবিয়িদের জামাত।'

নবিজির কাছে তিনি শিখেছিলেন তাফসির ও হাদিসশাস্ত্রের জ্ঞান। নবিজি থেকে তিনি প্রায় ২ হাজার ৫০০ হাদিস বর্ণনা করেছেন।[৭২] পিতা আবু বকরের কাছে শেখেন কাব্য ও বংশপরিক্রমার জ্ঞান।[৭৩] তার ভাগনে উরওয়া ইবনু যুবাইর বলেন, আমি ফিকহ, চিকিৎসাশাস্ত্র ও কাব্যশাস্ত্রে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কাউকে দেখিনি।[৭৪]

চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কে আয়েশা রা.-এর খুব ভালো জানাশোনা ছিল। বিভিন্ন রোগের নাম ও ওষুধপাতি বিষয়ে তিনি গভীর জ্ঞান রাখতেন।[৭৫] ভাষাসাহিত্যে তার দক্ষতা দেখে বড় বড় সাহিত্যিক ও ভাষাবিদরাও বলত, 'আমরা আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে তার চেয়ে বড় কোনো শুদ্ধভাষী ও বাগ্মী দেখিনি।'[৭৬] আতা ইবনু আবি রবাহ বলেন, 'আয়েশা রা. সর্বশ্রেষ্ঠ ফকিহ এবং সুন্দর মতামতদানে পারঙ্গম একজন নারী।'[৭৭]

---

৭০. *উসদুল গাবাহ*, ৭/১৮৬

৭১. *সহিহ মুসলিম*, ৪২৩

৭২. শুধু *মুসনাদে আহমাদেই* ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল তার থেকে ২ হাজার ৪০৩টি হাদিস সংকলন করেছেন। দেখুন *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং-২৪০১০-২৬৪১৩

৭৩. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ২/১৯৭

৭৪. *আল-ইসাবাহ*, ৮/২৩৩

৭৫. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ২/১৮২

৭৬. *প্রাগুক্ত*, ২/১৯১

৭৭. *উসদুল গাবাহ*, ৭/১৮৬

দানশীলতার ক্ষেত্রে তিনি নিজেই ছিলেন নিজের উপমা। অনেক সময় একদিনেই কয়েক হাজার দিরহাম দান করে দিতেন। একবার তার কাছে এক লক্ষ দিরহাম এলো। তিনি সন্ধ্যার আগেই সব দান করে দিলেন। সেদিন তিনি রোজাদার ছিলেন। তার দাসী বলল, 'আম্মাজান, আজ তো আমাদের ইফতারের জন্য কিছু নেই। আপনি চাইলে তো ইফতারের জন্য কিছু রাখতে পারতেন।' আয়েশা রা. বললেন, 'তুমি কথাটি তখন মনে করালে ভালো হতো।'[৭৮] মূলত দানের বিষয়টিতে তিনি উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন নবিজির কাছেই। একবার এক ভিক্ষুক ভিক্ষা চাইলে আয়েশা রা. তাকে কিছু দান করেন। তখন নবিজি তাকে বলেন, 'আয়েশা, গুনে গুনে দান করো না, তাহলে আল্লাহও তোমাকে গুনে গুনে দান করবেন।'[৭৯]

নবিজি আয়েশা রা.-কে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। একবার আমর ইবনুল আস রা. নবিজিকে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনার কাছে সবচেয়ে প্রিয় কে? নবিজি বলেন, আয়েশা।'[৮০]

নবিজির সংসারে অভাব-অনটন লেগেই থাকত। আয়েশা রা. নিজেই বলেন, 'নবিজির পরিবারে কখনো এমন হয়নি যে একটানা তিন দিন পেটভরে খাবার জুটেছে। মাসের পর মাস চুলায় আগুন জ্বলত না। শুকনো খেজুর ও পানিতেই দিন কাটাতে হতো।'[৮১] অভাবের অবস্থা এমন ছিল, যেদিন নবিজি ইনতিকাল করেন সেদিনও আয়েশা রা.-এর ঘরে একদিন পার করার মতো খাবার ছিল না।[৮২] ঘরের সব কাজ আয়েশা রা. নিজ হাতে করতেন। তিনি নিজেই আটা বানাতেন। খামির বানাতেন, খানা পাকাতেন। নবিজির জন্য বিছানা করে দিতেন। অজুর পানি আনার কাজটিও করতেন নিজে। নবিজির কোরবানির জন্য যে উট আনা হতো, তাও দেখাশোনা করতেন তিনি। নবিজি কাপড় ধুয়ে দেওয়া কিংবা তার শরীরে সুগন্ধি লাগিয়ে দেওয়ার কাজটিও তিনিই করতেন। বয়সের স্বল্পতার কারণে অনেক সময় দেখা যেত তিনি রান্না করতে করতে ঘুমিয়ে পড়তেন, এদিকে বকরি এসে সব আটা খেয়ে ফেলত।[৮৩]

নবিজি আয়েশা রা.-কে অত্যন্ত ভালোবাসতেন, স্নেহ করতেন। উমর রা. একবার তার কন্যা হাফসা রা.-কে বলেছিলেন, 'মা, আয়েশাকে হিংসা করো না। সে নবিজির প্রিয়পাত্রী।' নবিজি প্রায়ই আয়েশা রা.-এর সাথে নানা গল্প করতেন। একবার তিনি আয়েশা রা.-কে খুরাফার গল্পের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। একবার

---

৭৮. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ২/১৮৬
৭৯. *সুনানে আবু দাউদ*, ২৩৩৪
৮০. *সহিহ বুখারি*, ৩৬৬২
৮১. *সহিহ বুখারি*, *মুসনাদে আহমাদ*, *মুসনাদে তয়ালিসি* দ্রষ্টব্য।
৮২. *সুনানুত তিরমিযি*, ৪০৭
৮৩. *সহিহ বুখারি*, ১৬১৭

আয়েশা রা. নবিজির সাথে মৃদু তর্ক করছিলেন। এ সময় আবু বকর রা. সেখানে উপস্থিত হলে তিনি রেগে যান। আয়েশা রা. নবিজির সাথে বেয়াদবি করছে ভেবে তিনি তাকে চড় দিতে যান। নবিজি দ্রুত আবু বকরের হাত ধরে ফেলেন। পরে তিনি চলে গেলে নবিজি আয়েশা রা.-কে বলেন, 'দেখলে তোমাকে কীভাবে বাঁচালাম।' একবার ইদের দিন হাবশিরা বিভিন্ন শারীরিক কসরত প্রদর্শন করছিল। আয়েশা রা. তা দেখার আগ্রহ প্রকাশ করলে নবিজি তাকে দেখার সুযোগ করে দেন। দুবার নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশা রা.-এর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করেন। নবিজি বিভিন্ন সফরে স্ত্রীদের সাথে নিয়ে যেতেন। আয়েশা রা.-ও নবিজির সাথে সফরে যাওয়ার বিরল সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। অনেক সময় নবিজি আয়েশা রা.-এর সাথে এক বাসনে খাবার খেতেন। পেয়ালার যে অংশে আয়েশা রা. মুখ লাগাতেন নবিজিও সেই অংশে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতেন।[৮৪]

নবিজির ইনতিকালের পরেও আয়েশা রা. দীর্ঘসময় বেঁচেছিলেন। খুলাফায়ে রাশিদিনের পুরো সময়কাল তিনি পেয়েছিলেন। নিজ চোখেই দেখেছিলেন মুসলমানদের দিগ্বিজয়। পুরো সময়টা তিনি কাটিয়েছিলেন ইলমের চর্চা ও ইবাদতের মাধ্যমে। হজরত মুআবিয়া রা.-এর শাসনকালের শেষদিকে ৫৮ হিজরিতে তিনি ইনতিকাল করেন। এ সময় তাঁর বয়স ছিল ৬৭ বছর। তাঁর ইনতিকালের পর লোকজনের কান্নার শব্দ শুনে উম্মু সালামা বলেন, 'আয়েশা রা.-এর জন্য জান্নাত ওয়াজিব। তিনি নবিজির প্রিয়তমা স্ত্রী ছিলেন।'[৮৫] আবু হুরাইরা রা. সে সময় মদিনায় অবস্থান করছিলেন। তিনিই উম্মুল মুমিনিনের জানাজা পড়ান। অসিয়ত অনুসারে তাঁকে জান্নাতুল বাকিতে সমাহিত করা হয়। তাঁর জানাজার দিন মদিনার আকাশে নেমে এসেছিল শোকের কালো মেঘ। একজন মদিনাবাসীকে কেউ জিজ্ঞেস করেছিল, 'আয়েশা রা.-এর ইনতিকালের দিন মদিনাবাসীর অবস্থা কেমন ছিল?' ওই ব্যক্তি জবাব দেয়, 'সন্তানমাত্রই তাদের মায়ের মৃত্যুশোকে ব্যথিত ছিলেন।'[৮৬]

আয়েশা রা.-এর ফজিলত ও মর্যাদা

১। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন আয়েশা রা.-কে বলেন, 'হে আয়েশা, জিবরাইল তোমাকে সালাম জানিয়েছেন।'[৮৭] এই হাদিস থেকে আয়েশা রা.-এর মর্যাদা স্পষ্ট হয়।

---

৮৪. *সহিহ বুখারি, সুনানে আবু দাউদ, মুসনাদে আহমাদ* দ্রষ্টব্য।

৮৫. *মুসনাদু তয়ালিসি*, ২২৪

৮৬. *আত-তবাকাতুল কুবরা*, ১/৫৪

৮৭. *সহিহ মুসলিম*, ৬৪৫৪

২। নবিজি বলেন, 'অন্য নারীদের ওপর আয়েশার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব যেমন সকল খাবারের ওপর সারিদের[৮৮] শ্রেষ্ঠত্ব।'[৮৯]

৩। নবিজি একবার উম্মে সালামা রা.-কে বলেছিলেন, 'হে উম্মে সালামা, তোমরা আয়েশার ব্যাপারে আমাকে কষ্ট দিয়ো না। আল্লাহর কসম, তোমাদের মধ্যে আয়েশা ছাড়া অন্য কারও সাথে শয্যাশায়ী অবস্থায় আমার ওপর ওহি নাজিল হয়নি।'[৯০]

❑ উসমান রা.

উসমান রা. ছিলেন নবিজির প্রিয় জামাতা এবং ইসলামের তৃতীয় খলিফা। তিনি ছিলেন কুরাইশ বংশের উমাইয়া গোত্রের সদস্য। তার পিতার নাম আফফান, মায়ের নাম আরওরা বিনতু কুরাইজ। উসমান রা.-এর নানি উম্মু হাকিম আল-বাইজা ছিলেন নবিজির আপন ফুফু।[৯১] এ হিসেবে উসমান রা. ছিলেন নবিজির ফুফাতো বোনের ছেলে। বিশুদ্ধ বর্ণনামতে, আবরাহা কর্তৃক মক্কা আক্রমণের ছয় বছর পরে উসমান রা. জন্মগ্রহণ করেন।[৯২]

ইবনু শিহাব যুহরি বলেন, 'উসমান রা. ছিলেন আকর্ষণীয় চেহারা ও চুলের অধিকারী। শরীরের উচ্চতা ছিল স্বাভাবিক। মাথার সামনের দিকে কিছু চুল পড়ে গিয়েছিল। উভয় পায়ের মাঝে ছিল সুন্দর দূরত্ব।[৯৩] তার দাঁত ছিল চমৎকার, চেহারা ছিল ফরসা।'[৯৪]

বাল্যকাল থেকেই উসমান রা. ছিলেন শান্ত ও মিষ্ট স্বভাবের অধিকারী। জাহিলি যুগে তাকে সমাজের গণ্যমান্য ও অভিজাত ব্যক্তিদের মধ্যে গণনা করা হতো। জাহিলি যুগেও তিনি কখনো জিনা-ব্যভিচার করেননি, মূর্তির সামনে মাথানত করেননি, গানবাজনা করেননি, পরনারীর দিকে তাকাননি, এমনকি মদ্যপানও করেননি। অথচ সে সময়কার আরব সমাজে এগুলো ছিল খুবই স্বাভাবিক বিষয়।[৯৫]

---

৮৮. রুটি ও গোশত দ্বারা তৈরি একপ্রকার খাবার।

৮৯. *সহিহ বুখারি*, ৩৭৬৯

৯০. *সহিহ বুখারি*, ৩৭৭৫

৯১. যুবাইর ইবনু বাক্কারের এক বর্ণনামতে, উসমান রা.-এর নানি ও নবিজির পিতা আবদুল্লাহ ছিলেন জমজ ভাইবোন। দেখুন, *আল-খিলাফাতুর রাশিদা ওয়াদ-দাওলাতুল উমাবিয়্যা*, ৩৮৮

৯২. *আস-সুনানুল কুবরা*, ৭/৭৩

৯৩. *তারিখুত তবারি*, ৫/৪৪০

৯৪. *সিফাতুস সাফওয়াহ*, ১/২৯৫

৯৫. *মাওসুয়াতুত তারিখিল ইসলামি*, ১/৬১৮

আর্থিক দিক থেকে উসমান রা. ছিলেন স্বাবলম্বী। পিতার কাছ থেকে মিরাস হিসেবে বেশ সম্পদ পান, পরে ব্যবসার মাধ্যমে এই সম্পদ আরও বৃদ্ধি করেন। নবিজি যখন মক্কায় ইসলাম প্রচার শুরু করেন, সে সময় তার বয়স ছিল ৩৪ বছর। তার কাছে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে যান আবু বকর রা.। উসমান রা. ইসলামের দাওয়াত পেয়ে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি, তিনি সাথে সাথেই ইসলাম গ্রহণ করেন। আবু ইসহাকের মতে, আবু বকর রা., আলি রা. ও জায়েদ বিন হারিসা রা.-এর পরেই উসমান রা. ইসলাম গ্রহণ করেন।[৯৬]

ইসলাম গ্রহণের পর নবিজি উসমান রা.-এর সাথে নিজের মেয়ে রুকাইয়াকে বিবাহ দেন। তাঁর এই বিবাহে আরবের লোকজন বলাবলি করতে থাকে, 'মানুষ এর আগে কখনো রুকাইয়া ও তাঁর স্বামী উসমান রা.-এর মতো সুদর্শন যুগল দেখেনি।' একবার নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রুকাইয়ার ঘরে প্রবেশ করে দেখেন, রুকাইয়া তার স্বামী উসমান রা.-এর মাথা ধুয়ে দিচ্ছেন। তখন নবিজি তাকে বলেন, 'মা, তার সাথে সুন্দর ব্যবহার করো। নিশ্চয় সে আমার সাহাবি। চরিত্রের দিক থেকে সে আমার সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ।'[৯৭]

ইসলাম গ্রহণের কারণে মক্কার মুসলমানদের ওপর কুরাইশরা কঠোর নির্যাতন চালায়। এ সময় নবিজি হিজরতের অনুমতি দিলে উসমান রা. ও তার স্ত্রী রুকাইয়া আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন।

পরে নবিজি মদিনায় হিজরত করলে উসমান রা.-ও মদিনা আসেন। এ সময় তিনি অর্জন করেন নবিজির সার্বক্ষণিক সান্নিধ্য। তবে বদরের যুদ্ধে রুকাইয়া রা. অসুস্থ থাকায় নবিজির নির্দেশে উসমান রা. মদিনায় অবস্থান করেন। তিনি বদরের যুদ্ধে অংশ নিতে পারেননি। কিন্তু নবিজি তার অপারগতাকে সম্মান দিয়ে গনিমতের মালে তাকেও অংশ দেন। পরে উহুদসহ অন্যান্য যুদ্ধে উসমান রা. গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। হুদাইবিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে উসমান রা.-কে মক্কায় আটক করা হলে নবিজি ১ হাজার ৪০০ সাহাবি থেকে জিহাদের বাইআত নেন। এ সময় তিনি নিজের ডান হাত বাম হাতের ওপর রেখে বলেন, এই হাত উসমানের হাতের পক্ষ থেকে। এই বাইআতের প্রশংসা করে আল্লাহ তাআলা কুরআন কারিমের আয়াতও অবতীর্ণ করেন। বিশেষ করে তাবুকের যুদ্ধে তিনি অনেক দান করেছিলেন। ইবনু শিহাব যুহরি বলেন, 'উসমান রা. তাবুকের যুদ্ধে ৯৪০টি উট ও ৬০টি ঘোড়া দান করেছিলেন। এর সাথে দান করেন ১০ হাজার দিরহাম।' নবিজি তখন বলেছিলেন, 'আজকের পর উসমান যা-ই করবে তার কোনো ক্ষতি হবে

---

৯৬. *আত-তবাকাতুল কুবরা*, ৩/৫৫

৯৭. *মাজমাউয যাওয়ায়েদ*, হাদিস নং-১৪৫০০

না।'[৯৮] তৃতীয় হিজরিতে নবিজির আরেক কন্যা উম্মু কুলসুমের সাথে উসমান রা.-এর বিবাহ হয়। নবিজির দুইজন কন্যাকে তিনি বিবাহ করেছিলেন বলে তাকে বলা হয় 'যিন-নুরাইন' বা দুই আলোর মালিক। নবম হিজরিতে উম্মু কুলসুমও ইনতিকাল করেন। সে সময় নবিজি বলেন, হে উসমান, আমার যদি আর কোনো কন্যাসন্তান থাকত তাহলে আমি তাকেও তোমার সাথে বিবাহ দিতাম।[৯৯]

আবু বকর রা.-এর শাসনকালে উসমান রা. ছিলেন মজলিসে শুরার সদস্য। এটি ছিল খলিফাতুল মুসলিমিনের পর মুসলমানদের সর্বোচ্চ পরিষদ। শুরার পরামর্শ নিয়েই বেশিরভাগ সিদ্ধান্ত নেওয়া হতো। আবু বকর রা. প্রায়ই বিভিন্ন বিষয়ে উসমান রা.-এর পরামর্শ নিতেন। একবার মদিনায় খাদ্যাভাব দেখা দেয়। সে সময় ১০০ উটবোঝাই খাদ্য এসেছিল উসমান রা.-এর কাছে। এগুলো ছিল তার ব্যবসায়িক সম্পদ। তিনি এর পুরোটাই দান করে দেন।[১০০]

উমর রা.-এর খেলাফতকালেও উসমান রা. ছিলেন রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। সে সময় তাঁকে বলা হতো রাদিফ। রাদিফ অর্থ যিনি কারও পেছনে বা পাশে থাকেন এবং তার অবর্তমানে কাজ পরিচালনা করতে পারেন। আরবরা সাধারণত এমন লোকদের ব্যাপারে এই শব্দ ব্যবহার করত যাদের ব্যাপারে তাদের ধারণা হতো, তিনি পরবর্তী সময়ে নেতা হবেন।[১০১] উমর রা. নানা বিষয়ে উসমান রা.-এর পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতেন। একবার তিনি বাইতুল মাল সম্পর্কে উসমান রা.-এর সাথে পরামর্শ করেন।[১০২]

উমর রা.-এর শাহাদাতের পর মজলিসে শুরার সিদ্ধান্তক্রমে মুসলিমবিশ্বের খলিফা হন উসমান রা.। তাঁর খেলাফতকালে কুরআন সংকলন করা হয়, এবং একটি মুসহাফের ব্যাপারে সবাই ঐক্যবদ্ধ হন। এ সময় আজারবাইজান ও খুরাসান মুসলমানরা জয় করে। সিরিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন এলাকাও উসমান রা.-এর শাসনামলে জয় হয়। রাষ্ট্রের সর্বত্র সুশাসন ছিল। তিনি শাসন পরিচালনা করছিলেন খুলাফায়ে রাশিদার মূলনীতি অনুসারেই। কিন্তু দুষ্কৃতকারী সাবায়ি সম্প্রদায় তাঁর বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার চালিয়ে মূর্খ জনতাকে উত্তেজিত করে তোলে, যার পরিণামে ঘটে উসমান রা.-এর শাহাদাতের মতো ন্যক্কারজনক ও দুঃখভারাক্রান্ত ঘটনা।

---

৯৮. *জামে তিরমিযি*, ৩৭৮৫

৯৯. *মাজমাউয যাওয়ায়েদ*, হাদিস নং-১২৭৬

১০০. *আর-রিক্কাতু ওয়াল-বুকা*, ১৯০। *শহিদুদ্দার*, ২১

১০১. *তারিখুত তবারি*, ৪/৯১

১০২. *উসমান ইবনু আফফান লি-খলিফা আশ-শাকির*, ৬৩

উসমান রা.-এর শ্রেষ্ঠত্ব

১। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু মুসা আশআরিকে উসমান রা. সম্পর্কে বলেছিলেন, 'তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও।'[১০৩]

২। নবিজি উসমান রা. সম্পর্কে বলেন, 'আমি কি এমন ব্যক্তিকে লজ্জা করব না যাকে ফিরিশতারাও লজ্জা করে।'[১০৪]

৩। একবার নবিজি উসমান রা.-এর দিকে ইশারা করে বলেন, 'অচিরেই ফিতনা শুরু হবে। তখন এই ব্যক্তি ও তাঁর অনুসরণকারীরা হকের ওপর থাকবে।'[১০৫] আরেকবার তিনি সাহাবিদেরকে বলেন, 'ফিতনার যুগে তোমরা তাঁর সাথে থাকবে।'[১০৬]

৪। নবিজি বলেন, 'আমার উম্মতের মাঝে সবচেয়ে লজ্জাশীল হলেন উসমান।'[১০৭]

৫। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উসমান রা.-কে বলেছিলেন, 'হে উসমান, আল্লাহ তোমাকে একটি জামা (খেলাফত) পরিধান করাবেন। মুনাফিকরা তোমার কাছ থেকে তা কেড়ে নিতে চাইলে তুমি তাদের দাবিতে তা ত্যাগ করবে না যতক্ষণ না তুমি আমার সাথে মিলিত হও।'[১০৮]

❑ আলি রা.

আলি রা. ছিলেন নবিজির প্রিয় জামাতা ও চাচাতো ভাই। তিনি ইসলামের চতুর্থ খলিফা। নবিজির চাচা আবু তালিবের ঘরে আলি রা.-এর জন্ম নবিজি নবুয়তপ্রাপ্তির ১০ বছর আগে। নবিজি চাচাতো ভাইকে অনেক আদর করতেন বিধায় বাল্যকালেই তাকে নিজের কাছে নিয়ে আসেন। নবিজির গৃহেই প্রতিপালিত হন আলি রা.। নবিজির নবুয়তপ্রাপ্তির পর একদিন আলি রা. ঘরে প্রবেশ করে দেখেন খাদিজা রা. সিজদা করছেন। আলি রা. জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি কী করছেন?' খাদিজা রা. বলেন, 'আমি এক আল্লাহর ইবাদত করছি। তোমাকেও এর দাওয়াত দিচ্ছি।' আলি রা. তখনই ইসলাম গ্রহণ করে নেন। আলি রা. ছিলেন শুরুর দিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন। তবে আবু বকর রা., যায়দ বিন

---

১০৩. *সহিহ বুখারি*, ৩৬৯৫
১০৪. *সহিহ মুসলিম*, ২৪০২
১০৫. *মুসনাদে আহমাদ*, ৫৪৩২
১০৬. *ফাজায়িলুস সাহাবা*, ১/৫৫০
১০৭. প্রাগুক্ত, ১/৬০৩
১০৮. প্রাগুক্ত, ১/৬৩৪

হারিসা রা. ও আলি রা.-এর মধ্যে কে প্রথম ইমান এনেছিলেন তা নিয়ে আলেমদের মতপার্থক্য আছে।[১০৯]

মক্কার জীবনে আলি রা. সবসময় নবিজির সাথে ছিলেন। হিজরতের কঠিন মুহূর্তে নবিজি তাকে দায়িত্ব দেন, কাফেরদের আমানত তাদের হাতে বুঝিয়ে দেওয়ার। আলি রা. নিশ্চিন্তে নবিজির বিছানায় শুয়ে পড়েন, নবিজি ও আবু বকর রা. রওনা হন মদিনার পথে। আলি রা. জানতেন নবিজির গৃহ ঘিরে ফেলেছে কাফেররা, যেকোনো সময় হামলা করে তাকে হত্যা করতে পারে তারা, কিন্তু তবু তিনি বিন্দুমাত্র ভয় পাননি। এমনকি কাফেররা যখন তাকে আটক করে তখনও তিনি নির্ভীকচিত্তে যার যার পাওনা তাকে বুঝিয়ে দেন।

মদিনায় পৌঁছে নবিজি আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ সময় নবিজি আলি রা.-কে বলেছিলেন, 'হে আলি, তুমি আমার ভাই।' পরে অবশ্য নবিজি আলি রা. ও সাহল বিন হুনাইফের মাঝে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে দেন। দ্বিতীয় হিজরিতে আলি রা.-এর সৌভাগ্যের মুকুটে যুক্ত হয় আরেকটি পালক। এ সময় নবিজি তার আদরের কন্যা ফাতিমা রা.-এর সাথে বিয়ে দেন আলি রা.-এর।

তাবুকের যুদ্ধ ছাড়া সকল যুদ্ধেই অংশ নেন আলি রা.। অনেক যুদ্ধে তিনি ছিলেন নবিজির পতাকাবাহী। ওহুদে যখন মুসলিম বাহিনী কাফেরদের আক্রমণের সামনে কিছুটা টালমাটাল হয়েছিল তখন যে-কজন সাহাবি নবিজির চারপাশে ব্যূহ তৈরি করে নবিজির নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিলেন, আলি রা. ছিলেন তাদের একজন।

খন্দকের যুদ্ধে আমর ইবনে আবদি উদ বর্ম পরে বের হয়। সে মুসলমানদের লক্ষ করে বলতে থাকে, 'কে আছ আমার সাথে লড়াই করবে?' আলি রা. বলেন, আমি প্রস্তুত। নবিজি বললেন, 'এ হচ্ছে আমর, তুমি বসো।' মূলত আমর ছিল আরবের বীরযোদ্ধা। এজন্য নবিজি একটু সতর্কতার সাথে পরিস্থিতি যাচাই করতে চাচ্ছিলেন। আমর আবার হাঁক দেয়, 'তোমাদের মধ্যে সাহসী কেউ নেই?' আলি রা. আবার উঠে দাঁড়ান। নবিজি তাকে নিবৃত্ত করেন। আমর তৃতীয়বারের মতো দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান করলে আলি রা. আবার অনুমতি চান। এবার নবিজি তাকে অনুমতি দেন। আলি রা. তরবারি হাতে আমরের দিকে এগিয়ে গেলে সে জিজ্ঞেস করে, 'তোমার নাম কী?' আলি রা. নাম বললে সে পিতার নাম জিজ্ঞেস করে। পিতার নাম শুনে সে বলে, 'ভাতিজা, তোমার রক্ত ঝরানো আমি পছন্দ করি না।' আলি রা. বললেন, 'আল্লাহর কসম, তোমার রক্ত ঝরানো আমি অপছন্দ করি না।' এতে আমর খেপে এমন তীব্র আঘাত হানে যে আলি রা.-এর ঢাল দু টুকরো হয়ে

---

১০৯. *আত-তবাকাতুল কুবরা*, ৩/২১

যায়। আলি রা. পাল্টা আঘাতে আমরকে ধরাশায়ী করে ফেলেন। এ দৃশ্য দেখে নবিজি তাকবির দিয়ে ওঠেন।[১১০]

সপ্তম হিজরিতে খাইবারের অভিযানেও আলি রা. বীরত্ব দেখান। এ সময় নবিজি বলেছিলেন, আগামীকাল এমন একজনের হাতে পতাকা তুলে দেবো, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রিয়। তাঁর হাতেই কেল্লার পতন ঘটবে। পরদিন তিনি আলি রা.-এর হাতে পতাকা তুলে দেন। তাঁর হাতেই খাইবার দুর্গের পতন ঘটে।[১১১] নবম হিজরিতে মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে প্রথম ইসলামি হজ অনুষ্ঠিত হয়। এ বছর হজরত সিদ্দিকে আকবর রা. ছিলেন আমিরুল হজ। তবে কাফেরদের সাথে সম্পাদিত সকল চুক্তি বাতিল ঘোষণার জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলি রা.-কে বিশেষ দূত হিসেবে পাঠান।

নবিজি আলি রা.-কে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। উসমান রা.-এর ইনতিকালের পর সৃষ্ট জটিলতায় একটি পক্ষ তীব্র আলি বিরোধী অবস্থান নেয়। এমনকি উমাইয়া গভর্নর মারওয়ান ইবনুল হাকামের আদেশে এ সময় মসজিদের মিম্বরেও আলি রা.-কে বাধ্যতামূলত ভর্ৎসনা করা হতে থাকে। এ অবস্থা দেখে উম্মুল মুমিনিন উম্মে সালামা রা. বলেন, 'তোমাদের সামনে আলি রা. ও তাঁর সঙ্গীদের মন্দ বলা হয়, অথচ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহর রাসুল তাঁকে ভালোবাসতেন।'[১১২]

নবিজি আলি রা.-কে ইয়ামানের বিচারক নিযুক্ত করেছিলেন। সেখানে যাওয়ার সময় আলি রা. বলেছিলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি আমাকে ইয়ামানে পাঠাচ্ছেন, ওখানকার সব বিচার-ফয়সালা আমাকেই করতে হবে, অথচ বিচার-আচার সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।' এ কথা শুনে নবিজি মুচকি হাসি দেন। তিনি আলি রা.-এর বুকে হাত রেখে দুআ করেন, 'হে আল্লাহ, তাঁর জবানকে সঠিক কথা বলার তাওফিক দিন। অন্তরকে দিন দৃঢ়তা।' আলি রা. বলেন, 'ওই সত্তার কসম যিনি খাবার ও প্রাণ সৃষ্টি করেছেন, এরপর থেকে কখনো দুই পক্ষের বিবাদ নিরসনে আমার মনে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়নি।'[১১৩]

নবিজির ওফাতের পর তাঁর নিকটাত্মীয়রাই কাফন-দাফনের দায়িত্ব পালন করেন। হজরত আলি রা. গোসল দেওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। মুহাজির ও আনসাররা তখন দরজার বাইরে অপেক্ষা করছিলেন। মূলত এ ছিল এক বিরল সৌভাগ্য। আবু বকর, উমর ও উসমান রা.-এর শাসনকালে আলি রা. ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ উপদেষ্টা।

---

১১০. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৪/১০৬

১১১. *আত-তবাকাতুল কুবরা*, ৩/২৪

১১২. *মুসনাদে আহমাদ*, ৮৭৩৫। *মাজমাউয যাওয়ায়েদ*, ৯/১৩০

১১৩. *আত-তবাকাতুল কুবরা*, ২/৩৩৭

খলিফারা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তার সাথে পরামর্শ করতেন। উমর রা. বাইতুল মাকদিস সফরকালে মদিনায় আলি রা.-কে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে যান। উসমান রা.-এর শাসনকালের শেষদিকে বিদ্রোহীদের দ্বারা অবরুদ্ধ হলে তাকে উদ্ধারে আলি রা. অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন, এমনকি তিনি নিজের দুই সন্তানকে আদেশ দেন উসমান রা.-এর নিরাপত্তা দেখভালের জন্য।[১১৪]

উসমান রা.-এর শাহাদাতের পর মদিনাবাসীর ইজমা বা সর্বসম্মতিক্রম মতানুযায়ী আলি রা.-এর খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। সময়টা ছিল রাজনৈতিক অস্থিরতার। এ সময় তাকে নানা ধকল সামলাতে হয়। জংগে জামাল ও জংগে সিফফিনের মতো বড় দুটি যুদ্ধ ঘটে এ সময়। সাধারণত প্রচার করা হয় অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে আলি রা.-এর সময়কালে বিজয়ধারা থেমে গিয়েছিল। এ কথা সত্য নয়। বরং আলি রা.-এর আদেশে হারিস ইবনু মুররা বেলুচিস্তানে অভিযান পরিচালনা করেন, এবং বেশ কিছু এলাকা জয় করেন।[১১৫]

খলিফা হওয়ার পরেও আলি রা. সাধারণ জীবনযাপন করতেন। একবার তিনি বাজারে গিয়ে এক দিরহামের খেজুর কিনে তা পাগড়ির কোনায় বেঁধে নেন। এক ব্যক্তি তাঁকে বলে, 'আমিরুল মুমিনিন, খেজুরগুলো আমাকে দিন, আমি এগিয়ে দিচ্ছি।' আলি রা. জবাব দিলেন, 'যার বোঝা তাকেই তা বহন করতে দেওয়া উচিত।'[১১৬]

সে সময় সৃষ্ট রাজনৈতিক জটিলতার ফলে খারিজি ফিরকার আবির্ভাব হয়। তারা পাইকারি হারে সবাইকে কাফের ঘোষণা দিতে থাকে। তারা সিদ্ধান্ত নেয় আলি রা.-কে হত্যা করা হবে। এ সিদ্ধান্তমতে ৪০ হিজরির ১৭ রমজান তারা কুফায় পাঠায় নির্ধারিত ঘাতক আবদুর রহমান ইবনু মুলজামকে। আলি রা. সকালে ফজরের নামাজের উদ্দেশ্যে মসজিদের দিকে যাচ্ছিলেন, এ সময় দুই খারিজি ঘাতক তার ওপর হামলা করে তাকে শহিদ করে দেয়।[১১৭]

আলি রা.-এর মর্যাদা

রাফিজিরা যেমন আয়েশা রা. ও মুআবিয়া রা.-এর ওপর ক্ষোভ মেটায়, তেমনই নাসিবিরা ক্ষোভ মেটায় আলি রা.-এর ওপর। অথচ তিনিও একজন মর্যাদাশীল সাহাবি। খুলাফায়ে রাশিদার একজন। তার বিষয়েও কোনো নেতিবাচক মন্তব্য করার বা ধারণা রাখার সুযোগ নেই।

---

১১৪. *তারিখু খলিফা ইবনি খইয়াত*, ১৭৪
১১৫. *তারিখু খলিফা ইবনি খইয়াত*, ১৯১। *ফুতুহুল বুলদান*, ৪১৬
১১৬. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৮/৫
১১৭. *তারিখুত তবারি*, ৫/১৪৪

১। নবিজি আলি রা.-কে লক্ষ করে বলেছিলেন, 'আমি তোমার, তুমি আমার।'[১১৮]

২। সাইদ বিন যায়দ বলেন, নবিজি বলেছিলেন, 'কুরাইশের ১০ জন ব্যক্তি জান্নাতি। আবু বকর, উমর, উসমান, আলি, তালহা, যুবাইর, সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস, সাইদ ইবনু যায়দ, আবদুর রহমান ইবনু আওফ, আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ।'[১১৯]

৩। নবিজি আলি রা.-কে বলেন, 'হে আলি, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে হারুন আ. মুসা আ.-এর কাছে যে মর্যাদা পেয়েছিলেন তুমিও আমার কাছে সেই মর্যাদা লাভ করো।'[১২০]

৪। উমর রা. বলতেন, 'আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ইনসাফকারী আলি।'[১২১]

৫। মুআবিয়া রা.-এর সাথে আলি রা.-এর শক্ত দ্বিমত ছিল, কিন্তু তবু তিনি বারবার আলি রা.-এর ফিকহি যোগ্যতার স্বীকৃতি দিয়েছেন। প্রায়ই তাকে কিছু জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলতেন, 'যাও, আলিকে জিজ্ঞেস করো।'[১২২]

❑ মুআবিয়া রা.

মুআবিয়া রা. ছিলেন কুরাইশ বংশের বনু উমাইয়া শাখার অত্যন্ত প্রতিভাবান ও সম্ভ্রান্ত একজন ব্যক্তিত্ব। নেতৃত্ব ও প্রশাসনিক কাজের সকল দক্ষতা তার মধ্যে ছিল। তিনি জন্মেছিলেন কুরাইশদের একটি নেতৃত্বস্থানীয় পরিবারে। তার পিতা আবু সুফিয়ান ছিলেন কুরাইশদের সবচেয়ে বড় নেতা। একাধিকবার তিনি মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে নামেন এবং নবিজির জীবনের শেষদিকে, মক্কা বিজয়ের সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে মুআবিয়া রা.-এর আগেই সপ্তম হিজরিতে ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তার বয়স ছিল ১৮ বছর।[১২৩]

শৈশবকালেই মুআবিয়া রা.-এর মাঝে নানা গুণ দেখা যায়। বিশেষ করে তাঁর মেধার প্রতিফলন দেখে অনেকেই বলে বসত, 'আল্লাহর কসম, এই শিশু তো তার কওমের নেতা হবে।'[১২৪] সে সময় মক্কায় শিক্ষার হার কম ছিল, কিন্তু মুআবিয়া রা. ছিলেন শিক্ষিত। মক্কা বিজয়ের পর নবিজি তাকে ওহি লেখার দায়িত্ব দেন।

---

১১৮. *সহিহ বুখারি*, ২৬৯৯

১১৯. *আস-সুনানুল কুবরা*, ৮১৫৩। *মুসনাদে হুমাইদি*, ৮৪

১২০. *সহিহ বুখারি*, ৩৭০৬

১২১. *সহিহ বুখারি*, ৪৪৮১

১২২. *ফাজায়িলুস সাহাবা*, ১১৫৩

১২৩. *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, ৫৯/৫৭। *আত-তবাকাতুল কুবরা*, ৭/৪০৬

১২৪. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ৩/১২১

আরবের বিভিন্ন এলাকার শাসকদের কাছে নবিজি যে পত্র পাঠাতেন সেগুলো লেখার দায়িত্বও দেওয়া হয় মুআবিয়া রা.-কে।[১২৫]

মুআবিয়া রা. তিন বছর নবিজির সান্নিধ্য অর্জন করেছিলেন। এ সময় তিনি অনেক হাদিস শ্রবণ করেন ও বর্ণনা করেন। তার থেকে ১৬৩টি হাদিস বর্ণিত হয়েছে।[১২৬] নবিজি হজরত মুআবিয়ার ওপর অনেক বেশি সন্তুষ্ট ছিলেন। বিভিন্ন সময় তিনি তাঁর জন্য অনেক দুআ করেছেন। নবিজি এমন কিছু ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, যা থেকে বোঝা যাচ্ছিল মুআবিয়া রা. পরে নেতা হবেন। তিনি একবার মুআবিয়া রা.-কে বলেন, 'হে মুআবিয়া, যদি তোমাকে প্রশাসনের দায়িত্ব দেওয়া হয়, তাহলে আল্লাহকে ভয় করবে এবং ন্যায়নিষ্ঠার সাথে কাজ করবে।' মুআবিয়া রা. বলতেন, নবিজির এই বাণীর কারণে আমার সবসময় মনে হতো আমাকে প্রশাসনের পরীক্ষায় ফেলা হবে। অবশেষে আমাকে সেই পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে।'[১২৭]

নবিজির ইনতিকালের পর আবু বকর রা. খলিফা হলে বিভিন্ন এলাকায় মুসলিম সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। এ সময় মুআবিয়া তার বড় ভাই ইয়াযিদ বিন আবি সুফিয়ানের সাথে শামের ময়দানে লড়াই করেন এবং সাহসের প্রদর্শন করে সবার দৃষ্টি কাড়তে সক্ষম হন। শাম বিজিত হলে উমর রা. মুআবিয়া রা.-কে শামের গভর্নর বানান। বিষয়টি সাধারণ কিছু ছিল না। কারণ সে সময় শাম ছিল মুসলমানদের গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত, যেখানে প্রতিনিয়ত হামলার পাঁয়তারা কষত রোমানরা। এত গুরুত্বপূর্ণ এলাকার দায়িত্ব অর্পণ করা থেকেই বোঝা যায় উমর রা. মুআবিয়া রা.-এর যোগ্যতা ও দক্ষতার প্রতি আস্থা রাখতেন। মুআবিয়া রা. এই আস্থার মান রেখেছিলেন। নিজের শাসনকালে তিনি বারবার রোমানদের নাকানিচুবানি খাওয়ান, এমনকি তাদের সীমান্তে অভিযান পরিচালনা করেন।[১২৮]

তাঁর যোগ্যতার স্বীকৃতি দিতে গিয়ে উমর রা. বলেছেন, 'তোমাদের মাঝে মুআবিয়া থাকতে কাইসার ও কিসরার রাজনীতি নিয়ে আলাপের কী দরকার?'[১২৯] আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলতেন, 'আমি রাজনৈতিক বিষয়ে মুআবিয়ার চেয়ে অভিজ্ঞ কাউকে পাইনি।'[১৩০]

---

১২৫. *মুসনাদে আহমাদ*, ৩০১৪; *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ৩/১২১
১২৬. *আসমাউস সাহাবাতির রুওয়াত*, ৫৫
১২৭. *মুসনাদে আহমাদ*, ১৬৯৩৩
১২৮. *উসদুল গাবাহ*, ৫/৩০১
১২৯. *তারিখুত তবারি*, ৫/৩৩০
১৩০. *প্রাগুক্ত*, ৫/৩৩৭

হজরত উসমান রা.-এর শাসনামলেও মুআবিয়া রা. শামের গভর্নর ছিলেন। বিদ্রোহীদের দমনে তিনি আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু উসমান রা.-এর নিষেধের কারণে তিনি সামরিক অভিযান চালাতে পারেননি বা সাহায্য পাঠাতে পারেননি মদিনায়। উসমান রা.-এর শাহাদাতের পর তিনি আলি রা.-এর হাতে বাইআত হতে অস্বীকৃতি জানান। এ নিয়ে আলি রা.-এর সাথে তার যুদ্ধও হয়। তবে ৪০ হিজরিতে আলি রা.-এর শাহাদাতের ৬ মাস পর হাসান রা. এক চুক্তির মাধ্যমে মুআবিয়া রা.-কে ক্ষমতা অর্পণ করেন। এরপর থেকে তিনি শরয়ি খলিফা হিসেবে দায়িত্ব পান।[১৩১]

খেলাফতের দায়িত্ব হাতে পেয়ে মুআবিয়া রা. নতুন উদ্যমে বিজয়াভিযান শুরু করেন। তাঁর সেনাপতি রশিদ ইবনু আমির জাদিদি ৪২ হিজরিতে সেনা নিয়ে ভারতবর্ষের সীমানায় প্রবেশ করেন। তিনি মাকরান হয়ে সিন্ধুর দিকে অগ্রসর হন। এ সময় তিনি যুদ্ধ করে অনেক এলাকা জয় করেন।[১৩২] ৪৪ হিজরিতে বনু উমাইয়ার বিখ্যাত সেনাপতি মুহাল্লাব ইবনু আবি সুফরা লড়াই করতে করতে লাহোরের কাছাকাছি চলে আসেন। এ সময় তিনি বিপুল গনিমতের মাল অর্জন করেন।[১৩৩]

এ সময় আবদুর রহমান ইবনে সামুরা কাবুলের দিকে অগ্রসর হন জিহাদের উদ্দেশ্যে। এই বাহিনীতে বিখ্যাত তাবিয়িদের অনেকেই ছিলেন। যেমন উমর ইবনু উবাইদুল্লাহ, আবদুল্লাহ ইবনে খাযেম, মুহাল্লাব ইবনু আবি সুফরা, আব্বাদ ইবনু হুসাইন, হিশাম ইবনু আমির, হাসান বসরি, সিলা ইবনু আশইয়াম, কাতারি ইবনু ফুজাআ প্রমুখ।[১৩৪]

মুআবিয়া রা.-এর শাসনকালে একাধারে মধ্য-এশিয়া ও আফ্রিকাতেও সামরিক অভিযান অব্যাহত থাকে। এর ফলে নতুন নতুন এলাকা মুসলমানদের হাতে আসে। বাইতুল মাল সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে গনিমতের মালে। পাশাপাশি তিনি অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলাও ফিরিয়ে আনেন। খারিজিদের শক্তহাতে দমন করেন। মুশাজারাতে সাহাবা চলাকালে জনজীবনে যে অস্থিরতা দেখা দেয় তার সময় তা স্তিমিত হয়। এটি ছিল তার বড় সাফল্য।

---

১৩১. মাওলানা আবদুশ শাকুর লখনবি লিখেছেন, 'মুআবিয়া রা. প্রথমদিকে বিদ্রোহী ছিলেন, কিন্তু হাসান রা.-এর সাথে সন্ধির ফলে তিনি নিঃসন্দেহে বৈধ খলিফায় পরিণত হন।' দেখুন, *সিরাতে খুলাফায়ে রাশিদিন*, ১১

১৩২. *তারিখু খলিফা ইবনি খইয়াত*, ২০৪; *ফুতুহুল বুলদান*, ৪১৮

১৩৩. *মুজামুল বুলদান*, ১/৫০১; *তারিখু খলিফা ইবনি খইয়াত*, ২০৬

১৩৪. *ফুতুহুল বুলদান*, ৩৮৪

হাদিস ও ফিকহের ক্ষেত্রে তার ছিল অসামান্য দক্ষতা। এমনকি আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাসের মতো সাহাবিও তার কাছ থেকে কিছু সুন্নাহ শিখেছিলেন।[১৩৫] ইবনু আব্বাস বলতেন, 'মুআবিয়া এমন কেউ নয় যে রাসুলের হাদিসের ব্যাপারে তার ওপর সন্দেহ করা যাবে।'[১৩৬]

মুআবিয়া রা. মুসলিম উম্মাহর ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করতেন। এই চিন্তা থেকেই তিনি কনস্টান্টিনোপলে অভিযান পরিচালনা করেন। এই অভিযানে তিনি নিজের সন্তান ও শীর্ষ সাহাবিদের পাঠান। বাহিনী প্রেরণের আগে তার সর্বশেষ অসিয়ত ছিল, 'রোমানদের গলা চেপে ধরো। তাদের দ্বারাই তোমরা অপর জাতিদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।'[১৩৭]

এই উক্তি থেকে বোঝা যায়, তাঁর দীর্ঘমেয়াদি সামরিক পরিকল্পনা ও দূরদর্শিতা ছিল। তাঁর শাসনামলে কেউ কেউ জাল হাদিস বর্ণনা শুরু করে। এ কথা শুনে তিনি এক খুতবায় বলেন, 'আমি শুনেছি তোমাদের কেউ কেউ এমন হাদিস শোনাচ্ছে যা নবিজি বর্ণনা করেননি। এরা মূর্খ ব্যক্তি। এদের থেকে দূরে থাকবে।'[১৩৮] জাল হাদিস রচনার এই ধারা বন্ধ করতে তিনি মূর্খ বক্তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। তিনি নিয়ম করেন সরকারি অনুমতিপত্র ছাড়া কেউ জনসাধারণের মজলিসে হাদিস বর্ণনা করতে পারবে না।[১৩৯]

প্রজাদের কল্যাণার্থে মুআবিয়া রা. অনেক সিদ্ধান্ত নেন। অনেক মন্ত্রণালয় ঢেলে সাজান। যেমন উমর রা.-এর যুগে সূচনা হওয়া পুলিশ বিভাগকে মুআবিয়া রা. নতুন করে সাজান। মুআবিয়া রা. কর্মকর্তাদের মাঝে দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলেন, এবং তাদেরকে জবাবদিহিতার মুখোমুখি করেন। এ বিষয়গুলো তার শাসনকালকে অনন্য বৈশিষ্ট্য দান করে। নিজে অসাধারণ ফিকহি যোগ্যতার অধিকারী হয়েও সব বিষয়ে মতামত বা সিদ্ধান্ত দিতেন না। যে বিষয়ে কম জানতেন, তা সরাসরি বলে দিতেন। একবার মিম্বরে খুতবা দেওয়া অবস্থাতেই তিনি কাসির ইবনু সালতকে আদেশ দেন, তিনি যেন উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রা.-এর কাছ থেকে একটি মাসআলা জেনে আসেন।[১৪০]

---

১৩৫. *মুসনাদে আহমাদ*, ১৬৮৫৮

১৩৬. *মুসনাদে আহমাদ*, ১৬৮৬৩। *আল-মুজামুল কাবির*, ১৯/৩০৯

১৩৭. *তারিখু খলিফা ইবনি খইয়াত*, ২৩০

১৩৮. *সহিহ বুখারি*, ৭১৩৯

১৩৯. *আনসাবুল আশরাফ*, ৫/৪৫

১৪০. *শারহু মাআনিল আসার*, ১৮০৫। *মুসনাদুশ শাফিয়ি*, ১/৩৬২

মুআবিয়া রা. বেশ দীর্ঘ হায়াত পেয়েছিলেন। ৮০ বছর বয়সে তিনি দামেশকে ইনতিকাল করেন। ইনতিকালের আগে এক খুতবায় তিনি বলেছিলেন, 'হে লোকেরা, আমি কর্তিত ফসলের একটি অংশমাত্র। আমি তোমাদের দায়িত্বশীল হয়েছি। আমার পরে আরও শাসক আসবেন, আমি তাদের থেকে উত্তম। আমার আগে অনেকে চলে গেছেন, তারা আমার থেকে উত্তম। নবিজি বলেছেন, যে আল্লাহর সাথে মিলিত হতে ভালোবাসে, আল্লাহও তার সাথে মিলিত হতে ভালোবাসেন। হে আল্লাহ, আমি আপনার সাক্ষাতকে ভালোবাসি, আপনিও আমার সাক্ষাতকে ভালোবাসুন'।[১৪১]

মুআবিয়া রা.-এর মর্যাদা

সিফফিনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সবচেয়ে বেশি আঘাত করা হয় মুআবিয়া রা.-কে। তার নামে ছড়ানো হয় একের পর এক বানোয়াট বর্ণনা। তাকে দেখানো হয় ক্ষমতালোভী, নিষ্ঠুর, রক্তলোলুপ এক শাসক হিসেবে, যিনি নিজের ক্ষমতা নিশ্চিত করতে যেকোনো কাজ করতে প্রস্তুত। এবার দেখা যাক মুআবিয়া রা. সম্পর্কে নবিজি কী বলেছেন—

১। নবিজি বলেন, 'হে আল্লাহ, মুআবিয়াকে তুমি হিদায়াতের রাহবার বানাও, পথ প্রদর্শন করো, মানুষকে তার মাধ্যমে হিদায়াত দাও।'[১৪২]

২। ইরবায ইবনু সারিয়্যা বলেন, 'আমি শুনেছি নবিজি বলেছেন, হে আল্লাহ, আপনি মুআবিয়াকে কিতাব ও হিসাবের জ্ঞান দান করুন। তাকে জাহান্নামের আজাব থেকে হিফাজত করুন।'[১৪৩]

৩। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন, 'একদিন জিবরাইল আ. নবিজির কাছে এসে বললেন, হে নবি, আপনি মুআবিয়াকে সদুপদেশ দিন, কারণ সে আল্লাহর কিতাবের আমানতদার ও উত্তম আমানতদার।'[১৪৪]

৪। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'এ দীনের নবুয়তের যুগটি হবে রহমত। এরপর খেলাফত আসবে, সেটিও রহমত। এরপর রাজত্বের যুগ (মুআবিয়ার শাসন) আসবে, সেটিও রহমতের যুগ।'[১৪৫]

---

১৪১. *তারিখুল ইসলাম*, ৪/৩১৬। *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, ২৫/৭৯

১৪২. *সুনানুত তিরমিজি*, ৩৮৪২। *জাওয়ামিউস সহিহ*, ২/২৪৭। *মুসনাদুশ শামিয়িন*, ১৭৮৯৫। হাদিসের মান সহিহ।

১৪৩. *মুসনাদে আহমাদ*, ১৭২০২। *উসদুল গাবাহ*, ৪/৩৮৬। এই হাদিসের অনেক শাওয়াহেদ আছে, তাই হাদিসটির সনদ সহিহের পর্যায়ে চলে গেছে।

১৪৪. *আল-মুজামুল আওসাত*, ৩৯০২

৫। নবিজি বলেছেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে যে বাহিনী প্রথম সামুদ্রিক অভিযানে অংশ নেবে তারা নিজেদের জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে নেবে।'[১৪৬]

ইবনু হাজার আসকালানি এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, 'এই হাদিসের ফজিলত হজরত মুআবিয়ার প্রাপ্য। কারণ তিনিই প্রথম সামুদ্রিক অভিযান পরিচালনা করেন।'[১৪৭] প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ইবনে খালদুন বলেন, 'হজরত মুআবিয়াই প্রথম খলিফা, যিনি ইসলামি বাহিনীর জন্য জাহাজ তৈরি করে মুসলমানদের জন্য নৌযুদ্ধের গোড়াপত্তন করেন।'[১৪৮] হজরত মুআবিয়া এই অভিযান পরিচালনা করেন ২৭ হিজরিতে।[১৪৯]

৬। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস একবার হজরত মুআবিয়া সম্পর্কে বলেছিলেন, 'তিনি একজন ফকিহ।'[১৫০]

৭। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলেন, 'মুআবিয়া আমাদের কাছে পরীক্ষার উপাদান। যে তাঁর সমালোচনা করবে এবং অপবাদ দেবে তাঁকে আমরা সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে কুধারণার অভিযোগে অভিযুক্ত করব।'[১৫১]

৮। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলকে হজরত মুআবিয়া রা.-এর সমালোচনাকারীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'এমন লোকদের থেকে দূরে থাকবে। নিজেদের মজলিসে তাদের বসাবে না। আমরা মানুষের সামনে তাদের মুখোশ উন্মোচন করে দেবো।'[১৫২]

৯। ইবনে কাসির বলেন, 'তিনি ছিলেন নেতৃত্ব, বদান্যতা, বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতায় অতুলনীয়।'[১৫৩]

---

১৪৫. *আল-মুসতাদরাক আলাস সহিহাইন*, ৪/৫২০। *কিতাবুল ফিতান লি নুআইম ইবনে হাম্মাদ*, ২৩৬ জামিউল মাসায়িল, ৫/১৫৪। হাদিসটির সনদ সহিহ। ইমাম হাইসামি বলেন, 'এর সকল রাবি সিকাহ।'

১৪৬. *সহিহ বুখারি*, ২৯২৪

১৪৭. *ফাতহুল বারি*, ৬/১২৭

১৪৮. *তারিখে ইবনে খালদুন*, ৪/৪১০

১৪৯. *আন-নুজুমুয যাহিরা*, ১/৮৫

১৫০. *ফাতহুল বারি*, ৬/১৩০

১৫১. *মারবিয়্যাতু খিলাফাতি মুআবিয়া ফি তারিখিত তবারি*, ২৯

১৫২. *আস-সুন্নাহ লি-আতিয়া আয-যাহরানি*, ২/৪৩৪

১৫৩. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৮/১১৮

❑ যুবাইর ইবনুল আওওয়াম রা.

নবিজির ফুফাতো ভাই যুবাইর ইবনুল আওওয়াম ছিলেন সৌভাগ্যবান ১০ সাহাবির একজন, যাদেরকে নবিজি এক মজলিসেই জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। তার মা সাফিয়্যা ছিলেন নবিজির ফুফু। যুবাইর রা. ১৬ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের অপরাধে তার চাচা তাকে অনেক শাস্তি দিত। অনেক সময় চাটাইয়ে মুড়ে তার নাকে-মুখে ধোঁয়া দিত। কাশতে কাশতে তার দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হতো, তবু তিনি ইসলাম ত্যাগ করেননি।[১৫৪]

ইসলামগ্রহণের পর থেকে নবিজির ইনতিকাল পর্যন্ত পুরো সময় তিনি অতিবাহিত করেছেন নবিজির সান্নিধ্যে। এ সময় তিনি ইলমে বিপুলভাবে সমৃদ্ধ হন। নবিজিকে তিনি অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তার কৈশোরকালের একটি ঘটনা থেকে এই ভালোবাসার নমুনা দেখা যায়। একবার মক্কায় গুজব ছড়িয়ে পড়ে কুরাইশরা নবিজিকে বন্দি করেছে। এ সংবাদ কানে পড়তেই তিনি নাঙ্গা তরবারি হাতে বের হয়ে পড়েন। তাকে দেখে সবাই অবাক হয়, সবাই ভাবছিল এই কিশোর খাপখোলা তরবারি হাতে কোথায় যাচ্ছে? অবশেষে তিনি নবিজির কাছে পৌঁছে দেখেন নবিজি নিরাপদেই আছেন। নবিজি তাকে তরবারি হাতে আসার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি সংবাদ পেয়েছি তারা আপনাকে আটক করেছে। নবিজি তার এই নিখাদ ভালোবাসা দেখে মুগ্ধ হন। তখনই তিনি হাত তুলে তাঁর জন্য দুআ করেন।'[১৫৫] সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব বলেন, 'আমার বিশ্বাস তার জন্য নবিজির এই দুআ বিফলে যাবে না।'[১৫৬]

মক্কায় কাফেরদের অত্যাচার বেড়ে গেলে নবিজির অনুমতিক্রমে যুবাইর রা. হাবশায় হিজরত করেন। হিজরতের পর মদিনায় এসে যুবাইর ইবনুল আওওয়াম আর্থিক কষ্টের মুখোমুখি হন। নবিজি তাকে একটি বাগান দান করেন, এর ফলে তার আর্থিক সংকট কেটে যায়।[১৫৭]

যুবাইর রা. ছিলেন সুঠামদেহী ও দীর্ঘকায়। তিনি ঘোড়ার পিঠে বসলেও তার পা মাটিতে লেগে যেত।[১৫৮] তার বাহুতে ছিল প্রচণ্ড শক্তি। খন্দকের যুদ্ধে তিনি এক

---

১৫৪. *আল-ইসাবা*, ৬/৪৫৯

১৫৫. *মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা*, ১৯৫২০

১৫৬. *ফাজায়িলুস সাহাবা*, ১/৫৪৩

১৫৭. *সহিহ বুখারি*, ৩১৫১

১৫৮. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১/৪১

ব্যক্তিকে আঘাত করলে লোকটির শিরস্ত্রাণ, লৌহবর্ম ও শরীরের হাড়গোড় দুটুকরো হয়ে ঘোড়ার জিন পর্যন্ত কেটে যায়।[১৫৯]

যুবাইর রা. ছিলেন অত্যন্ত সাহসী যোদ্ধা। জীবন কাটিয়েছিলেন একজন মুজাহিদের মতো। তার সারা শরীরে অনেকগুলো ক্ষত ছিল, যা বিভিন্ন জিহাদে আঘাতের চিহ্ন। তিনি এই ক্ষত সারাজীবন বয়ে বেড়ান। নবিজি কখনো তাকে সেনাদলের আমির বানাতেন, কখনো বড় পদ দিতেন। প্রথম তিন খলিফার যুগেও তিনি প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। তবে বড় পদে আসীন হয়েও তিনি একজন সাধারণ সেনার মতোই জিহাদে অংশ নিতেন যা তার ইখলাসের পরিচয়।[১৬০] উমর রা.-এর সময়কালে তিনি মিশরের অভিযানে অংশ নেন। এ সময় একজন সাধারণ যোদ্ধার মতোই তিনি জিহাদ করেন এবং ফুসতাত ও আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।[১৬১]

ইয়ারমুকের যুদ্ধে তিনি অসামান্য সাহসিকতা দেখান। এ দিন তিনি আড়াই লক্ষ সেনার একদিক দিয়ে প্রবেশ করে যুদ্ধ করতে করতে অন্যদিক দিয়ে বের হয়ে যান। পুনরায় আবার তাদের সারি তছনছ করে অন্যদিক থেকে ফিরে আসেন। রোমান সেনারা কয়েকবার তাকে ঘিরে ফেলে, কিন্তু তিনি তাদের সবাইকে হত্যা করে নিজে নিরাপদ থাকেন। তবে কাঁধে তিনি বড় আঘাতপ্রাপ্ত হন। তার কাঁধে এত বড় গর্ত হয়ে যায় যে, শিশুরা সেখানে আঙুল ঢুকিয়ে খেলা করত।[১৬২]

মুসলমানদের বিজয়াভিযানের যুগে যুবাইর রা. আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠেন। আল্লাহ তাকে অঢেল সম্পদের মালিক বানান। তার ১ হাজার গোলাম ছিল, যারা অর্থ উপার্জন করে তাকে দিত। যুবাইর রা. এই অর্থের পুরোটাই দান করে দিতেন।[১৬৩]

যুবাইর রা. বিয়ে করেছিলেন আয়েশা রা.-এর বোন আসমা রা.-কে। বিয়ের সময় তাদের তেমন ধনসম্পদ ছিল না। শুধু একটা ঘোড়া ছিল। আসমা রা. এটি দেখাশোনা করতেন, খাবারের ব্যবস্থা করতেন। পরে নবিজি যুবাইর রা.-কে বাগান দান করলে তাদের সম্পদ বাড়ে। একদিন আসমা রা. তাদের সেই বাগান থেকে খেজুরের বিচি কুড়িয়ে ফিরছিলেন। পথে নবিজির সাথে দেখা। তিনি তখন সাহাবিদের নিয়ে কোথাও থেকে ফিরছিলেন। নবিজি তাকে উটে বসতে বললেন।

---

১৫৯. প্রাগুক্ত, ১/৫১
১৬০. *সহিহ বুখারি*, ৩১২৯
১৬১. *ফুতুহুল বুলদান*, ২১০
১৬২. *সহিহ বুখারি*, ৩৯৭৫
১৬৩. *আল-ইসাবা*, ২/৪৬০

কিন্তু আসমা রা. দ্বিধা করলে নবিজি চলে গেলেন। আসমা রা. ঘরে ফিরে বললেন, 'রাস্তায় নবিজির সাথে দেখা হয়েছিল। আমার মাথায় বোঝা ছিল, নবিজি আমাকে নেওয়ার জন্য বাহন থামিয়েছিলেন। কিন্তু আপনার আত্মসম্মানবোধের কথা ভেবে আমি উঠিনি।' যুবাইর রা. বললেন, 'আল্লাহর কসম, মাথায় করে বোঝা নিয়ে আসার এই দৃশ্য আমার কাছে নবিজির উটে চড়ে আসার চেয়ে বেশি পীড়াদায়ক।' পরে আবু বকর রা. ঘরের কাজ সামলানোর জন্য একজন দাস পাঠিয়ে দেন।[১৬৪]

যুবাইর ইবনুল আওওয়াম সারাজীবন মনে পুষতেন শাহাদাতের তামান্না। তিনি নিজেই বলেছেন, 'আমি আমার সন্তানদের নাম রেখেছি শহিদদের নামে। আবদুল্লাহর নাম রেখেছি আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশের নামে, মুনযিরের নাম রেখেছি মুনযির ইবনু উমরের নামে, উরওয়ার নাম রেখেছি উরওয়া ইবনু মাসউদের নামে, হামযার নাম রেখেছি হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিবের নামে, জাফরের নাম রেখেছি জাফর ইবনু আবি তালিবের নামে, মুসআবের নাম রেখেছি মুসআব ইবনু উমাইরের নামে, উবাইদার নাম রেখেছি উবাইদা ইবনু হারিসের নামে, খালেদের নাম রেখেছি খালেদ ইবনু সাইদের নামে, আমরের নাম রেখেছি আমর ইবনু সাইদ ইবনু আসের নামে।'[১৬৫]

যুবাইর রা. শহিদ হন ৩৬ হিজরির জুমাদাল উখরায়। মৃত্যুর সময় তিনি কপর্দকশূন্য ছিলেন। এ সময় তিনি ঋণগ্রস্তও ছিলেন। মৃত্যুর আগে ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরকে তিনি অসিয়ত করেন, 'আমার স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে ঋণ পরিশোধ করবে।' আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর রা. সেই ঋণ শোধ করে দেন।

যুবাইর রা.-এর মর্যাদা

জংগে জামালের যুদ্ধে যুবাইর রা. প্রথমদিকে ছিলেন আলি রা.-এর বিপক্ষশিবিরে। কিন্তু পরে তিনি যুদ্ধের ময়দান ত্যাগ করেন এবং সাবায়িদের হাতে নিহত হন। তাকে নিয়েও রয়েছে অনেক অপপ্রচার। ক্ষমতার লোভে তিনি আলি রা.-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছেন এমন কথা বেশ প্রচলিত, অথচ এর কোনো সত্যতা নেই। যুবাইর রা.-এর ফজিলত সম্পর্কেও একাধিক হাদিস বিদ্যমান।

১। বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে মাত্র দুটি ঘোড়া ছিল। একটিতে চড়েছিলেন মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ, অন্যটিতে চড়েছিলেন যুবাইর ইবনুল আওওয়াম। তিনি এ দিন জর্দা রঙের একটি পাগড়ি পরিধান করেছিলেন। নবিজি তাকে

---

১৬৪. *আসহাবুর রাসুল*, ১/২৮১

১৬৫. *আত-তবাকাতুল কুবরা*, ৩/১০১। যুবাইর রা. তাঁর সন্তানদের নাম রেখেছিলেন যাদের নামে, তারা সবাই শহিদ ছিলেন

দেখে তখন বলেছিলেন, 'ফিরিশতারাও আজ যুবাইরের পোশাকে অবতরণ করেছে।'[১৬৬]

২। খন্দকের যুদ্ধের সময় নবিজি বলেন, 'বনু কুরাইজার সংবাদ কে নিয়ে আসবে?' যুবাইর রা. বলেন, 'আমি আনব।' তখন নবিজি বলেছিলেন, 'প্রত্যেক নবির একজন সহচর থাকেন, আমার সহচর হলো যুবাইর।'[১৬৭]

৩। খন্দকের যুদ্ধে যুবাইর রা.-এর বীরত্ব দেখে নবিজি বলে ওঠেন, 'আমার মা-বাবা তোমার জন্য কুরবান।'[১৬৮]

৪। মক্কা বিজয়ের দিন নবিজির বিশেষ পতাকা ছিল যুবাইর ইবনুল আওওয়ামের হাতে।[১৬৯]

৫। উসমান রা. যুবাইর রা. সম্পর্কে বলেছিলেন, 'তিনি মানুষের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি নবিজির সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন।'[১৭০]

❑ তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ রা.

এক বৈঠকে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ১০ সাহাবির একজন তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ। তিনি ছিলেন কুরাইশের বনু তামিম শাখার সদস্য। তিনি ইসলামগ্রহণকারী প্রথম আটজনের একজন। আবু বকর রা.-এর দাওয়াতে প্রথম যে পাঁচজন ঈমান এনেছিল তিনি ছিলেন তাদের একজন।[১৭১] ইসলাম গ্রহণের কারণে নওফেল ইবনে খুয়াইলিদ তাকে প্রচণ্ড নির্যাতন করেন।[১৭২]

তালহা রা. ছিলেন যুবাইর রা.-এর ঘনিষ্ঠজন। আত্মার আত্মীয়। সম্পর্কের দিক থেকে দুজনে ছিলেন ভায়রা। অর্থাৎ দুজনেই ছিলেন আবু বকর রা.-এর জামাতা। দুজনের পেশাই ছিল ব্যবসা। আজীবন তারা একসাথে ওঠাবসা, চলাফেরা করতেন। দুজনেই ইনতিকাল করেছিলেন কাছাকাছি সময়ে, জংগে জামালে। তাদের সম্পর্কের দিকে লক্ষ করেই হাদিস, সিরাত ও ইতিহাসের গ্রন্থে সবসময় তাদের দুজনের নাম একসাথে উচ্চারিত হয়।

---

১৬৬. *মুসনাদে বাযযার*, ২৩৩৮। *আল-মুজামুল কাবির*, ১/১২০
১৬৭. *উসদুল গাবাহ*, ২/৩০৭
১৬৮. *মুসনাদে আহমাদ*, ১৪০৯। *সুনানু ইবনি মাজাহ*, ১২৩
১৬৯. *সহিহ বুখারি*, ৪৩৮০
১৭০. *সুনানুত তিরমিযি*, ৩৭৪১
১৭১. *আল-মুসতাদরাক আলাস সহিহাইন*, ৪৩২
১৭২. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৭/২৬৮

বদরের যুদ্ধে তিনি অংশ নিতে পারেননি, তবে নবিজি তাকে বদরি সেনার মধ্যে গণ্য করে গনিমতের মাল বণ্টন করে দেন। উহুদের যুদ্ধে তালহা রা. বীরত্বের সাথে লড়াই করে নবিজির নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। কাফেরদের আক্রমণে নবিজি যখন আহত হন তখন তালহা রা. নবিজিকে কোমরে বহন করে নিরাপদ জায়গার দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন। মুশরিকরা তার কাছে চলে এলে তিনি লড়াই করে তাদের তাড়িয়ে দিতেন। কুরাইশদের বেশ কিছু তির তিনি হাত দিয়ে ফিরিয়ে দেন, যার ফলে সারাজীবনের জন্য তার একটি হাত নষ্ট হয়ে যায়। মাথার বেশ কিছু অংশও আঘাতপ্রাপ্ত হয়। এ দিন তার শরীরে মোট ২৪টি বড় বড় ক্ষত দেখা দেয়। বলতে গেলে সেদিন তিনি মানবপ্রাচীর হয়ে নবিজিকে রক্ষা করেছিলেন।[১৭৩] তার এই কুরবানির কারণে নবিজি বলেছিলেন, 'তালহা নিজের জন্য জান্নাত অবধারিত করে নিয়েছে।'[১৭৪]

সেদিনের যুদ্ধে আহত অবস্থায় তালহা রা. বারবার 'উফ' 'উফ' বলছিলেন। তখন নবিজি বলেন, 'তুমি যদি আজ 'উফে'র বদলে 'বিসমিল্লাহ' বলতে তাহলে দুনিয়া থেকেই তোমার জন্য জান্নাতে নির্মিত ঘর দেখে ফেলতে।'[১৭৫]

তালহা রা. ছিলেন এক বিরল সৌভাগ্যের অধিকারী। তিনি চার বিবাহ করেছিলেন, তার প্রত্যেক স্ত্রীই ছিলেন নবিজির কোনো না কোনো স্ত্রীর বোন। তার এক স্ত্রী ছিলেন আবু বকর রা.-এর কন্যা উম্মে কুলসুম, যিনি আয়েশা রা.-এর বোন। তার আরেক স্ত্রী ছিলেন হামনা বিনতু জাহাশ, যিনি উম্মুল মুমিনিন যায়নব বিনতু জাহাশের বোন। তার তৃতীয় স্ত্রী ফারিআহ বিনতু আবি সুফিয়ান ছিলেন উম্মুল মুমিনিন উম্মে হাবিবা রা.-এর বোন। তালহা রা.-এর চতুর্থ স্ত্রী ছিলেন রুকাইয়া রা., যিনি উম্মুল মুমিনিন উম্মে সালামা রা.-এর বোন।[১৭৬]

তালহা রা. সম্পদশালী ছিলেন, তবে এই সম্পদের পুরোটাই তিনি দান করতেন দীনের কাজে। কাবিসা ইবনু জাবির বলেন, 'আমি তালহা রা.-এর সান্নিধ্যে ছিলাম। এত বেশি দানকারী আর কাউকে আমি দেখিনি।'[১৭৭] একবার হাদারামাউত এলাকা থেকে ৭ লাখ দিরহাম আসে তালহা রা.-এর হাতে। তিনি সারারাত এপাশ-ওপাশ করে কাটান, তার চোখে ঘুম আসেনি। তার স্ত্রী জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি এমন করছেন কেন?' তিনি বলেন, 'সন্ধ্যা থেকেই আমি পেরেশানিতে

---

১৭৩. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১/৩২

১৭৪. *সুনানুত তিরমিযি*, ৩৭৩৯

১৭৫. *আল-ইসাবা*, ৩/৪৩১

১৭৬. *আল-ইসাবা*, ৩/৪৩২

১৭৭. *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ১/৮৮

আছি। এত সম্পদ রেখে ঘুমালে একজন মানুষ তার রবের ব্যাপারে কী ধারণা পোষণ করে।' স্ত্রী সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, 'এত রাতে আপনি কাকে দেবেন? সবাই তো ঘুমিয়ে গেছে।' স্ত্রীর কথায় তিনি শান্ত হন, তবে ভোর হতেই লোক ডেকে সব দান করে দেন।[১৭৮]

তালহা রা. বলতেন, 'অনর্থক কাজে ঘরের বাইরে থাকার চেয়ে একজন পুরুষের জন্য ঘরে থাকাই শ্রেয়।'[১৭৯] তিনি পোশাককে গণ্য করতেন আল্লাহর নিয়ামতের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে।[১৮০] নিজে দানশীল ছিলেন, এজন্য তিনি কৃপণদের পছন্দ করতেন না, এমনকি তাদের সাথে মেলামেশাও করতেন না।[১৮১]

জংগে জামালের যুদ্ধে তিনি মারওয়ান ইবনুল হাকামের হাতে নিহত হন।[১৮২]

তালহা রা.-এর মর্যাদা

১। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'তালহা তাদের একজন যারা আত্মত্যাগের হক আদায় করেছেন।'[১৮৩]

২। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, 'যে ব্যক্তি মাটির ওপর চলমান শহিদের প্রতিচ্ছবি দেখতে ইচ্ছুক, সে যেন উবাইদুল্লাহর ছেলে তালহাকে দেখে।'[১৮৪]

৩। প্রতিটি যুদ্ধে তালহা রা. অকাতরে দান করতেন। এজন্য নবিজি তাকে উহুদের যুদ্ধে 'তালহাতুল খাইর', যিল উশাইরার যুদ্ধে 'তালহাতুল ফাইয়াজ' ও খাইবার যুদ্ধে 'তালহাতুল জুদ' উপাধিতে ভূষিত করেন।[১৮৫]

৪। তালহা রা.-এর দানশীলতার স্বীকৃতি দিয়ে নবিজি বলেন, 'হে তালহা, নিঃসন্দেহে তুমি দানবীর।'[১৮৬]

---

১৭৮. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১/৩১

১৭৯. *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, ১১/২০৩

১৮০. *ফুরসানুম মিন আসরিন নবুওয়াহ*, ২৩৭

১৮১. প্রাগুক্ত।

১৮২. অনেকে মারওয়ান কর্তৃক তালহা রা.-কে হত্যার বিষয়টি অস্বীকার করতে চান। অথচ এর পক্ষে সহিহ বর্ণনা আছে। যেমন *মাজমাউয যাওয়ায়েদ*, ১৪৮২২। আল্লামা হাইসামি এই বর্ণনার সনদ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'বর্ণনাকারী সকলেই সহিহ হাদিসের বর্ণনাকারী।' হাফেজ ইবনু হাজার আসকালানিও এই বর্ণনা উল্লেখ করে একে বিশুদ্ধ বলেছেন। দেখুন, *আল-ইসাবা*, ৩/৪৩২

১৮৩. *সুনানুত তিরমিযি*, ৩৭৪২

১৮৪. অন্য হাদিসে নবিজি বলেন, 'যে ব্যক্তি দুনিয়ার বুকে চলমান কোনো জান্নাতি ব্যক্তিকে দেখতে চায়, সে যেন তালহাকে দেখে।' *মাজমাউয যাওয়ায়েদ*, ১৪৮১২

১৮৫. *আল-মুজামুল কাবির*, ১/১১২

১৮৬. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১/৩১

৫। আবু বকর রা. যখনই ওহুদের যুদ্ধের কথা মনে করতেন, তিনি বলতেন, 'সে দিনটি তো ছিল তালহার।'[১৮৭]

❑ আমর ইবনুল আস রা.

মুশাজারাতে সাহাবার ঘটনাপ্রবাহে আমর ইবনুল আস রা. ছিলেন মুআবিয়া রা.-এর শিবিরে। সিফফিনের যুদ্ধে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এমনকি যুদ্ধের পর যে সালিশ অনুষ্ঠিত হয় সেখানে তিনি ছিলেন মুআবিয়া রা.-এর প্রতিনিধি। এই বিষয়টি নিয়ে রাফিজিরা মিথ্যা ছড়ায়। তার চরিত্রে নানা কলঙ্ক ছড়ায়। অথচ তিনি ছিলেন একজন সম্মানিত সাহাবি।

আমর ইবনুল আস ইসলাম গ্রহণ করেন অষ্টম হিজরিতে।[১৮৮] তিনি নবিজির দরবারে উপস্থিত হলে নবিজি বলেন, 'আমর বাইআত গ্রহণ করো। ইসলাম পূর্বের সকল পাপ মুছে ফেলে। হিজরতও পূর্বের সকল অপরাধ মুছে দেয়।'[১৮৯] ইসলাম গ্রহণের পর থেকেই আমর ইবনুল আস হয়ে ওঠেন নবিজির একান্ত আস্থাভাজন। মুতার যুদ্ধের কিছুদিন পর যাতুস সালাসিলের অভিযানে তাকে সেনাপতি হিসেবে প্রেরণ করেন নবিজি। আমর ইবনুল আসের সাহসিকতায় এই যুদ্ধে জয়লাভ করে মুসলমান বাহিনী। এরপর থেকে নবিজির আরও নৈকট্যলাভ করেন আমর ইবনুল আস। এমনকি তিনি নিজেই বলেছেন, 'আমি ইসলাম গ্রহণের পর থেকে নবিজি যুদ্ধের ময়দানে আর কাউকেই আমি ও খালেদ ইবনুল ওয়ালিদের সমকক্ষ মনে করেননি।'[১৯০]

আবু বকর রা.-এর শাসনকালে আমর ইবনুল আসকে এক অভিযানে ফিলিস্তিনে পাঠানো হয়। তবে প্রেরণের আগে আবু বকর রা. বলেছিলেন, 'তিনি চাইলে রাসুলের অর্পিত দায়িত্বেই থাকতে পারেন, অথবা দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য যা কল্যাণকর মনে করেন তা গ্রহণ করতে পারেন।' জবাবে আমর ইবনুল আস বলেন, আমি হলাম ইসলামের তিরসমূহের একটি তির আর আপনি হলেন দক্ষ তিরন্দাজ। সুতরাং যে তিরকে আপনি শক্তিশালী মনে করেন, তাকে যেদিকে ইচ্ছা নিক্ষেপ করুন (অর্থাৎ আপনার যেকোনো আদেশ মেনে নিতে আমি রাজি)।'[১৯১]

---

১৮৭. *ফাতহুল বারি*, ৭/৩৬১

১৮৮. তিনি কোথায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তা নিয়ে রয়েছে একাধিক মত। ইবনে ইসহাক ও যুবাইর ইবনু বাক্কারের মতে তিনি হাবশায় নাজাশির দরবারে ইসলাম গ্রহণ করেন। *আল-ইসাবা*, ২/৩। ইবনু হাজার আসকালানির মতে তিনি হুদাইবিয়া ও খাইবারের যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। *তাহযিবুত তাহযিব*, ৮/৫৬

১৮৯. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ৩/৬০

১৯০. *আস-সুনানুল কুবরা*, ৪/৪৩

১৯১. *ইতমামুল ওয়াফা বি-সিরাতিল খুলাফা*, ৫৫

উমর রা.-এর যুগে সংঘটিত ইয়ারমুকের যুদ্ধেও তিনি রেখেছিলেন অসামান্য ভূমিকা। এ যুদ্ধে তিনি ছিলেন মুসলমানদের ডান বাহুর নেতৃত্বে। সিরিয়ার রণাঙ্গনে তিনি লড়াই করেন দীর্ঘদিন। একের পর এক অভিযানে ছিনিয়ে আনেন বিজয়। সিরিয়ার পর তিনি ছুটে যান মিশর অভিমুখে। জয় করেন মিশর। লড়াইয়ের ময়দানে তার যোগ্যতা ও দক্ষতা দেখে উমর রা. বলেছিলেন, 'আবু আবদুল্লাহর জন্য এই পৃথিবীতে আমির না হয়ে হাঁটা উচিত নয়।'[১৯২]

আমর ইবনুল আসের মর্যাদা

অপপ্রচারকারীদের কলমে মাজলুম আরেক সাহাবি হলেন মিশরবিজেতা আমর ইবনুল আস, অথচ তার সম্পর্কেও একাধিক ফজিলতের হাদিস বিদ্যমান।

১। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'আমর ইবনুল আসের মাঝে অনেক কল্যাণ আছে।'[১৯৩]

২। নবিজি বলেন, 'মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে আর আমর ইবনুল আস ঈমান এনেছে।'[১৯৪]

৩। তালহা বিন উবাইদুল্লাহ বলেন, 'আমি নবিজিকে বলতে শুনেছি, আমর ইবনুল আস কুরাইশের নেককার মানুষদের একজন।'[১৯৫]

৪। কাবিসা বিন জাবির বলেন, 'আমি আমর ইবনুল আসের সান্নিধ্যে দীর্ঘ সময় ছিলাম। এ সময় আমি তার মতো উত্তম চরিত্রের আর কাউকে দেখিনি। তার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থা ছিল একই রকম।'[১৯৬]

❑ আবু মুসা আশআরি রা.

আবু মুসা আশআরি রা.-এর মূল নাম আবদুল্লাহ ইবনু কাইস ইবনু হাযযার ইবনু হারব আল-আশআরি আত-তামিমি।[১৯৭] তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট ফকিহ সাহাবি। ইসলামের সূচনাকালে যারা মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, আবু মুসা আশআরি ছিলেন তাদের অন্যতম। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ইবনু সাদ লিখেছেন,

---

১৯২. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ৩/৭০
১৯৩. *আল-মুসতাদরাক আলাস সহিহাইন*, ৫৯১৬। *আল-মুজামুল কাবির*, ৫/১৮। *মুসনাদে আহমাদ*, ৮৭৬৩
১৯৪. *তিরমিযি*, ৩৮৪৪। *মুসনাদে আহমাদ*, ১৭৪১২। *আল-মুজামুল কাবির*, ৮৪৫
১৯৫. *মুসনাদে আবু ইয়ালা*, ৬৪৫। *মুসনাদে বাযযার*, ৯৬১
১৯৬. *আল-ইসাবা*, ৪/৫৩৯
১৯৭. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ২/৩৮১

'তিনি মক্কায় এসে সাইদ ইবনুল আসের সাথে সখ্য গড়ে তোলেন। তিনি প্রাথমিক সময়ে ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন, তিনি হাবশায়ও হিজরত করেছেন।'[১৯৮]

হাবশা থেকে আবু মুসা আশআরি যখন ফিরে আসেন, তখন নবিজি সাহাবিদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন, 'কাল তোমাদের মাঝে এমন এক দলের আগমন হবে যাদের হৃদয় ইসলামের প্রতি তোমাদের চেয়ে বেশি নিবেদিত।' পরদিন দেখা গেল, আবু মুসা আশআরির কাফেলা এসেছে।[১৯৯] আবু মুসা আশআরি যখন নবিজির সাথে দেখা করেন, তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'তোমরা দুবার হিজরত করার সৌভাগ্য অর্জন করেছ। একবার হাবশায় গিয়ে, আরেকবার হাবশা থেকে ফিরে।'[২০০]

উমর রা.-এর শাসনামলে আবু মুসা আশআরি ইসলামি খেলাফতের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন। তাশতার, কুম ও কাসান শহরে যে অভিযান চালানো হয়েছিল, তিনি ছিলেন তার সেনাপতি।[২০১] উমর রা.-এর শাসনামলে তিনি বসরা চলে যান। সেখানে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে লোকজনকে ইলম শেখাতে থাকেন।[২০২] উমর রা. তাকে বসরার আমির নিযুক্ত করেন। দেখা যেত, একদিকে তিনি মকতবে পড়াচ্ছেন, অন্যদিকে বিভিন্ন অভিযানে সেনাদের নেতৃত্বও দিচ্ছেন। ইলম শেখা-শেখানোর ব্যাপারে তিনি কোনো কার্পণ্য করতেন না। একবার তিনি বলেন, 'আল্লাহ যাকে ইলম শিখিয়েছেন, সে যেন অন্যকে শেখায়। যে বিষয়ে ইলম নেই, সে বিষয়ে যেন সে চুপ থাকে। অন্যথায় সে সীমালঙ্ঘন করবে এবং দীন থেকে বের হয়ে যাবে।'[২০৩]

তিনি যখন বসরায় ছিলেন, প্রায় সময় নামাজের সালাম ফিরিয়েই মুসল্লিদের দিকে ঘুরে বসতেন এবং তাদের কুরআন পড়ার পদ্ধতি শিখিয়ে দিতেন। একে একে সবার পড়া শুনতেন। কারও পড়ায় ভুল পেলে তা সংশোধন করে দিতেন।[২০৪] তিনি যখন জিহাদে বের হতেন, তখনও থেমে যেত না তার এই দরস। হাত্তাব ইবনু আবদুল্লাহ আর-রুকাশি বলেন, একবার আমরা এক জিহাদে গেলাম আবু মুসা আশআরির সাথে। আমাদের বাহিনী অবস্থান করছিল দজলা নদীর তীরে।

---

১৯৮. *আত-তবাকাতুল কুবরা*, ৪/১০৭
১৯৯. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ২/৩৮৪
২০০. *সহিহ মুসলিম*, ২৫০২
২০১. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৭/৮৮
২০২. *তাফসিরুত তাবিয়িন*, ১/৪৩৩
২০৩. *আত-তবাকাতুল কুবরা*, ৪/১০৭
২০৪. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ২/২৯৮

জোহরের সময় হলে আমরা নামাজ আদায় করি। নামাজের পর সবাই গোল হয়ে বসে যান।

উমর রা. নিয়ম করেছিলেন, কোনো গভর্নর কোনো শহরে এক বছরের বেশি অবস্থান করতে পারবে না। কিন্তু কুফার লোকদের অনুরোধের কারণে আবু মুসা আশআরিকে চার বছর কুফার দায়িত্বে রাখা হয়।

তিনি দিনের বেশিরভাগ সময় কুরআন তিলাওয়াতে মগ্ন থাকতেন। উমর রা.-কে খুব ভালোবাসতেন। যখনই মদিনায় আসতেন, দ্রুত ছুটে আসতেন আমিরুল মুমিনিনের সান্নিধ্য নিতে। একবার তিনি ইশার নামাজের পর উমর রা.-এর কাছে এলেন। উমর রা. জিজ্ঞেস করলেন, 'কোনো কাজ আছে?' তিনি বললেন, 'আপনার সাথে কথা বলতে এসেছি। এরপর তিনি দীর্ঘ সময় ধরে উমর রা.-এর সাথে ফিকহ নিয়ে কথা বলতে থাকেন।'[২০৫]

একবার উমর রা. আনাস ইবনু মালিক রা.-কে পাঠালেন আবু মুসা আশআরির কাছে। তিনি ফিরে এলে উমর রা. জিজ্ঞেস করলেন, 'তাকে কী অবস্থায় পেয়েছ?' আনাস ইবনু মালিক বললেন, 'তিনি লোকজনকে কুরআন পড়াচ্ছিলেন।' উমর রা. বললেন, 'সে খুবই বুদ্ধিমান।'[২০৬]

আবু মুসা আশআরি বেশ দীর্ঘ হায়াত পেয়েছিলেন। তিনি ৫২ হিজরিতে ইনতিকাল করেন। মুসলিমবিশ্ব তখন শাসন করছিলেন হজরত মুআবিয়া রা.। আবু মুসা আশআরির সার্বিক জীবন সামনে রাখলে স্পষ্ট হয়, তিনি ছিলেন একজন নেককার, ন্যায়নিষ্ঠ, ফকিহ ও বিচক্ষণ সাহাবি।

আবু মুসা আশআরির মর্যাদা

প্রচলিত ইতিহাসে তাকে দেখানো হয় সরল ও বোকা একজন সাহাবি হিসেবে, যিনি আমর ইবনুল আসের কৌশল ধরতে পারেননি। অথচ বাস্তবতা এর শতভাগ বিপরীত। তিনি উঁচুস্তরের একজন ফকিহ ছিলেন। ইলমের দিকেও ছিলেন অনেক এগিয়ে। তার যোগ্যতা জেনেই আলি রা. তাকে সালিশ নিযুক্ত করেছিলেন।

১। আবু মুসা আশআরি রা. অত্যন্ত সুন্দর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। এ সম্পর্কে নবিজি বলেন, 'হে আবু মুসা, তোমাকে দাউদের সুমধুর কণ্ঠ দান করা হয়েছে।'[২০৭]

---

২০৫. *আবু মুসা আশআরি লি-মাহমুদ তহমায*, ১২১
২০৬. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ২/৩৯০। *আত-তবাকাতুল কুবরা*, ৪/১০৮
২০৭. *সহিহ বুখারি*, ৫০৪৭। *সহিহ মুসলিম*, ৭৯৩

২। নবিজি একবার দুআয় বলেন, 'হে আল্লাহ, আপনি আবদুল্লাহ বিন কাইসকে ক্ষমা করুন এবং কিয়ামতের দিনে তাকে সম্মানিত করুন'[২০৮]

৩। ইমাম শাবি বলেন, 'উমর, আলি, যায়দ বিন সাবিত ও আবু মুসা আশআরি হলেন এই উম্মাহর বিচারক।'[২০৯]

২০৮. *সহিহ বুখারি*, ৪৩২৩। *সহিহ মুসলিম*, ২৪৯৮

২০৯. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ২/৩৮৯

ফিতনা সম্পর্কে নবিজির ভবিষ্যদ্বাণী

হজরত উসমান রা.-এর সময় থেকে দেখা দেয় নানা ফিতনা। এ সময় একের পর এক বাতিল ফিরকা জন্ম নেয়, যারা নানা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিমবিশ্বকে অস্থিতিশীল করে তোলে। তাদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের কারণেই হজরত উসমান রা. শহিদ হন। পরবর্তী সময়ে সাহাবিদের মধ্যে সংঘটিত হয় জংগে জামাল ও জংগে সিফফিন। বেশ কিছু হাদিসে নবিজি এই সময়কালের ফিতনা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে সাহাবিদের সতর্ক করেছেন। এ সংক্রান্ত কিছু হাদিস উল্লেখ করছি।

১। একবার নবিজি মদিনায় পাথরনির্মিত একটি ঘরের ছাদে আরোহণ করে বলেন, 'আমি যা দেখি তোমরা কি তা দেখতে পাচ্ছ? বৃষ্টির বিন্দু পতিত হওয়ার স্থানের মতো তোমাদের ঘরসমূহের মাঝে ফিতনার স্থানসমূহ আমি দেখতে পাচ্ছি।'[২১০]

ইমাম নববি এই হাদিসের ব্যাখায় লেখেন, 'বৃষ্টির ফোঁটার পতিত স্থানের সাথে তুলনা দেওয়ার কারণ হলো, এর সংখ্যা বেশি হয় এবং তা সর্বত্রই ছড়িয়ে যায়। এই হাদিস থেকে উসমান রা.-এর শাহাদাত, জংগে জামাল, জংগে সিফফিন, হাররার যুদ্ধ, হজরত হুসাইনের শাহাদাত ইত্যাদি ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী মেলে। এটি স্পষ্টতই নবিজির মুজিজা।'[২১১]

২। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ভবিষ্যতে ফিতনা ও বিচ্ছিন্নতা দেখা দেবে। সে সময় এলে তুমি তোমার তরবারি ভেঙে ফেলবে এবং কাঠের তরবারি বানিয়ে নেবে। (অর্থাৎ তুমি কারও রক্তপাতের কারণ হবে না)।[২১২]

৩। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার খালিদ বিন উরফুতাহ রা.-কে বলেন, 'হে খালেদ, আমার পরে বহু অঘটন, ফিতনা ও মতানৈক্য তৈরি হবে। সুতরাং পারলে তুমি আল্লাহর নিহত বান্দা হও, কিন্তু হত্যাকারী হয়ো না।'[২১৩]

---

২১০. *সহিহ বুখারি*, ১৮৭৮

২১১. *শারহুল মুসলিম*, ১৮/৮। অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন ইবনু হাজার আসকালানিও। দেখুন, *ফাতহুল বারি*, ১৩/১৩

২১২. *মুসনাদে আহমাদ*, ২০৬৭১। হাদিসের সনদ সহিহ।

২১৩. *মুসনাদে আহমাদ*, ২২৪৯৯। *আল-মুজামুল কাবির*, ১৭০৩। *মুসনাদে আবু ইয়ালা*, ১৫২৩। সনদ সহিহ।

৪। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু ফিতনা সম্পর্কেই ভবিষ্যদ্বাণী করেননি, বরং তিনি ফিতনার সূত্রপাত এবং ফিতনা কোথা থেকে আবির্ভূত হবে সে সম্পর্কেও সতর্ক করেছেন। একবার তিনি পূর্বদিকে ইশারা করে বলেন, 'সাবধান, ফিতনা সেদিকে যেদিকে শয়তানের শিং উদিত হয়।'[২১৪] আরেকবার তিনি পূর্বদিকে ইশারা করে বলেন, 'এখান থেকে ফিতনা আসবে!'[২১৫]

একবার নবিজি দুআ করেন, 'হে আল্লাহ, আমাদের জন্য সিরিয়া ও ইয়ামানে বরকত দাও!' সাহাবিরা বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমাদের নজদের জন্যও দুআ করুন!' নবিজি বললেন, 'হে আল্লাহ, আমাদের জন্য শাম ও ইয়ামানে বরকত দাও!' সাহাবিরা বললেন, 'আমাদের নজদের জন্যও!' নবিজি বললেন, 'সেখানে ভূমিকম্প, ফিতনা হবে এবং সেখান থেকে শয়তানের শিং বের হবে।'[২১৬]

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, 'আমি নবিজিকে দেখেছি, তিনি ইরাকের দিকে হাত দ্বারা ইশারা করে বলেছেন, সাবধান, নিশ্চয়ই ফিতনা এখান থেকে আসবে। নিশ্চয়ই ফিতনা এখান থেকে আসবে। তিনি এই কথাটি তিনবার বলেছিলেন।'[২১৭]

এই সংক্রান্ত হাদিসগুলোর ব্যাখ্যায় ইবনু হাজার আসকালানি লিখেছেন, 'প্রথম ফিতনা সংঘটিত হয় পূর্বদিকে এবং মুসলমানদের মাঝে দ্বন্দ্ব ও দূরত্ব সৃষ্টি হয়। এতে শয়তান খুশি ও আনন্দিত হয়। এভাবে এই অঞ্চলে নানা বিদআতেরও সূত্রপাত হয়।' খাত্তাবি বলেন, 'নজদ হলো পূর্বদিকে অবস্থিত। যারা মদিনায় অবস্থান করতেন তাদের জন্য নজদ হলো ইরাকের মরু অঞ্চল।'[২১৮]

৫। মূলত ফিতনার সূত্রপাত হয়েছিল হজরত উমর রা.-এর শাহাদাতের পরেই। এ সময় নানা গ্রুপ ভেতরে ভেতরে নিজেদের শক্তি সঞ্চয় করে, পরে উসমান রা.-এর শাহাদাতের মাধ্যমে তারা ময়দানে আবির্ভূত হয়। একাধিক হাদিসে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বিষয়টিও ইঙ্গিত করেছেন। একটি হাদিসে নবিজি হজরত উমর রা. সম্পর্কে বলেন, 'এই ব্যক্তি ফিতনার দরজা। সে যতক্ষণ তোমাদের মাঝে থাকবে ততক্ষণ তোমাদের মাঝে ও ফিতনার মাঝে শক্তিশালী

---

২১৪. *সহিহ বুখারি*, ৭০৯৩। অনুরূপ হাদিস, *সহিহ বুখারি*, ৩৫১১

২১৫. *মুসনাদে আহমাদ*, ৫৬৪৩। *মাজমাউয যাওয়ায়েদ*, ৩/৩০৫। বর্ণনাকারীগণ সিকাহ।

২১৬. *সহিহ বুখারি*, ৭০৯৪

২১৭. *মুসনাদে আহমাদ*, ৬৩০২

২১৮. *ফাতহুল বারি*, ১৩/৪৭। মাজদুদ্দিন ফাইরোজাবাদি লিখেছেন, 'নজদ বলা হয় উচ্চভূমিকে। উঁচু এলাকা যা নিম্নভূমির বিপরীত, তাই নজদ। ইয়ামান থেকে শুরু করে শাম ও ইরাক পর্যন্ত বিস্তৃত উচ্চভূমিই নজদ।' *আল-কামুসুল মুহিত*, ১/৩৫২। একই কথা লিখেছেন ইবনু মানযুরও। দেখুন, *লিসানুল আরব*, ১৪/৪৫। ইয়াকুত হামাবি মোট ১১টি নজদের কথা উল্লেখ করেছেন। দেখুন, *মুজামুল বুলদান*, ৫/২৬৫

দরজা থাকবে।'[২১৯] আরেকটি হাদিসে নবিজি বলেন, 'এই ব্যক্তি যতক্ষণ তোমাদের মাঝে থাকবে ততক্ষণ ফিতনা তোমাদের স্পর্শ করবে না।'[২২০]

একবার হজরত হুজাইফা রা., হজরত উমরের সামনে বসা ছিলেন। হজরত উমর রা. বললেন, 'ফিতনা-ফাসাদ সম্পর্কে নবিজির বক্তব্য কে মনে রেখেছ?' হুজাইফা বললেন, 'আমি মনে রেখেছি।' হজরত উমর বললেন, 'নবিজির বাণী মনে রাখার ক্ষেত্রে তুমি খুব দৃঢ়তার পরিচয় দিচ্ছ।' হুজাইফা বললেন, 'মানুষ নিজের পরিবার, সন্তান-সন্ততি, ধনসম্পদ ও প্রতিবেশীর ব্যাপারে যে ফিতনায় পতিত হয়, তা সালাত, সিয়াম, সদকা, আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারের মাধ্যমে দূর হয়ে যায়।' হজরত উমর রা. বললেন, 'আমি সেই ফিতনার কথা বলছি যা সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো ভয়াল হবে।' হুজাইফা বললেন, 'আমিরুল মুমিনিন, সে ব্যাপারে আপনার ভয়ের কোনো কারণ নেই। আপনার ও সেই ফিতনার মাঝে একটি দরজা আছে।' হজরত উমর জিজ্ঞেস করলেন, 'সেই দরজা কি খুলে ফেলা হবে, না ভেঙে ফেলা হবে?' হুজাইফা বললেন, 'ভেঙে ফেলা হবে।' হজরত উমর বললেন, 'তাহলে তো আর কোনোদিন তা বন্ধ করা যাবে না।'

হুজাইফা রা.-এর ছাত্র শাকিক বলেন, 'আমি হজরত হুজাইফাকে জিজ্ঞেস করলাম, উমর রা. কি সেই দরজা সম্পর্কে জানতেন?' হুজাইফা বলেন, 'দিনের পূর্বে রাতের আগমন যেমন সুনিশ্চিত, তিনিও সেভাবেই নিশ্চিতভাবে জানতেন। কারণ, আমি তাঁর কাছে এমন একটি হাদিস বর্ণনা করেছি যা মোটেও ত্রুটিযুক্ত নয়।' শাকিক বলেন, 'আমি হুজাইফাকে সেই দরজা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে ভয় পাচ্ছিলাম। আমি মাসরুককে জিজ্ঞেস করলাম সেই দরজাটি কী? তিনি জবাব দিলেন, দরজাটি ছিলেন হজরত উমর রা. নিজেই।'[২২১]

সবগুলো হাদিস সামনে রাখলে জানা যায়, 'হজরত উমর রা. ছিলেন ফিতনা ও উম্মতের মাঝে একটি দরজা। তাঁর ইনতিকালের মাধ্যমে দরজাটি খুলে যায় এবং ফিতনা প্রবেশ করে। তিনি যতদিন ছিলেন মুসলিম উম্মাহ ফিতনা থেকে নিরাপদ ছিল। তার ইনতিকালের মাধ্যমে এই নিরাপত্তা শেষ হয়ে যায়।'

৬। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত উসমান রা.-এর শাহাদাতের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। একবার হজরত উসমান রা. নবিজির কাছে প্রবেশের অনুমতি

---

২১৯. *আল-মুজামুল কাবির*, ৮৩২১
২২০. *আল-মুজামুল আওসাত*, ১৯৪৫। *ফাতহুল বারি*, ৬/৬০৬
২২১. *সহিহ বুখারি*, ৫২৫। *সহিহ মুসলিম*, ১৪৪

চাইলে নবিজি আবু মুসা আশআরি রা.-কে বলেন, 'তাঁকে ভেতরে আসতে বলো এবং জান্নাতের সুসংবাদ দাও! তবে তাঁর কঠিন বিপদ হবে!'[২২২]

একবার নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহুদ পাহাড়ের ওপর আরোহণ করেন। তাঁর সাথে ছিলেন হজরত আবু বকর, উমর ও উসমান। এ সময় পাহাড়টি দুলে উঠলে নবিজি বলেন, 'হে ওহুদ, থামো! তোমার ওপর এখন নবি, সিদ্দিক ও শহিদ ছাড়া আর কেউ নেই।'[২২৩] এই হাদিস থেকে উসমান রা. ও উমর রা.-এর শাহাদাতের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

একবার নবিজি ফিতনা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, 'উসমান সেই ফিতনায় অন্যায়ভাবে নিহত হবে।'[২২৪] আরেকবার নবিজি ফিতনা সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। এ সময় একজন ব্যক্তি সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। নবিজি বললেন, 'এই ব্যক্তি সে ফিতনায় মজলুম হিসেবে নিহত হবে।' ইবনে উমর বলেন, 'আমি তাকিয়ে দেখলাম, লোকটি উসমান রা.।'[২২৫] একবার নবিজি উসমান রা.-কে বলেন, 'হে উসমান, আল্লাহ তোমাকে একটি জামা পরিধান করাবেন। (অর্থাৎ খেলাফত দান করবেন।) লোকেরা তা খুলে নিতে চাইলে তাদের দাবিতে তুমি তা ত্যাগ করবে না।'[২২৬]

উসমান রা.-এর শাহাদাতের আগে বিদ্রোহীরা যখন তার গৃহ অবরোধ করে তখন তাকে লড়াই করতে বলা হলে তিনি বলেন, 'আমি নবিজির সাথে কিছু ওয়াদা করেছি। সুতরাং আমি এখন নিজের ওপর ধৈর্যধারণ করব।'[২২৭]

দেখা যাচ্ছে উসমান রা.-এর শাহাদাতের বিষয়টি নবিজি একাধিক হাদিসের মাধ্যমে বিবৃত করেছেন। প্রশ্ন হতে পারে, উসমান রা. ও উমর রা. দুজনই শহিদ হয়েছেন, কিন্তু নবিজি বিশেষভাবে উসমান রা.-এর শাহাদাতের বিষয়টিই বললেন কেন?

এর উত্তর হলো, হজরত উমর শাহাদাত বরণ করলেও মুসলিম উম্মাহ তাঁর শক্তি হারায়নি। কিন্তু উসমান রা.-এর শাহাদাতের ফলে গৃহবিবাদ শুরু হয় এবং কিছুদিনের জন্য মুসলমানদের বিজয়াভিযান স্থবির হয়ে পড়ে। হজরত উমরের হত্যাকারী ছিল একজন পরিচিত ব্যক্তি। সে ছিল অমুসলিম এবং হত্যার পরেই

---

২২২. *সহিহ বুখারি*, ৩৬৭৪। *সহিহ মুসলিম*, ২৪০৩
২২৩. *সহিহ বুখারি*, ৩৬৮৬
২২৪. *তিরমিযি*, ৩৭০৮। সনদের মান হাসান।
২২৫. *মুসনাদে আহমাদ*, ৫৯৫২
২২৬. *তিরমিযি*, ৩৭০৫। *সুনানে ইবনে মাজাহ*তে হাদিসটি আরও দীর্ঘ আকারে এসেছে। দেখুন, *ইবনে মাজাহ*, ১১২
২২৭. *মুসনাদে আহমাদ*, ২৪২৫৩

তাকে শাস্তি হিসেবে হত্যা করা হয়, এবং একে ঘিরে আর কোনো ফিতনা বা বিভেদ মাথাচাড়া দিতে পারেনি। অপরদিকে উসমান রা.-কে হত্যা করেছিল একাধিক ব্যক্তি। এদের অনেকেই ছিল মুসলিম ও অপরিচিত। এদের বিচারপ্রক্রিয়া নিয়েই বিভেদ শুরু হয় এবং পরে তা দীর্ঘস্থায়ী মতভেদের কারণ হয়। ফলে দেখা যায় একটি অস্পষ্ট ও আত্মবিনাশী ফিতনা শুরু হয় যা হজরত উমরের সময় হয়নি। সম্ভবত এজন্যই নবিজি একাধিক হাদিসের মাধ্যমে এই ফিতনা ও উসমান রা.-এর শাহাদাতের বিষয়টি জানিয়েছিলেন।

ফিতনার বিবরণ
পর্দার আড়ালে প্রস্তুতি

একটি ষড়যন্ত্র বা চক্রান্ত বাস্তবে রূপ নেওয়ার আগে পর্দার আড়ালে দীর্ঘসময় ধরে চলে এর প্রস্তুতি। এ সময় অবলম্বন করা হয় সর্বোচ্চ গোপনীয়তা, ফলে খুব কম মানুষই এই প্রস্তুতি সম্পর্কে জানতে পারে। সাধারণের সামনে ষড়যন্ত্রটি প্রকাশিত হয় এটি বাস্তবায়ন হওয়ার পরেই। হজরত উসমান রা.-এর শাহাদাত ও মুশাজারাতে সাহাবার বিষয়টিও এমন। উসমান রা.-এর শাসনকালের শুরুর দিকের আপাতশান্ত পরিস্থিতির ভেতরেই জন্ম নেয় ঘুনপোকা, পরবর্তী সময় যা ইসলামি শাসনব্যবস্থার ভিতে আঘাত করে।

উসমান রা.-এর শাসনকালের শুরুটা[২২৮] ছিল আগের দুই খলিফার মতোই। সীমান্ত ছিল নিরাপদ, যেখানে পাহারা দিচ্ছিলেন উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সন্তান সাহাবায়ে কেরামরা। জনগণ ছিল সুখী, নেতারা ছিলেন আমানতদার, ফলে সর্বত্র ছিল সমৃদ্ধির ছোঁয়া। মুসলিমবিশ্ব ছিল শান্ত সাগরের মতো স্থির, যেখানে বাহ্যত ঝড়ের কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। কিন্তু সকলের অজান্তে রাজধানী মদিনা থেকে বেশ দূরে ইয়ামানে শুরু হয় ষড়যন্ত্রের প্রাথমিক প্রস্তুতি। এর শুরুটা হয়েছিল আবদুল্লাহ ইবনে সাবার হাত ধরে।

আবদুল্লাহ ইবনে সাবা

উসমান রা.-এর শাসনকালের শুরুর দিকে ইয়ামানের সানআ শহরের এক ইহুদি ইসলাম গ্রহণ করে। তার নাম আবদুল্লাহ ইবনে সাবা।[২২৯] কুচকুচে কালো চেহারার এই ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পর সে কালের রীতি অনুযায়ী সাহাবিদের সান্নিধ্যে

---

২২৮. উসমান রা. বাইআত গ্রহণ করেন ২৩ হিজরিতে।

২২৯. আবদুল্লাহ ইবনে সাবার মা ছিল একজন নিগ্রো দাসি। এজন্য ইবনে সাবাকে ইবনুস সাওদাও বলা হতো। সে ছিল ইহুদি। জীবনের শুরুতে বেশিরভাগ সময় সে ইয়ামানেই কাটায়। এ সময় সে অগ্নিপূজকদের থেকে অনেক বিদ্যা শিখে নেয়। ইসলামের প্রতি তার অন্তরে ছিল বদ্ধমূল ঘৃণা। সে চাচ্ছিল ইসলামের ওপর কোনোভাবে আঘাত করতে। আঘাতের প্রকৃতিটি কেমন হবে, তা নিয়ে সে চিন্তা করছিল। এজন্যই সে বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করে এবং মুসলিম সমাজে মুসলমান হিসেবে বসবাস করে নিজের ইচ্ছামতো বিভ্রান্তি ছড়াতে থাকে। বিস্তারিত জানতে দেখুন, *তারিখুত তবারি*, ৪/৩৪১-৩৪৫

আসেনি। বরং সবার থেকে কিছুটা দূরে থেকেই সে বাহ্যিকভাবে ধর্মকর্ম করতে থাকে। কয়েক বছর সে বসরা, কুফা, শাম ও হিজাজে সফর করে। এ সময় সে বুজুর্গের বেশ ধরে জনসাধারণের মধ্যে কিছুটা জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বাহ্যত তাকে মনে করা হতো এমন এক বুজুর্গ যিনি সৎকাজের আদেশ দেন, এবং অসৎকাজে নিষেধ করেন। জনপ্রিয়তা কাজে লাগিয়ে সে মুসলমানদের মাঝে কিছু বিভ্রান্তি প্রচার করতে থাকে। যেমন সে বলে, 'নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসা আলাইহিস সালামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তাই পৃথিবীতে তিনি আবারও আসবেন।'

অজ্ঞ লোকদের মাঝে তার এই মত বেশ জনপ্রিয় হয়। এবার সে বলতে থাকে, 'প্রত্যকে নবির একজন স্থলাভিষিক্ত থাকেন। আলি রা. হলেন নবিজির স্থলাভিষিক্ত। নবিজি ছিলেন খাতিমুল আম্বিয়া, [২৩০] আর আলি রা. হলেন খাতিমুল আউসিয়া।'[২৩১]

ইবনে সাবার মূল উদ্দেশ্য ছিল উসমান রা.-এর প্রতি মানুষকে খেপিয়ে তোলা এবং ইসলামি খিলাফাহকে অস্থিতিশীল করার মাধ্যমে এর ভিত নড়বড়ে করা। সে নিজের উদ্দেশ্য সাধনে কাজ চালাতে থাকে। সে বারবার বলতে থাকে, 'যে নবিজির অসিয়ত মোতাবেক আমল হতে দেয় না, উল্টো অসিয়তকৃত ব্যক্তির অধিকার হরণ করে নিজেই উম্মাহর মালিক বনে যায়, তার চেয়ে বড় জালিম আর কে হতে পারে!'[২৩২]

এবারও মূর্খ লোকদের মাঝে তার এই দাবি বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করে। তারা ভাবতে থাকে, হজরত উসমান রা. হজরত আলি রা.-এর ন্যায্য অধিকার কেড়ে নিয়েছেন। ইবনে সাবা তার অনুসারীদের প্রতি লক্ষ রাখছিল। সে যখন বুঝল, তার অনুসারীরা উসমান রা.-এর ওপর খেপে আছে, তখন সে বলল, 'নবিজির অসিয়তকৃত ব্যক্তি জীবিত থাকা অবস্থায় উসমান অন্যায়ভাবে ক্ষমতা দখল করেছে। তার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলো এবং কর্তব্যে মনোযোগ দাও।'[২৩৩]

ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রভূমি

আমরা যে সময়ের আলোচনা করছি তা ছিল খেলাফতে রাশেদার যুগ। সমাজের বেশিরভাগ মানুষ ছিলেন উন্নত ইলম, আমল ও আখলাকের অধিকারী। তবে এ সময় নতুন নতুন সাম্রাজ্য ইসলামের অধীনে আসার ফলে সমাজে নওমুসলিমের

---

২৩০. সর্বশেষ নবি।

২৩১. সর্বশেষ অসিয়তকৃত ব্যক্তি।

২৩২. *তারিখুত তবারি*, ৪/৩৪০

২৩৩. প্রাগুক্ত, ৪/৩৪১

সংখ্যাও বাড়ছিল। তাদের অনেকের মাঝেই ইসলামের শিক্ষা ভালোভাবে পোক্ত হয়নি। ইলমের দিকেও তারা ছিলেন কিছুটা পিছিয়ে। এ ধরনের মানুষের মাঝে ইবনে সাবার বিচ্ছিন্ন মত প্রচার করা সহজ হয়ে যায়।

নিজের চক্রান্ত প্রচারের জন্য ইবনে সাবা বেছে নেয় তিনটি শহরকে। কুফা, বসরা ও ফুসতাত।[২৩৪] এই শহরগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল হজরত উমরের শাসনামলে। নানা অঞ্চল থেকে লোকজন এসে এখানে বসতি গড়ে তোলে। বাণিজ্যিক কেন্দ্র হওয়ার কারণে এখানে লোকজনের আনাগোনা লেগেই থাকত। ফলে এখানে একপ্রকার মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। ফলে এখানকার পরিবেশ অন্যান্য শহরের তুলনায় কিছুটা অস্থিতিশীলই ছিল। বিশেষত কুফার লোকজন শুরু থেকেই অস্থিরতা প্রকাশ করছিল। তারা নিয়মিত গভর্নরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করত। হজরত উমরের শাসনামলে এখানকার জনসংখ্যা ছিল মাত্র ১ লাখ, কিন্তু তারা কখনোই কোনো গভর্নরের ওপর সন্তুষ্ট হতে পারেনি। আশারায়ে মুবাশশারার অন্যতম সদস্য সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস এখানে গভর্নর ছিলেন হজরত উমরের শাসনামলে। কুফার লোকেরা অভিযোগ করে, 'তিনি নামাজ ঠিকমতো পড়ান না, ইনসাফ করেন না, মাল বণ্টনে ন্যায়বিচার করেন না, জিহাদও করেন না।'[২৩৫] হজরত উমর তখন হজরত সাদকে অব্যাহতি দিয়ে আম্মার ইবনু ইয়াসিরকে গভর্নর করেন। এবার কুফার লোকেরা বলে, 'তার রাজনৈতিক জ্ঞানবুদ্ধির অভাব আছে।' হজরত উমর বিরক্ত হয়ে মন্তব্য করেন, এদের জন্য কঠোর স্বভাবের গভর্নর নিযুক্ত করলে এরা দোষচর্চা শুরু করে, আবার নরম স্বভাবের কাউকে নিযুক্ত করলে এরা তুচ্ছতাচ্ছিল্য শুরু করে।[২৩৬]

বসরার বিষয়টিও ছিল এমন অস্থিতিশীল। হজরত উমর নিজেও বিষয়টি বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি এখানে আবু মুসা আশআরিকে গভর্নর করে পাঠানোর সময় বলেছিলেন, 'আপনাকে এমন এক স্থানে দায়িত্ব দিয়ে পাঠাচ্ছি, যেখানে শয়তান ডিম পেড়ে রেখেছে। ইতিমধ্যে সেখানে বাচ্চাও ফুটে গেছে।'[২৩৭]

এই শহরগুলোর অস্থিরতা সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে সাবা ভালো করেই জানত। ফলে সে ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র হিসেবে এই শহরগুলোই বেছে নেয়। এখানে গড়ে তোলে নিজের অনুসারী। প্রত্যেকের মাঝে যোগাযোগের ওপর দেওয়া হয় জোর। একই সময় নিজেদের গোপনীয়তা রক্ষার কাজটিও তারা করতে থাকে নিপুণতার সাথে।

---

২৩৪. এটি ছিল মিশরের প্রধান শহর।

২৩৫. *সহিহ বুখারি*, ৭৫৫

২৩৬. *ফুতুহুল বুলদান*, ২৪৭। পরে এখানে মুগিরা ইবনে শুবাকে নিয়োগ দেওয়া হয়। হজরত উমরের ইনতিকাল পর্যন্ত তিনি এখানে গভর্নর ছিলেন।

২৩৭. *তারিখুত তবারি*, ৪/৭০-৭১

অভিযোগের তির

আবদুল্লাহ ইবনে সাবার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল স্পষ্ট। সে চাচ্ছিল উসমান রা.-এর প্রতি নানা অভিযোগ উপস্থাপনের মাধ্যমে জনগণকে তার প্রতি বিরক্ত করে তোলা। জনগণের মাঝে ক্ষোভের মাত্রাটি যথেষ্ট হলে এরপর তাদেরকে বিদ্রোহের দিকে নিয়ে যাওয়া। সুতরাং এজন্য সে তার অনুসারীদের মাঝে উসমান রা.-এর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ প্রচার করতে থাকে। তার এই অপপ্রচারে একটি বড় অভিযোগ ছিল উসমান রা. তার আত্মীয়দের বেশি প্রাধান্য দিচ্ছেন।

ইবনে সাবার এই অপপ্রচার এমনই এক মিথ্যা ও কৌশলী প্রচার যার ফাঁদে পা দিয়ে আধুনিক অনেক মুসলিম গবেষকও এমনটাই বিশ্বাস করেন এবং প্রচার করেন। তারাও ইবনে সাবা ও তার অনুসারীদের সুরে সুর মিলিয়ে বলেন, উসমান রা. ইনসাফ করতে পারেননি। রাজ্য পরিচালনায় তিনি তার আত্মীয়দের প্রাধান্য দিয়েছেন।

এটা ঠিক হজরত আবু বকর ও হজরত উমরের নীতি ছিল আত্মীয় যোগ্য হলেও তাকে কোনো পদ দেওয়া হবে না। উমর রা. মৃত্যুর আগে আবদুর রহমান ইবনে আউফ, উসমান ও আলি রা.-কে অসিয়ত করেছিলেন, 'যদি তোমাদের খলিফা বানানো হয় তাহলে আপন আত্মীয়দের গভর্নর বানাবে না।'[২৩৮] কিন্তু উসমান রা. মনে করতেন, আত্মীয়রা যদি যোগ্য হয় এবং তাদের দ্বারা যদি দীন ও দেশের কল্যাণ হয় তাহলে নিয়োগ দিতে সমস্যা নেই। যেহেতু হজরত উমরের অসিয়ত কোনো শরয়ি আদেশ ছিল না, তাই এটি অমান্য করাতেও দোষের কিছু নেই।

এই চিন্তা থেকে উসমান রা. বেশ কিছু পদে নিজের আত্মীয়দের নিয়োগ দিয়েছিলেন, যারা বাস্তবিক অর্থেই সেই পদের যোগ্য ছিল। এ ক্ষেত্রে তিনি কোনো দুর্নীতি করেননি, কিংবা হারাম কাজও করেননি। তার কাজটি ছিল বৈধতার সীমার ভেতরেই, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে উত্তমও, কিন্তু তার এই কাজ সাবায়ি চক্রের হাতে সুযোগ তুলে দেয় নানা অভিযোগ তোলার। কুচক্রী আবদুল্লাহ ইবনে সাবা বুঝতে পারছিল, উসমান রা.-এর প্রতি স্বজনপ্রীতির অভিযোগ তোলাটা সহজ হবে, মানুষও গ্রহণ করবে। যদিও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ সত্য নয়, বরং প্রতিটি নিয়োগের পেছনেই ছিল একাধিক হিকমাহ ও কৌশল, কিন্তু জনসাধারণ অত তলিয়ে দেখবে না। তারা অভিযোগ শুনেই ভাববে এটা তো সত্য। আবদুল্লাহ ইবনে সাবা তাই তার অনুসারীদের নির্দেশ দিলো, উসমান রা.-এর প্রশাসকদের চরিত্রহননের মাধ্যমে কাজের সূচনা করো। একইসাথে তোমরা আমর বিল মারুফ

---

২৩৮. *মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক*, ১৭৭৬। *মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা*, ৩৭০৭১

ও নাহি আনিল মুনকারের কাজ চালিয়ে যাবে। এতে জনসাধারণ তোমাদের প্রতি আস্থা রাখবে।[২৩৯]

আবদুল্লাহ ইবনে সাবা তার ঘৃণ্য কৌশল প্রচারে কাজে নেমে পড়ল। অল্পদিনেই দেখা গেল অনেকে তার কথায় প্রভাবিত হয়ে উসমান রা.-এর প্রতি আস্থা হারিয়েছেন। এমনকি উসমান রা.-এর কোলে মানুষ হওয়া মুহাম্মদ ইবনু হুজাইফা ও হজরত আবু বকরের ছেলে মুহাম্মদও এই ফিতনার ফাঁদে পড়ে উসমান রা.-এর কঠোর সমালোচক হয়ে উঠলেন।[২৪০]

আত্মীয়দের নিয়োগের ফলে এমনিতেই ইবনে সাবার পক্ষে অভিযোগ তোলা সহজ হয়, এর মধ্যে ২৯ হিজরিতে এমন একটি ঘটনা ঘটে যায় যার ফলে সাবায়ি প্রচারণা পালে হাওয়া পায়। এটি ছিল ওলিদ ইবনু উকবার ঘটনা, যা সাবায়িদেরকে প্রকাশ্যে আসার সুযোগ করে দেয়।

ওলিদ ইবনু উকবার ঘটনা

ওলিদ ইবনু উকবা ছিলেন উসমান রা.-এর চাচাতো ভাই। তিনি সাহাবি ছিলেন।[২৪১] ২৫ হিজরিতে তাকে কুফার গভর্নর নিয়োগ দেওয়া হয়। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ শাসক, অল্পদিনেই তিনি প্রজাদের মন জয় করে ফেলেন।[২৪২] তার ঘরে কোনো দরজা ছিল না। ফলে যেকোনো সময় যে-কেউ তার সাথে সাক্ষাৎ করে নিজের প্রয়োজন জানাতে পারত।[২৪৩]

২৯ হিজরিতে অভিযোগ ওঠে ওলিদ ইবনু উকবা মদ্যপান করেছেন। অভিযোগ মদিনায় পৌঁছলে উসমান রা. সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। একাধিক ব্যক্তি সাক্ষ্য দিলে উসমান রা. তাকে ৪০ দোররা মারার আদেশ দেন। তখনই আদেশ কার্যকর করা হয়।[২৪৪] এ ধরনের মানবিক বিচ্যুতি নবিজির যুগেও সাহাবিদের কারও কারও দ্বারা প্রকাশ পেয়েছিল। ফলে ওলিদ ইবনু উকবার মদ্যপানের ঘটনা সত্য হলেও সমস্যা নেই।

---

২৩৯. *তারিখুত তবারি*, ৪/৩৪১

২৪০. *তারিখুল ইসলাম*, ৩/৬০২। *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ৩/৪৮০-৪৮২

২৪১. হজরত আবু বকর ও উমর রা.-এর শাসনামলে তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বিস্তারিত জানতে দেখুন, *তারিখুত তবারি*, ৪/১৬৮। *কাসলুল খিতাব ফি মাওয়াকিফিল আসহাব*, ৭৮। *আল-আওয়াসিম মিনাল কাওয়াসিম*, ৮৬

২৪২. একবার ইমাম শাবির সামনে মাসলামা বিন আবদুল মালিকের প্রশংসা করা হচ্ছিল। তখন তিনি বলেন, 'তোমরা যদি ওলিদ ইবনু উকবার নেতৃত্ব ও সমরকুশলতা দেখতে, তাহলে কী বলতে! তিনি জিহাদ করতে করতে বহুদূর চলে যেতেন। তার বাহিনীর কোনো সেনারও ক্ষতি হতো না, কেউ অন্যায় আচরণ করার সাহসও পেত না।' দেখুন, *আত-তামহিদ ওয়াল-বায়ান*, ৪০

২৪৩. *তারিখুত তবারি*, ৪/২৭৫

২৪৪. *সহিহ বুখারি*, ৩৮৭২। *সহিহ মুসলিম*, ৪৫৫৪

কিন্তু *তারিখুত তবারির* একটি বর্ণনা থেকে জানা যায়, যারা ওলিদ ইবনু উকবার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছিল তারা চক্রান্তের অংশ হিসেবে এটি করেছিল। তাদের সন্তানরা একটি অপরাধে জড়ালে ওলিদ ইবনু উকবা কিসাস হিসেবে তাদের হত্যা করেছিলেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে তারা ওলিদ ইবনু উকবাকে ফাঁসায় এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়।[২৪৫]

কথা হলো, একদিকে বুখারি-মুসলিমের বর্ণনায় আছে ওলিদ ইবনু উকবাকে মদ্যপানের শাস্তি দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে *তারিখুত তবারির* এই বর্ণনা। তাহলে কোনটি গ্রহণ করা হবে। এ ক্ষেত্রে শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকি উসমানি সুন্দর একটি পর্যালোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'সহিহ বর্ণনা দ্বারা শুধু এটুকু জানা যায় যে, তার ওপর মদ্যপানের শাস্তি আরোপ করা হয়েছে। এর দ্বারা এটা প্রমাণ হয় না যে, তিনি আসলেই মদ্যপান করেছিলেন। বিচারক রায় দেন সাক্ষ্যের ওপর নির্ভর করে। সাক্ষ্য ভুলও হতে পারে। তাই বিচারক রায় দেওয়ার দ্বারা বাস্তবেই সে দোষী হওয়া প্রমাণ হয় না। যেমনটা নবিজিও হাদিসে বলেছেন, হতে পারে তোমাদের মধ্যে কেউ প্রমাণ উপস্থাপনে অন্যের চেয়ে পারঙ্গম।'[২৪৬]

ইবনু হাজার আসকালানিও লিখেছেন, 'বলা হয় কুফার কিছু লোক শত্রুতাবশত তার ব্যাপারে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়।'[২৪৭] ইবনু খালদুনের মতামতও এমন। তিনি লিখেছেন, 'উসমান রা. ও তার প্রশাসকদের ব্যাপারে নানামুখী প্রোপাগান্ডা চালানো হয়। এ সময় ওলিদ বিন উকবার প্রতি মদ্যপানের মিথ্যা অভিযোগ তোলা হয়। কিছু লোক সাক্ষ্যও দেয়।'[২৪৮]

প্রকৃত বাস্তবতা যাই হোক, ওলিদ বিন উকবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাবায়ি চক্র ফিতনা ছড়াতে থাকে। অথচ উসমান রা. এখানে কোনো স্বজনপ্রীতি করেননি। সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তিনি ওলিদ ইবনু উকবাকে শাস্তি দেন এবং ৩০ হিজরিতে তাকে অপসারণ করে সাইদ ইবনুল আসকে সেখানে নিয়োগ দেওয়া হয়। বোঝাই যাচ্ছে ওলিদ ইবনু উকবার ক্ষেত্রে তিনি কোনো গড়িমসি করেননি কিংবা ছাড় দেননি। কিন্তু ফিতনাবাজ সাবায়ি চক্র বলতে থাকে, তিনি ইচ্ছা করে কালবিলম্ব করেছেন ওলিদ ইবনু উকবাকে মাফ করার জন্য। অথচ শুরুতে উসমান রা. কিছুটা সময় নিচ্ছিলেন অপরাধ প্রমাণ করতে। কিন্তু সাবায়ি চক্র একে ভুল ব্যাখ্যা করতে থাকে।

---

২৪৫. *তারিখুত তবারি*, ৩/২৭৫। বর্ণনাটির মান দুর্বল।
২৪৬. *তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম*, ২/৪৯৮-৫০১
২৪৭. *আল-ইসাবা*, ৩/৬৩৮
২৪৮. *তারিখু ইবনি খালদুন*, ২/৪৭৩

কিছুদিন পর উসমান রা. সাহাবিদের পরামর্শে কুরআন কারিমকে একটিমাত্র 'রসমুল খত' বা লিখনপদ্ধতির ওপর সংকলন করার সিদ্ধান্ত নেন। এটি ছিল একটি সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত, কারণ সে সময় নানা সমস্যা দেখা যাচ্ছিল। তিনি কুরআন কারিমের একাধিক কপি তৈরি করে সরকারি তত্ত্বাবধানে তৈরি করা কপি ছাড়া বাকিগুলো নষ্ট করে দেন। সাবায়ি চক্র একে কুরআন অবমাননা বলে হইচই করে এবং অপপ্রচার চালায়। কিন্তু সাহাবিরা উসমান রা.-এর সাথে একমত ছিলেন। হজরত আলি রা. বলেন, 'আমাদের সমর্থন নিয়েই উসমান রা. এই কাজ করেছিলেন। যদি এই কাজের দায়িত্ব আমাদের কাঁধে দেওয়া হতো, আমরাও এমনই করতাম।'[২৪৯]

সাবায়িরা আরেকটি অপপ্রচার চালায় আবু জর গিফারিকে কেন্দ্র করে। আবু জর গিফারি ছিলেন দুনিয়াবিমুখ সাহাবি। নিজের যুহদের কারণে তিনি চাইতেন কেউ সম্পদ জমা না করুক। ৩০ হিজরির দিকে তিনি সিরিয়ায় অবস্থান করছিলেন। এ সময় তিনি জনগণকে সম্পদ জমা না করে সকল সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিতে উদ্বুদ্ধ করেন। যদিও হজরত আবু জর কাজটি করছিলেন ইখলাসের সাথে, উত্তম মনে করে, কিন্তু তার এই প্রচারণার কারণে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির আশঙ্কা ছিল। সবচেয়ে বড় আশঙ্কা ছিল, এই প্রচারণার ফলে শাসক ও শাসিতের সম্পর্কে ভাটা পড়বে। হজরত মুআবিয়া বিষয়টি বুঝতে পেরে উসমান রা.-কে জানান। উসমান রা. তখন আবু জর গিফারিকে মদিনা চলে আসতে বলেন। অপর পত্রে হজরত মুআবিয়াকে বলেন, তাকে সসম্মানে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। আবু জর গিফারি মদিনায় এলে উসমান রা. তাকে নিজের কাছে রেখে দেন। কিন্তু আবু জর গিফারি শহর থেকে একটু দূরে রাবাজাহ নামে একটি খেজুর বাগানে অবস্থান নেন। উসমান রা. তাকে চাপাচাপি না করে একটি উটের পাল ও গোলাম দেন, যেন তিনি সহজেই জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন।[২৫০] মূলত উসমান রা. কৌশলে আবু জর গিফারিকে নিজের কাছে টেনে আনেন এবং তাকে সর্বোচ্চ সম্মান দেন। কিন্তু সাবায়িরা বলতে থাকে, তিনি আবু জর গিফারিকে দেশান্তর করেছেন। মূলত এটি ছিল শতভাগ মিথ্যা প্রচারণা।

দেখা যাচ্ছে, সাবায়ি চক্র চাচ্ছিল যেকোনোমূল্যে পরিস্থিতি খারাপ করতে। তাই তারা এমন বিষয়েও অভিযোগ করছিল, যার কোনো বাস্তবতাই নেই, এবং যে সম্পর্কে সে সময়কার জীবিত সাহাবিরাও কোনো আপত্তি করেননি, উল্টো সমর্থন করেছিলেন।

---

২৪৯. *আল-কামিল ফিত-তারিখ*, ৩০

২৫০. *সহিহ বুখারি*, ১৪০৬

আবদুল্লাহ ইবনে সাবা দেখল, চক্রান্ত চালানোর অনেক রসদ তার হাতে চলে এসেছে। এখন শুধু বিভিন্ন এলাকায় তা উস্কে দেওয়ার পালা। এই লক্ষ্য সাধনে সে সিরিয়া যায়।

সিরিয়ায় আবদুল্লাহ ইবনে সাবা

ইবনে সাবা যখন সিরিয়া যায়, সে সময় সেখানকার গভর্নর ছিলেন হজরত মুআবিয়া রা.। ইবনে সাবা জনগণকে তার বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলার চেষ্টা করে। সে চাচ্ছিল স্থানীয় সাহাবিদের মাধ্যমে বিদ্রোহের সূত্রপাত করতে, তাহলে জনগণকে সম্পৃক্ত করাও সহজ হবে। সে হজরত আবু দারদা রা.-এর সাথে আলোচনা করলে তিনি তার উদ্দেশ্য বুঝে ফেলেন। তিনি সরাসরি বলে বসেন, 'তুই কে? আল্লাহর কসম, আমার মনে হয় তুই এখনো ইহুদিই রয়ে গেছিস!'

এখানে সুবিধা করতে না পেরে ইবনে সাবা গেল উবাদা বিন সামিতের কাছে। তিনিও তার মতলব বুঝতে পারলেন। তিনি তাকে ধরে হজরত মুআবিয়া রা.-এর কাছে নিয়ে গেলেন। হজরত মুআবিয়া সব শুনলেন, কিন্তু বিস্তারিত প্রমাণ না থাকায় ইবনে সাবাকে কোনো শাস্তি না দিয়ে শুধু সতর্ক করে ছেড়ে দিলেন।[২৫১] ইবনে সাবা বুঝতে পারল, সিরিয়ায় তার সুবিধা হবে না। তাই সে সিরিয়া থেকে সরে এলো।

ইরাকে ইবনে সাবা

সিরিয়া থেকে ইবনে সাবা এলো বসরায়। এখানে এসেও সে নিজের গতানুগতিক অভিযোগই প্রচার করে গেল। তার অপপ্রচারের সংবাদ জেনে শহরের গভর্নর আবদুল্লাহ ইবনে আমের তাকে বন্দি করেন। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে সে বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যা বলতে থাকে। শেষে আবদুল্লাহ ইবনে আমের তাকে বসরা থেকে তাড়িয়ে দেন। বসরা থেকে সে আসে কুফায়। এখানে সে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করছিল, কিন্তু সংবাদ পেয়ে সাঈদ ইবনুল আস তাকে বন্দি করেন। তিনিও তাকে কুফা থেকে তাড়িয়ে দেন। সাঈদ ইবনুল আস বুঝতে পারছিলেন, ইবনে সাবা কোনো ফিতনার সূত্রপাত করছে। কিন্তু তার হাতে শক্ত কোনো প্রমাণ ছিল না। যেহেতু এটি ছিল ইনসাফের যুগ, তাই তিনি নিছক অনুমানের ওপর ভর করে কোনো সিদ্ধান্ত নেননি, কাউকে শাস্তিও দেননি।

ইরাক থেকে বিতাড়িত হয়ে ইবনে সাবা আসে মিশর। এখানে বসে সে কুফা ও বসরায় পত্রযোগাযোগ অব্যাহত রাখে। তার মূল লক্ষ্য ছিল উসমান রা.-এর

---

২৫১. *তারিখুত তবারি*, ৪/২৮৩-২৮৪

গভর্নরদের চরিত্রহনন করে তাদের পদচ্যুত করা এবং খিলাফাহকে বিতর্কিত করে তোলা।[২৫২]

কারা ছিল ইবনে সাবার অনুসারী

ইরাক ও মিশরে ইবনে সাবা অনেক অনুসারী জুটিয়ে ফেলেছিল। এদের মধ্যে সমাজের নানা শ্রেণির মানুষ ছিল। ইবনে সাবার অনুসারীরা ছিল নিম্নরূপ—

১। কিছু মানুষ ছিল পরিকল্পনাকারী। এরা ছিল ওইসব ইহুদি যারা শুরু থেকেই ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে আসছিল। এই ইহুদিদের মধ্যে শুধু ইবনে সাবার নাম পাওয়া যায়। বাকিদের নাম জানা যায় না।[২৫৩]

২। কিছু মানুষ ছিল রাষ্ট্রদ্রোহী। বিশেষ করে আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকজন যারা কুরাইশের শাসন মানতে পারছিল না। এরা প্রবল আসাবিয়্যাতে বা জাত্যাভিমানী রোগে আক্রান্ত ছিল।[২৫৪]

৩। কিছু মানুষ নিজেদের দীনদারি নিয়ে অতিরিক্ত অহমে ভুগছিল। তাদের মাঝে ছিল সমালোচনার অভ্যাস। ফলে বিদ্যমান যেকোনোকিছুকেই তারা সমালোচনার লক্ষ্য বানাত। পরে তাদের বড় অংশ সাবায়িদের থেকে আলাদা হয়ে যায়, এবং খারিজি নামে আলাদা ফিরকা গড়ে তোলে।[২৫৫]

৪। বিভিন্ন অপরাধের কারণে রাষ্ট্র অনেককে শাস্তি দিয়েছিল। এই সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীরা সাবায়িদের সাথে হাত মেলায় তাদের ক্ষোভ মেটাতে।[২৫৬]

৫। অনেকে সাবায়িদের সাথে হাত মিলিয়েছিল সম্পদের লোভে। তাদের জানা ছিল ক্ষমতার পালাবদল ঘটাতে পারলে তাদের হাতে আসবে বাইতুল মালের অর্থ।[২৫৭]

৬। তরুণদের কেউ কেউ কাঙ্ক্ষিত পদ অর্জন করতে না পেরে উসমান রা.-এর প্রশাসকদের ওপর ক্ষিপ্ত ছিল। তারাও সাবায়িদের সাথে হাত মেলায়।

৭। এর বাইরে বড় অংশ ছিল সরলপ্রাণ সাধারণ জনগণ। এদের বেশিরভাগ ছিল কৃষক, শ্রমিক ও **গোলাম। এদের মাঝে শিক্ষা ও বিচক্ষণতার অভাব ছিল,**

---

২৫২. *তারিখুত তবারি*, ৪/৩২৬
২৫৩. *তারিখুত তবারি*, ৪/৪১৪
২৫৪. প্রাগুক্ত, ৪/৩২৬
২৫৫. *মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা*, খারিজিদের আলোচনা-সংক্রান্ত অধ্যায়।
২৫৬. *তারিখুত তবারি*, ৪/৩১৮
২৫৭. প্রাগুক্ত, ৪/৩২৩

ফলে যেকোনো বিষয়ের মূল স্বরূপ বোঝা তাদের জন্য সহজ ছিল না। তারা খুব সহজেই সাবায়িদের কথায় প্রভাবিত হতো।

সাবায়ি ফিরকার সদস্যদের ইতিহাসগ্রন্থসমূহে অভিহিত করা হয়েছে সাবায়িয়্যাহ বলে।[২৫৮]

সাবায়িদের অস্তিত্ব—বাস্তবতা নাকি কল্পকথা

উসমান রা.-এর শাসনামল ও তাঁর মৃত্যুপরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ বুঝতে হলে সাবায়িদের তৎপরতা সম্পর্কে আলোকপাত করা জরুরি। প্রথম দিকের ইতিহাসবিদরা তাই গুরুত্বের সাথে সাবায়িদের আলোচনা করেছেন। কিন্তু আধুনিক গবেষকদের কেউ কেউ সাবায়িদের অস্তিত্ব অস্বীকার করতে চান। তাদের কথা হলো, সাবায়িদের সম্পর্কে বেশিরভাগ আলোচনা করেছেন সাইফ ইবনে উমর তামিমি। আর তিনি একজন দুর্বল রাবি। অথচ বাস্তবতা হলো, হাদিসের ক্ষেত্রে তিনি দুর্বল হলেও ইতিহাসের ক্ষেত্রে তার বর্ণনা নেওয়ায় কোনো সমস্যা নেই বলে জরাহ-তাদিলের আলেমরাই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।[২৫৯] তা ছাড়া সাইফ ইবনে উমরকে বাদ দিলেও আরও একাধিক সনদে সাবায়িদের আলোচনা আছে, যেগুলোর মান সহিহ।[২৬০]

আধুনিক সময়ে প্রাচ্যবিদ ও শিয়াদের বড় অংশ সাবায়িদের অস্তিত্ব স্বীকার করতে চান না।[২৬১] তাদের মতে উসমান রা.-এর শাসনামলে যা হয়েছে, তা ছিল জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ ও ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। এতে সাবায়ি বা অন্য কারও ইন্ধন ছিল না। বাস্তবতা হলো, সাবায়ি ফিরকা ও আবদুল্লাহ ইবনে সাবার অস্তিত্ব এক ঐতিহাসিক বাস্তবতা। একে এড়িয়ে যাওয়ার বা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। এখানে সংক্ষিপ্তাকারে কিছু ঐতিহাসিক দলিল উপস্থাপন করা হচ্ছে।

১। আমাশ হামদান (মৃত্যু ৮৩ হিজরি) প্রথম তার কবিতায় সাবায়িদের কথা উল্লেখ করেন। একবার তিনি কুফার লোকদের সম্বোধন করে বলেন, 'আমি

---

২৫৮. এই আন্দোলন সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে দেখুন, *আল-ফিতনাতু ওয়া ওয়াকআতু জামাল*, ৯৬-১৫৮। *আখবারুদ দাওলাতিল আব্বাসিয়্যা*, ১০৫। *তারিখুত তবারি*, ৪/৪৩৬-৪৪৬, ৫/১১৩, ৬/২৫,৮৩। *আল-মুনতাজাম*, ৫/৭৭-৯৫। *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ১০/৪৭০। *তারিখে ইবনে খালদুন*, ২/৬০৩-৬২১

২৫৯. তার সম্পর্কে পেছনে আলোচনা হয়েছে।

২৬০. যেমন *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*-এ সাবায়িদের সম্পর্কে কিছু বর্ণনা এসেছে, যার সনদে সাইফ ইবনু উমর নেই। অনেক আলেম এসব বর্ণনার সনদকে সহিহ বলেছেন।

২৬১. তাদের দ্বারা প্রভাবিত গবেষকদের মাঝেও এ প্রবণতা প্রকট।

তোমাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছি, তোমরা সাবায়ি। হে কুফার লোকেরা, আমি তোমাদের সম্পর্কে ভালো করে জানি।'[২৬২]

২। ইমাম শাবি (মৃত্যু ১০৩ হিজরি) বলেন, 'প্রথম মিথ্যুক হলো ইবনে সাবা।'[২৬৩]

৩। জাহিজ (মৃত্যু ২৫৫ হিজরি) আবদুল্লাহ ইবনে সাবা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।[২৬৪]

৪। জরাহ-তাদিলের ইমামরা গুরুত্বের সাথে ইবনে সাবা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। যেমন ইবনু হিব্বান[২৬৫], ইমাম যাহাবি[২৬৬], ইবনু হাজার আসকালানি[২৬৭] তার সম্পর্কে লিখেছেন। ইমাম ইবনু তাইমিয়াও[২৬৮] তার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

৫। বংশ-লতিকা সংক্রান্ত গ্রন্থেও রয়েছে তার সম্পর্কে আলোচনা। যেমন ইমাম সামআনি তার লিখিত *কিতাবুল আনসাব*-এ তার আলোচনা করেছেন।

৬। সাবায়িদের সম্পর্কে আরও যারা আলোচনা করেছেন তারা হলেন, ইবনু আসাকির[২৬৯], ইমাম শাতিবি[২৭০], আল্লামা মাকরিজি[২৭১]।

৭। প্রসিদ্ধ কয়েক সাবায়ির নাম, খালিদ ইবনু মুলজাম, সুদান ইবনু হুমরান, কিনানা ইবনু বশির, মালিক ইবনু আশতার, হুকাইম ইবনু জাবালা, হুরকুস ইবনু জুহাইর, আশতার নাখয়ি, রুমান, আবদুর রহমান গাফিকি, আল-মাওতুল আসওয়াদ, কুতাইবা, কুলসুম, আমর ইবনু জুরমুয।

শুধু আহলুস সুন্নাহ নয়, বরং শিয়াদের বইপত্রেও আবদুল্লাহ ইবনে সাবা সম্পর্কে আলোচনা এসেছে।[২৭২]

---
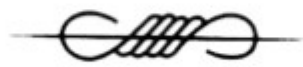
২৬২. *দিওয়ানু আমাশ হামদান*, ১৪৮

২৬৩. *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, ৯/৩৩১। ইবনু হাবিব (মৃত্যু ২৪৫ হিজরি) বলেন, 'সে ছিল হাবশি বাঁদির সন্তান।' *তারিখু বাগদাদ*, ২/২৭৭

২৬৪. *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন*, ৩/৮১

২৬৫. *আল-মাজরুহিন মিনাল মুহাদ্দিসিন*, ২/২৫৩

২৬৬. *মিজানুল ইতিদাল*, ২/৪২৬

২৬৭. *লিসানুল মিজান*, ৩/৩৬০

২৬৮. *মাজমুউল ফাতওয়া*, ২৮/৪৮৩

২৬৯. *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, ৯/৩২৮

২৭০. *আল-ইতিসাম*, ২/১৯৭

২৭১. *আল-মাওয়ায়েজ ওয়াল-ইতিবার*, ২/২৫৬

২৭২. দেখুন, *রিজালুল কাশি*, ১/৩২৪। *আবদুল্লাহ ইবনে সাবা আল-হাকিকাতুল মাজহুলাহ*, ৩০

দৃশ্যমান ফিতনা

কুফায় ষড়যন্ত্র

সাবায়িরা নিজেদের শক্তি সঞ্চয় করে ফেলেছিল। তারা সিদ্ধান্ত নেয়, আর গোপনীয়তা বজায় রাখার দরকার নেই। এখন তারা সরাসরি মাঠে নামবে, যেন তাদের প্রচারণা চালানো আরও সহজ হয়। এই সিদ্ধান্তের ফলে ৩৪ হিজরিতে সাবায়ি চক্র এক নতুন খেলা শুরু করে। এ বছর কুফার গভর্নর সাইদ ইবনুল আস উসমান রা.-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে মদিনা গেলে সাবায়িরা তার বিরুদ্ধে জনগণকে খেপিয়ে তোলে। তাদের কিছু মানুষ সাইদ ইবনুল আসকে অপসারণের দাবি নিয়ে মদিনার উদ্দেশে রওনা হয়। পথে তাদের সাথে দেখা হয় সাইদ ইবনুল আসের। তিনি সে সময় মদিনা থেকে ফিরছিলেন। কুফার দলটি বলে বসে, আল্লাহর কসম, আমাদের হাতে তরবারি থাকা পর্যন্ত সাইদ কুফায় ঢুকতে পারবে না। ফিতনার সম্ভাবনা দেখে সাইদ ইবনুল আস মদিনা ফিরে যান এবং উসমান রা.-কে পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ জানান। হজরত উসমান রা. পরিস্থিতি বিবেচনায় কুফাবাসীর দাবি মেনে নেন। তিনি সাইদ ইবনুল আসের পরিবর্তে আবু মুসা আশআরিকে কুফা পাঠান।[২৭৩]

সাইদ ইবনুল আসের এই অপসারণকে সাবায়িরা নিজেদের সাফল্য হিসেবে গ্রহণ করে। তাদের মনোবলও বেড়ে যায়। বোঝা যাচ্ছিল এ ধরনের ফিতনা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কুফা বেশ উপযুক্ত স্থান। তারা তাদের প্রচারণা চালাতেই থাকে। সম্ভবত তাদের প্রচারণায় প্রভাবিত হয়ে কামিল বিন যিয়াদ নামে এক ব্যক্তি উসমান রা.-কে হত্যার জন্য মদিনায় আসে। সে পোশাকের নিচে খঞ্জর লুকিয়ে রেখেছিল। সে উসমান রা.-এর ওপর হামলা করার আগেই উসমান রা. তার হাবভাব টের পেয়ে যান, এবং তাকে আটকে ফেলেন। লোকজন উপস্থিত হয়ে যায়। কামিল বলতে থাকে, তার কোনো খারাপ উদ্দেশ্য ছিল না। লোকেরা বলে, তাকে তল্লাশি

---

২৭৩. *তারিখুত তবারি*, ৪/৩৩৫

করা হবে। উসমান রা. বলেন, আমি চাই না সে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হোক। এই বলে তিনি তাকে ছেড়ে দেন।[২৭৪]

সাহাবিদের সাথে উসমান রা.-এর পরামর্শ

হজরত উসমান রা. টের পাচ্ছিলেন ফিতনা দানা বাঁধছে। আপাতদৃষ্টে যাকে মনে হচ্ছে ইনসাফ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার দাবি, তা মূলত খিলাফাহর ভিত্তিতে আঘাত করতে যাচ্ছে। তিনি বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি সকল গভর্নরকে মদিনা ডেকে পাঠান। মুসলিমবিশ্বের চলমান অবস্থা নিয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করেন। গভর্নররা জানান, তাদের পেছনে একটি চক্র উঠেপড়ে লেগেছে। তারা প্রশাসকদের বিরুদ্ধে জনগণকে উস্কে দিচ্ছে।

বসরার গভর্নর আবদুল্লাহ ইবনে আমের বলেন, 'জনগণকে জিহাদে ব্যস্ত করে দেওয়া হোক। তাহলে তারা অন্যদিকে মন দেবে না।' সিরিয়ার গভর্নর হজরত মুআবিয়া বললেন, 'আপনি সেনাপ্রধানদের ব্যবহার করুন। প্রত্যেকে নিজের এলাকার লোকদের নিয়ন্ত্রণ করবে। আমি সিরিয়ার দায়িত্ব নিচ্ছি।' মিশরের গভর্নর আবদুল্লাহ ইবনে সাদ বললেন, 'জনগণের পেছনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে তাদের মন জয় করা হোক।' সাইদ ইবনুল আস বললেন, 'যারা জনগণকে উস্কাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক। তাহলে বাকিরাও দমে যাবে।'

উসমান রা. বললেন, 'সমস্যার আশঙ্কা না থাকলে আমি তাই-ই করতাম।'

অর্থাৎ হজরত উসমান রা. কঠোর ব্যবস্থা নিতে চাচ্ছিলেন না। এর কারণ ছিল গোপন কোনো ষড়যন্ত্রে জড়িতদের ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে গেলে শতভাগ নিখুঁত তদন্ত ও বিচারপ্রক্রিয়া চালানো সম্ভব নয়। এতে অনেক সময় অপরাধীদের সাথে নিরপরাধ মানুষরাও ধরা পড়ে। অনেককে সন্দেহ ও অনুমানের ভিত্তিতেও শাস্তি দিতে হয়। এ ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কঠোরতা অনেক সময় দেশে আইনহীনতা জন্ম দেয়। ফলে তিনি কঠোর কোনো ব্যবস্থা নিতে চাচ্ছিলেন না। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আমেরের পরামর্শই গ্রহণ করলেন। সবাইকে আদেশ দিলেন, তারা যেন নিজ নিজ এলাকায় ফিরে গিয়ে জনগণকে জিহাদের প্রস্তুতি নিতে বলে।[২৭৫]
গভর্নররা নিজের এলাকায় ফিরে গেলেন।

---

২৭৪. *তারিখুত তবারি*, ৪/৪০৩। কামিল বিন যিয়াদ পরে তওবা করে নেন। দীর্ঘসময় তিনি আলি রা.-এর সান্নিধ্য অর্জন করেছিলেন। এ সময় তিনি কুফার নেককার মানুষদের অন্তর্ভুক্ত হন। তিনি বেশ কিছু হাদিস বর্ণনা করেছেন, যা *মুসনাদে আহমাদ* ও *মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাতে* এসেছে। ইবনু হিব্বান, ইজলি, ইয়াহইয়া ইবনু মাইন ও ইবনু সাদ তাকে সিকাহ বলেছেন। আরও জানতে দেখুন, *আত-তারিখুল কাবির*, ৭/২৪৩। *তাহজিবুল কামাল*, ২৪/২১৯

২৭৫. *তারিখুত তবারি*, ৪/৩৪১

ইবনে সাবার নতুন চাল

নিজের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করতে ইবনে সাবা যেকোনো কাজ করতে রাজি ছিল। এ ক্ষেত্রে তার সামনে ন্যায়-অন্যায়ের কোনো বাধা ছিল না। সে এবার তার অনুসারীদের মাধ্যমে প্রচুর চিঠি লেখাতে থাকে। এসব চিঠি এক শহর থেকে অন্য শহরের বাসিন্দাদের কাছে পাঠানো হয়। এসব চিঠিতে থাকত বানোয়াট সব জুলুমের বিবরণ ও গভর্নরদের ওপর মিথ্যা অভিযোগের ফিরিস্তি। চিঠিগুলো এমনভাবে সাজানো হতো যে, এর পাঠক পড়ামাত্র বিভ্রান্ত হতো। যেহেতু সে সময় সংবাদ পাওয়ার মাধ্যমই ছিল পত্রযোগাযোগ, তাই এসব পত্র পড়ে প্রত্যেক শহরের লোকেরাই মনে করছিল, তারা ছাড়া অন্য সকল শহরের লোকজন জুলুম-অত্যাচারের শিকার। বাস্তবতা হলো, কোথাও জুলুম হয়নি, কিন্তু সবাই মনে করছিল, তাদের শহরে না হলেও অন্য শহরে ঠিকই জুলুম হচ্ছে। এভাবে সরলপ্রাণ অনেকেও ক্ষোভে ফেটে পড়েন।

এসবই ছিল আবদুল্লাহ ইবনে সাবার নয়া চাল, যার মাধ্যমে সে ক্রমাগত সাফল্য অর্জন করছিল।

মদিনায়ও বিভিন্ন এলাকা থেকে এমন কিছু পত্র আসে যেখানে বলা হয়, বিভিন্ন এলাকার গভর্নররা জুলুম করছেন, এবং নানা অনিয়মে জড়িয়ে গেছেন। মদিনার সম্ভ্রান্তরা এসব চিঠি পড়ে উদ্বিগ্ন হলেন। তারা উসমান রা.-কে বলেন বিষয়টি পরিষ্কার করতে। উসমান রা. সাফ জানিয়ে দেন, সর্বত্র শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করছে। এরপর তিনি সাহাবায়ে কেরামের একটি কমিটি গঠন করে তাদেরকে বিভিন্ন শহরে পাঠান এবং গভর্নরদের ব্যাপারে খোঁজ নেওয়া শুরু করেন। সাহাবিরা প্রত্যেক প্রদেশ সফর করে সেখানকার লোকজনের সাথে কথা বলেন এবং খোঁজখবর নেন। যেহেতু প্রত্যেক শহরের লোকজনই নিজের এলাকা সম্পর্কে সন্তুষ্ট ছিল, তাই দেখা গেল এই কমিটি যেখানেই যায় সেখানেই ইতিবাচক সংবাদ শোনে। শেষে তারা মদিনা ফিরে এসে জানান, আমরা কোনো বিশৃঙ্খলা দেখিনি। কারও ব্যাপারে কোনো অভিযোগ নেই।

গভর্নররা নিজেরাও পৃথকভাবে তদন্ত করছিলেন এসবের সূত্রপাত কোথায়। মিশরের গভর্নর আবদুল্লাহ ইবনু সাদ তদন্তে বেশ কজন ফিতনাবাজ সম্পর্কে জানতে পারেন। তিনি এক পত্রে লেখেন, 'মিশরে এই চক্রান্ত ছড়াচ্ছে আবদুল্লাহ ইবনে সাবা, খালিদ ইবনু মুলজাম, সুদান ইবনু হুমরান, কিনানা ইবনু বশির।'[২৭৬]

---

২৭৬. *তারিখুত তবারি*, ৪/৩৪১

হজরত উসমান রা. সবগুলো তদন্ত রিপোর্টই পেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন আসলে কোনো সমস্যা নেই। যা বলা হচ্ছে তা নির্জলা মিথ্যাচার। তিনি বলে দিলেন, আমার বা আমার কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে যাদের অভিযোগ আছে তারা এ বছর হজের সময় আমার মুখোমুখি হবে। তারা হয় বদলা নেবে, নয়তো মাফ করে দেবে।

উসমান রা.-এর এই ঘোষণা মুসলিমবিশ্বের প্রতিটি শহরে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এই ঘোষণা শুনে নেককার মানুষরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। তারা জানতেন, উসমান রা. নির্দোষ ও ন্যায়পরায়ণ। যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে তার সবই মিথ্যা।

উসমান রা. এ সময় গভর্নরদের কাছে লিখিত এক পত্রে বলেন, 'জনগণের দিকে খেয়াল রাখো। তাদের হক আদায় করো। হ্যাঁ, যদি আল্লাহর হক পদদলিত হয় তাহলে আর চুপ থেকো না।'[২৭৭]

মুআবিয়া রা. দামেশকে বসে পরিস্থিতির ওপর রাখছিলেন সজাগ দৃষ্টি। তার মনে হচ্ছিল সহজেই এই সমস্যার সমাধান হবে না। তিনি উসমান রা.-কে সিরিয়া আসতে বলেন। উসমান রা. এ প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। তিনি বলেন, কোনো অবস্থাতেই আমি নবিজির প্রতিবেশিত্ব ছেড়ে যাব না। আমার গর্দান উড়িয়ে দিলেও না।

হজরত মুআবিয়া বলেন, 'আপনি চাইলে আমি সিরিয়া থেকে সেনাবাহিনী পাঠিয়ে দিই। তারা মদিনায় উপস্থিত থেকে আপনার নিরাপত্তা দেবে।' উসমান রা. বলেন, 'যারা একসময় মুহাজিরদের সাহায্য করেছিল সেই মদিনাবাসীর ওপর আমি সেনাবাহিনীর খাবারদাবার ও রসদের ব্যয়ভার চাপাতে চাই না।' হজরত মুআবিয়া বললেন, 'আমার ভয় হয় আপনার ওপর না জানি আবার কবে হামলা হয় ' উসমান রা. বলেন, 'আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।'

মূলত উসমান রা. চাচ্ছিলেন না মদিনায় সেনাছাউনি নির্মাণ করতে। সেনাছাউনি নির্মিত হলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাধারণ নাগরিকরা পরিণত হয় দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে।[২৭৮] উসমান রা. চাচ্ছিলেন না নবিজির শহরে সেনাছাউনি নির্মাণ করে শহরকে কোলাহলমুখর করে তুলতে। তিনি চাচ্ছিলেন এর স্নিগ্ধ ও শান্ত ভাবটি বজায় রাখতে।

---

২৭৭. প্রাগুক্ত, ৪/৩৪৩।

২৭৮. যেমন আব্বাসি খলিফা মুতাসিমের শাসনকালে বাগদাদে সেনাছাউনি নির্মাণের ফলে সেখানকার নাগরিকদের বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়। পরে খলিফা মুতাসিম সেনাছাউনি সরিয়ে নেন সামাররা শহরে।

৩৫ হিজরির সূচনা—সাবায়ি চক্রান্তের নতুন মোড়

৩৫ হিজরির শুরু হলে সাবায়িরা নতুন কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করে, যা কার্যকর হলে খেলাফতকাঠামো পুরোই ভেঙে পড়বে। এ সময় তারা চারটি স্তরে পরিকল্পনাবিন্যাস করে। এই চারটি স্তর ছিল—

১। বনু হাশিমের প্রতি আকৃষ্ট অঞ্চলগুলোয় (ইরাক, মিশর) হজরত উসমানবিরোধী প্রচারণা জোরদার করা হবে। একইসাথে আলি, তালহা ও যুবাইর এই তিন সাহাবিকে খেলাফতের দাবিদার বানিয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে মাঠে নামিয়ে দিতে হবে। উসমান রা.-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হবে, একইসাথে অপর তিন শীর্ষ সাহাবি আলি, তালহা ও যুবাইরকেও কলঙ্কিত করা হবে।

২। এটা সম্ভব না হলে উসমান রা.-কে জোরপূর্বক ইস্তফা দিতে বাধ্য করা হবে। তিনি ইস্তফা দিলে খেলাফতের মসনদ খালি হয়ে যাবে। এই ফাঁকে গৃহযুদ্ধ বাধানোর চেষ্টা করতে হবে।

৩। যদি উসমান রা. ইস্তফা না দেন, তাহলে তাকে হত্যা করে এর দায় আলি, তালহা, যুবাইর ও অন্য শীর্ষ সাহাবিদের ওপর চাপিয়ে দিতে হবে। আনসার ও মুহাজির দুই পক্ষকে পরস্পরের বিরুদ্ধে খেপিয়ে দিতে হবে, যেন দুপক্ষের শক্তিই শেষ হয়ে যায়।

৪। যদি আনসার ও মুহাজিরদের পরস্পরের বিরুদ্ধে নামানো সম্ভব না হয়, তাহলে প্রচার করা হবে বর্তমান খলিফা আগের খলিফাকে হত্যা করেছে। এভাবে মিথ্যা প্রচার চালানো হবে, যেন আগের খলিফার অনুসারীরা বর্তমান খলিফাকে মেনে না নেয়, এবং সবসময় রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজ করে।

মদিনায় সাবায়ি দল

ফিতনার আগুন আরও তীব্র করে তুলতে সাবায়িরা সিদ্ধান্ত নেয়, অভিযোগ ও অপবাদের ফিরিস্তি নিয়ে তাদের প্রতিনিধিদল মদিনায় যাবে। সেখানে জনগণের মাঝে তারা উসমান রা.-এর নামে বানোয়াট বিভিন্ন অভিযোগ তুলবে, এবং জনগণের মন বিষিয়ে তোলার চেষ্টা করবে। এরপর মদিনা থেকে ফিরে তারা প্রচার করবে উসমান রা. নিজের সব অপরাধ স্বীকার করেছেন, কিন্তু তিনি নিজের এসব অপরাধ ত্যাগ করতে রাজি হননি। এভাবে সর্বত্র খলিফার বিরুদ্ধে জনগণকে উত্তেজিত করা হবে।

এই পরিকল্পনা নিয়ে ৩৫ হিজরির রজব মাসে সাবায়িদের একটি দল মিশর থেকে মদিনার উদ্দেশে যাত্রা করে। গভর্নর আবদুল্লাহ ইবনে সাদ এদের পরিকল্পনা

সম্পর্কে জেনে ফেলেন। তিনি উসমান রা.-কে একটি বার্তা পাঠান, যেখানে লেখা ছিল, এই লোকগুলো আপনাকে পদচ্যুত করার পরিকল্পনা করছে।[২৭৯]

মদিনার সাহাবিদের অনেকেও জানতেন এই সাবায়ি দলটি সম্পর্কে। তারা মদিনায় পৌঁছলে সাহাবিরা পরামর্শ দেন, দেশদ্রোহিতার অভিযোগে এদের হত্যা করতে। কিন্তু উসমান রা. এতে রাজি হননি। বরং তিনি মসজিদে নববিতে সবার সামনে এই দলকে কথা বলার সুযোগ করে দেন। মূলত তিনি নিজেকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করান যেখানে সাবায়িরা তার সম্পর্কে যেকোনো অভিযোগ প্রকাশ্যে তোলার সুযোগ পায়।[২৮০]

মসজিদে নববিতে সাবায়ি দলের সাথে দেখা করেন উসমান রা.। তিনি নিজের সামনে একটি কুরআন শরিফ রেখে ঠান্ডা মাথায় সাবায়িদের সব অভিযোগ শোনেন। তারপর তিনি একটি একটি করে সাবায়িদের অভিযোগের জবাব দেন। সাবায়িরা তাঁর প্রতিটি কথার জবাবে বিদ্রুপ করে বলছিল, 'আল্লাহ কি আপনাকে অনুমতি দিয়েছিলেন না আপনি আল্লাহর নামে মিথ্যা বলছেন?' উসমান রা. এসব বিদ্রুপে কর্ণপাত না করে ভদ্রভাবে জবাব দিচ্ছিলেন। নিজের কথা শেষ হলে তিনি বলছিলেন, 'তোমাদের আর কিছু বলার থাকলে বলো।'

এই সভায় বিভিন্ন শহরের আরও কিছু লোকজন উপস্থিত ছিল। সবাইকে উন্মুক্ত স্বাধীনতা দেওয়া হয়, ফলে যে যা ইচ্ছা প্রশ্ন করার সুযোগ পায়। উসমান রা. শান্তভাবে সকল প্রশ্নের জবাব দেন। এই সভায় যেসব অভিযোগ তোলা হয় তার মধ্যে বড় কয়েকটি অভিযোগ ও তার জবাবে উসমান রা.-এর বক্তব্য দেখা যাক।

অভিযোগ ১ – আপনি বাকি নামক এলাকার চারণভূমি নিজের জন্য দখলে নিয়ে অন্যদের জন্য সে এলাকা নিষিদ্ধ করেছেন।

উসমান রা. – **আল্লাহর কসম, আমি এই ধারা শুরু করিনি। এটা আগ থেকেই এভাবে চলে আসছে। আমার আগে হজরত উমর সদকার উটের জন্য খাস চারণভূমি নির্ধারণ করেছেন। আমি খেলাফতের দায়িত্ব হাতে পেলে দেখি সদকার উটের সংখ্যা বেড়ে গেছে, তাই চারণভূমির সীমানা বৃদ্ধি করি।**[২৮১]

---

২৭৯. *তারিখুত তবারি*, ৪/৩৫৭

২৮০. প্রাগুক্ত, ৪/৩৪৫

২৮১. *তারিখু খলিফা ইবনি খইয়াত*, ১০৮। এ সময় উসমান রা. নিজের গবাদি পশু সম্পর্কেও বলেন। তিনি বলেন, 'খেলাফত লাভের আগে আমার চেয়ে বেশি গবাদি পশুর মালিক কেউ ছিল না। এখন আমার কাছে শুধু একটি বকরি ও হজ্জে যাওয়ার জন্য দুটি উট আছে। (বাকি সব সদকা ও উপহার হিসেবে খরচ হয়ে গেছে।)' *তারিখুত তবারি*, ৪/৩৪৭

অভিযোগ ২ – কুরআন কারিমের বেশ কয়েকটি অনুলিপি ছিল। আপনি সবগুলো নষ্ট করে শুধু একটি কপি প্রচার করেছেন।

উসমান রা. – কুরআন তো একটিই। আমি যে কাজ করেছি তাতে সাহাবিদের সবার সম্মতি ছিল।[২৮২] হুজাইফার কথায় আমি এই কাজে উৎসাহী হয়েছি। কারণ এমনটা না করলে কুরআনের পাঠ বিভিন্ন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল, যেমনটা ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ক্ষেত্রে হয়েছে।[২৮৩]

অভিযোগ ৩ – আপনি হজের সময় মিনায় জোহর, আসর ও ইশা চার রাকাত করে পড়েন। অথচ নবিজি ও প্রথম দুই খলিফা সেখানে দুরাকাত পড়তেন।

উসমান রা. – মক্কায় আমার পরিবার রয়েছে। তাই সেখানে আমি মুকিম হিসেবে পুরো নামাজ পড়ি।[২৮৪]

অভিযোগ ৪ – আপনি বড় সাহাবিদের সরিয়ে সেখানে তরুণদের বসিয়েছেন। আপনার মূর্খ কুরাইশি আত্মীয়দের গভর্নর বানিয়েছেন।

উসমান রা. – আমি শুধু যোগ্যদেরই দায়িত্ব দিয়েছি। তাদের চরিত্র ও যোগ্যতা সম্পর্কে স্থানীয়দের জিজ্ঞাসা করলেই হয়। তা ছাড়া যুবকদেরকে নবিজিও দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তিনি কি উসামা বিন যায়দকে দায়িত্ব দেননি?

উপস্থিত সবাই বলে ওঠে, অবশ্যই। এরা তো এমন সব অভিযোগ করছে, যা প্রমাণ করতেই এরা অক্ষম।[২৮৫]

উসমান রা. বলেন, তোমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেক শহরের একজন আমাকে বলো, তোমরা কাকে গভর্নর হিসেবে চাও। আমি তাকেই গভর্নর বানাব। যাকে অপছন্দ করো তাকে বরখাস্ত করব।

এই কথা শুনে বসরার লোকজন বলে, আমরা আবদুল্লাহ ইবনে আমেরের ওপরই সন্তুষ্ট।

শামবাসী বলে, আমরা মুআবিয়ার ওপর সন্তুষ্ট। মিশরবাসী বলে, আমাদের বর্তমান গভর্নরকে সরিয়ে আমর ইবনুল আসকে দায়িত্ব দেওয়া হোক।[২৮৬]

---

২৮২. *তারিখুত তবারি*, ৪/৩৪৬
২৮৩. *তারিখুল মাদিনা*, ৩/১১৪
২৮৪. *তারিখুত তবারি*, ৪/৩৪৬
২৮৫. *প্রাগুক্ত*, ৪/৩৪৭
২৮৬. *তারিখুল মদিনা*, ৩/১১১৪

অভিযোগ ৫ – আপনি আপনার আত্মীয়দের বেশি ভালোবাসেন এবং তাদের উপহার দেন।

উসমান রা. – আমি আত্মীয়দের অবশ্যই ভালোবাসি, কিন্তু তাই বলে অন্যদের ওপর জুলুম করি না। আত্মীয়দেরকে আমি উপহার দিই নিজের অর্থে, বাইতুল মালের অর্থে নয়। আগের দুই খলিফার যুগেও আমি নিজের অর্থে আত্মীয়দের উপহার দিয়েছি। যৌবনে আমার এই অবস্থা ছিল, তাহলে এখন কেন কৃপণতা করব।[২৮৭]

এমন আরও কিছু অভিযোগ তোলা হয়, উসমান রা. প্রতিটি অভিযোগেরই সন্তোষজনক জবাব দেন। যদি সাধারণ কোনো অভিযোগকারী হতো, তাহলে তারা উসমান রা.-এর জবাব শুনেই সন্তুষ্ট হয়ে যেত। কিন্তু সাবায়িরা তো সাধারণ কেউ ছিল না। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল উসমান রা.-কে অপসারণ করে খিলাফাহকে প্রশ্নবিদ্ধ করা। অভিযোগগুলো ছিল তাদের বাহ্যিক হাতিয়ার মাত্র। তাই তারা মদিনা থেকে ফিরে মিথ্যাচার শুরু করে। তারা বলতে থাকে, উসমান রা. ভরা মজলিসে নিজের অপরাধ স্বীকার করেছেন। তার উচিত ছিল সাথে সাথে পদত্যাগ করা, কিন্তু তিনি পদত্যাগ দূরে, তওবাও করছেন না।

সাবায়িরা জনতাকে উস্কে দিতে বলে, 'উসমান রা. বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। এখন আর তিনি শাসন চালাতে সক্ষম নন। তাই এখন তার থেকে ক্ষমতা কেড়ে যোগ্য কাউকে দেওয়াই ভালো হবে।'[২৮৮]

জাল চিঠি

সাবায়িরা পুরোদমে মাঠে নেমে পড়েছিল। এবার তারা নতুন ফন্দি আঁটে। তারা উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রা. ও বিশিষ্ট সাহাবি আলি, তালহা ও জুবাইরের নামে কিছু চিঠি তৈরি করে কুফা, বসরা ও মিশরে পাঠায়। এসব চিঠিতে এই সাহাবিদের পক্ষ হয়ে বলা হয়েছিল, 'যদি সাধারণ জনতা জিহাদ করতে আগ্রহী হয় তাহলে তারা যেন মদিনায় উপস্থিত হয় এবং বিদ্রোহ করে সরকারপতনে তাদের সাহায্য করে।'[২৮৯]

মূলত সাহাবিদের সাথে এই পত্রের কোনো সম্পর্কই ছিল না। পুরোটিই ছিল সাবায়িদের সাজানো। কিন্তু সাধারণ মানুষের অনেকে এই চিঠি দেখে সত্য মনে করতে থাকে। কুফা, বসরা ও মিশরে একটি বড় দল মদিনা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত

---

২৮৭. *তারিখুত তবারি*, ৪/৩৪৭
২৮৮. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ১০/২৭৫
২৮৯. প্রাগুক্ত, ১০/২৭৭

হয়ে পড়ে। তবে সাধারণ সদস্যরা পুরো পরিকল্পনা জানত না। তারা শুধু জানত, তারা মদিনা যাবে এবং সাহাবিদেরকে বিদ্রোহে সাহায্য করবে। সাবায়িদের মূল পরিকল্পনা সম্পর্কে তাদেরকে অন্ধকারে রাখা হয়েছিল। অপরদিকে সাবায়িদের কেন্দ্রীয় নেতাদের সামনে পরিপূর্ণ পরিকল্পনা ছিল। তাদের পরিকল্পনা ছিল, হাজিদের বেশে যাত্রা শুরু হবে। মদিনায় পৌঁছে উসমান রা.-এর বাড়ি ঘেরাও করে তাকে বরখাস্ত করা হবে। তিনি রাজি না হলে তাকে হত্যা করা হবে।[২৯০]

সাবায়িরা জানত, তাদের সাথে যে জনতা একত্র হয়েছে, তাদের সবার মনোভাব একরকম নয়। তাই তারা সিদ্ধান্ত নেয়, প্রত্যেককে তার রুচিমতো বুঝ দিয়ে সন্তুষ্ট করা হবে। বসরার বিদ্রোহীদের কাছে জনপ্রিয় ছিলেন তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ। তাই তাদেরকে বোঝানো হয় উসমান রা.-কে সরিয়ে তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহকে ক্ষমতায় বসানো হবে। কুফায় জনপ্রিয় ছিলেন যুবাইর ইবনুল আওওয়াম। তাদেরকে বলা হয়, উসমান রা.-এর পর যুবাইর ইবনুল আওওয়াম দায়িত্ব পাবেন। মিশরে জনপ্রিয় ছিলেন আলি রা.। তাদের বলা হয়, তারা যেন আলি রা.-এর হাতে বাইআত হয়ে যায়।[২৯১]

৩৫ হিজরির শাওয়াল মাসে বিদ্রোহীদের দল বসরা, কুফা ও মিশর থেকে মদিনার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে। প্রতিটি দলে সদস্যসংখ্যা ছিল ১ হাজার। তাদের এই পরিকল্পনা সম্পর্কে অনেকে কিছুটা আভাস পেয়েছিলেন। সাহাবি হুজাইফা কুফায় অবস্থান করছিলেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, 'উসমান রা.-এর বিরুদ্ধে এদের এই তৎপরতার পরিণতি কী হবে?' তিনি বলেন, 'আল্লাহর কসম, এরা তাকে শহিদ করে দেবে। তারপর তিনি জান্নাতের অধিকারী হবেন। আল্লাহর কসম, তার হত্যাকারী হবে জাহান্নামি।'[২৯২]

সাবায়িদের গ্রুপ মদিনার উদ্দেশে পথ চলতে থাকে। সে সময় মদিনায় জোরদার কোনো নিরাপত্তাব্যবস্থা ছিল না। এখানে কোনো বড় সেনাবাহিনীও ছিল না। মূলত এর কোনো প্রয়োজনও ছিল না। কারণ মদিনার চারদিকেই মুসলিম অধ্যুষিত জনপদ। বহুদূর পর্যন্ত কুফরের কোনো ছায়াও ছিল না। ফলে এখানে হামলার কোনো আশঙ্কাই ছিল না। সাবায়িরা বিষয়টি ভালোভাবেই জানত, ফলে তারা আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। তারা জানত তাদের বাধা দিতে এখানে কোনো প্রতিরক্ষাবাহিনী নেই।

২৯০. *তারিখুত তবারি*, ৩/৩৪৬
২৯১. প্রাগুক্ত, ৪/৩৫০
২৯২. *মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা*, ৩৭৬৬

শাওয়াল মাসের শেষদিকে মদিনা থেকে ৭৭ কিলোমিটার দূরে সাবায়িদের তিনটি দল একত্র হয়। সিদ্ধান্ত হয়, নেতৃত্বস্থানীয়রা মদিনায় প্রবেশ করবে, বাকিরা এখানেই অবস্থান করবে। মূলত সাধারণ সদস্যদের তো জানানো হয়েছিল, মদিনায় সাহাবিরাই উসমান রা.-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে যাচ্ছেন। মদিনার অবস্থা বেশ খারাপ। এখন তারা যদি মদিনায় প্রবেশ করে তাহলে তো বুঝে ফেলবে মদিনার অবস্থা স্বাভাবিকই আছে। এজন্য চক্রান্তকারীরা চাচ্ছিল সাধারণদের থেকে বিষয়টি পরিপূর্ণ গোপন রাখতে, যাতে যেকোনো সময় উত্তেজিত করে তাদের মাঠে নামানো সহজ হয়।

নির্বাচিত চক্রান্তকারীরা সামনে এগিয়ে শিবির স্থাপন করে। মিশরের লোকেরা জুল মাররা উপত্যকায়, বসরার কাফেলা জু খাশাব উপত্যকায়, এবং কুফার লোকেরা আওয়াস উপত্যকায় ছাউনি ফেলে। এবার তাদের কজন মদিনায় প্রবেশ করে শীর্ষ সাহাবিদের সাথে সাক্ষাৎ করে। আলাপ শেষে তারা বুঝতে পারে, সাহাবিদের সবাই তাদেরকে সন্দেহ করছেন। তারা বুঝতে পারে, সাহাবিদের কাছে উসমান রা.-কে বরখাস্তের প্রস্তাব দিয়ে লাভ হবে না। তাই তারা বলে, আমরা কয়েকজন গভর্নরকে বরখাস্তের দাবি নিয়ে এসেছি।

সাহাবায়ে কেরাম সাবায়িদের চক্রান্ত অনুমান করতে পেরেছিলেন। তাই তারা সাবায়িদের এই প্রস্তাবে সায় দেননি, তাদেরকে কোনো সাহায্যও করেননি।[২৯৩]

সাহাবিরা যদিও সাবায়িদের কোনো প্রস্তাবে সম্মত হননি, কিংবা তাদের সাহায্য করেননি, কিন্তু তারা বুঝতে পারছিলেন উসমান রা.-এর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। সাহাবিরা উসমান রা.-এর নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। তাই তারা দলে দলে ভাগ হয়ে মদিনার বাইরে দাঁড়িয়ে যান, যেন অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো বহিরাগত মদিনায় প্রবেশ করতে না পারে। একই সময়ে উসমান রা.-ও মুহাম্মদ ইবনু মাসলামাকে ৫০ জন সেনা দিয়ে জু খাশাব উপত্যকায় প্রেরণ করেন যেন বিদ্রোহীরা মদিনায় প্রবেশ করতে না পারে। অপরদিকে আলি, যুবাইর ও তালহা রা. নিজেদের সন্তানদের আদেশ দেন তারা যেন উসমান রা.-এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।[২৯৪]

সাহাবিদের সাথে বিদ্রোহীদের দ্বিতীয় সাক্ষাৎ

হজরত আলি রা. লোকজন নিয়ে মদিনার বাইরে অবস্থান করছিলেন। তার মূল উদ্দেশ্য ছিল বিদ্রোহীরা মদিনায় প্রবেশ করতে চাইলে তাদের ঠেকিয়ে দেওয়া।

---

২৯৩. *তারিখুত তবারি*, ৪/৩৫০
২৯৪. প্রাগুক্ত, ৪/৩৫০

মিশরীয় বিদ্রোহীদের নেতা আলি রা.-এর সাথে সাক্ষাৎ করে। সে তাকে খলিফা হওয়ার প্রস্তাব দেয়। হজরত আলি রা. তখনই তাদের তাড়িয়ে দেন। তিনি স্পষ্ট বলেন, জু খাশাব ও জু মাররা এলাকায় অবস্থানরত ভ্রষ্টদের ওপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিশাপ দিয়েছেন।

একই প্রস্তাব নিয়ে বসরার নেতা দেখা করে তালহা বিন উবাইদুল্লাহর সাথে। তাকেও দেওয়া হয় খলিফা হওয়ার প্রস্তাব। তিনিও প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। কুফার লোকেরা যায় হজরত যুবাইরের কাছে। তিনিও তাদের তাড়িয়ে দেন।[২৯৫]

সাহাবিদের কেউই এদের পাতা ফাঁদে পা দেননি। এভাবে সাবায়িদের উম্মতকে তিন টুকরো করার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয় এবং তাদের সুরও কিছুটা নরম হয়ে আসে। সাধারণ মানুষদের কেউ কেউ কিছুটা সতর্ক হয়ে ওঠে। উসমান রা. এ সময় তাদের সাথে আলোচনার জন্য আলি রা.-কে পাঠান। আলি রা. তাদের কাছে এসে বলেন, 'আল্লাহর কিতাবের ফয়সালা অনুযায়ী তোমাদের অধিকার পূরণ করা হবে।'

সাধারণ মানুষের অনেকে এই কথা শুনে বেশ প্রভাবিত হয়। তারা বলাবলি করে, 'নবিজির চাচাতো ভাই ও আমিরুল মুমিনিনের প্রতিনিধি কুরআনের কথাই বলছেন, তার কথা মেনে নেওয়া উচিত।'[২৯৬]

এমনকি উসমান রা. নিজেও মদিনার বাইরে এসে তাদের সাথে দেখা করেন। তাদের সকল প্রশ্নের জবাব দেন।[২৯৭] বিদ্রোহীরা এবার হজরত উসমান রা.-এর অপসারণের দাবি বদলে গভর্নরদের অপসারণের দাবি তোলে। উসমান রা. বলেন, 'তোমরা যাকে চাও তাকেই আমি নিয়োগ দেবো।[২৯৮] তবে তোমরা ওয়াদা করবে, কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে না। ঐক্য বজায় রাখবে।' বিদ্রোহীদের বড় অংশ আনন্দের সাথে এ প্রস্তাব মেনে নেয়।[২৯৯] এ সময় মিশরের লোকেদের দাবিমতো মুহাম্মদ বিন আবু বকরকে মিশরের গভর্নর নিয়োগ দেওয়া হয়।[৩০০] এই চুক্তি ৩৫ হিজরির পহেলা জিলকদ অনুষ্ঠিত হয়।[৩০১]

চুক্তির সংবাদ ছড়িয়ে গেল মুসলিমবিশ্বের সর্বত্র। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন চিন্তাশীলরা। **আপাতত সমস্যার সমাধান হয়েছে ভেবে আনন্দিত হলেন** অনেকে। বিদ্রোহের

---

২৯৫. *প্রাগুক্ত*
২৯৬. *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, ৩৯/৩২৮
২৯৭. *তারিখু খলিফা ইবনি খইয়াত*, ১৬৯
২৯৮. *মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা*, ৩৭৬৯১
২৯৯. *তারিখু খলিফা ইবনি খইয়াত*, ১৬৯
৩০০. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ১০/২৮১
৩০১. *তারিখু খলিফা ইবনি খইয়াত*, ১৬৮

আগুনও নিভে যায়, বেশিরভাগ লোকজন সন্তুষ্টচিত্তে নিজেদের এলাকায় ফিরে যায়। তবে বিদ্রোহের দুই কুশীলব মালিক বিন আশতার ও হুকাইম ইবনু জাবাল্লা কোনো অজ্ঞাত কারণে মদিনা থেকে যায়।

সাবায়িদের নতুন চাল—ভুয়া চিঠি ও পুনরায় হামলা

সবগুলো বিবরণ সামনে রাখলে এটা স্পষ্ট, উসমান রা.-এর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগই প্রমাণিত হয়নি। বরং প্রতিবার তিনি এসব অভিযোগের জবাব দিয়ে মানুষকে শান্ত করেছিলেন। যদি এসব অভিযোগ জনগণের স্বাভাবিক কৌতূহল হতো, তাহলে ৩৫ হিজরির চুক্তির পর অন্তত তা শেষ হয়ে যেত। এরপর বিদ্রোহ বা সমালোচনার আর কোনো কারণই ছিল না। কিন্তু সাবায়ি চক্র তো সমাধান চাচ্ছিল না। তারা চাচ্ছিল ফিতনা ও নৈরাজ্য। চাচ্ছিল ক্ষমতার পালাবদল। তাই তারা যেকোনো উপায়ে বিদ্রোহের আগুন লাগানোর সিদ্ধান্ত নিয়েই রেখেছিল।[৩০২]

সাবায়ি চক্র এবার নতুন চাল চালল। এবারও তারা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করল ভুয়া চিঠি। ঘটনাটা খুলে বলা যাক।

মিশরীয় বিদ্রোহীদের দল সন্তুষ্টচিত্তে মদিনা থেকে মিশরের পথ ধরে। কিছুদূর অতিক্রম করার পর তাদের চোখে পড়ে একজন ব্যক্তিকে। সে একবার কাছে আসছে আবার দূরে পালিয়ে যাচ্ছে। এভাবে কয়েকবার করার পর সবার সন্দেহ হলো। বিদ্রোহীরা লোকটিকে আটকে ফেলে। তাকে পরিচয় জিজ্ঞেস করা হলে সে বলে, 'আমি আমিরুল মুমিনিন উসমান রা.-এর পক্ষ থেকে মিশরের গভর্নরের কাছে বার্তা নিয়ে যাচ্ছি।'

তাকে তল্লাশি করে একটি চিঠি পাওয়া গেল। চিঠিতে মিশরের গভর্নরকে আদেশ দেওয়া ছিল, মিশরীয় বিদ্রোহীদের এই দল মিশরে পৌঁছলে তাদের সবাইকে যেন হত্যা করা হয়। এই পত্র বিদ্রোহীদের মাথায় আগুন ধরিয়ে দেয়। তারা চিৎকার করে তাকবির দিতে দিতে মদিনা ফিরে আসে। এবার তারা সবাই একত্রে মদিনা প্রবেশ করে। তাদের গতি দেখে মদিনার লোকজন চমকে যায়। একই সময় কুফা ও বসরার বিদ্রোহীরাও ফিরে আসে, তারাও এই পত্রের কথা জেনে গিয়েছিল। তারা শহরের সবগুলো রাস্তা দখল করে ফেলে এবং শহরের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে তুলে নেয়। কয়েকজন বিদ্রোহী আলি রা.-এর সাথে দেখা করে বলে, 'আপনি আমাদের পক্ষ হয়ে উসমানের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যান।' আলি রা. বলেন, 'আল্লাহর কসম, আমি কখনোই তোমাদের সাথে হাত মেলাব না।'

---

৩০২. *তারিখুত তবারি*, ৪/৩৫০

বিদ্রোহীরা এবার খেপে বলে, 'তাহলে আপনি কেন আমাদেরকে বিদ্রোহের আহ্বান জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন?' আলি রা. বললেন, 'আমি এমন কোনো চিঠিই লিখিনি।' বিদ্রোহীরা এবার কিছুটা চমকে যায়। মূলত এই চিঠিগুলো যে জাল ছিল তা তাদের জানা ছিল না। তারা কিছুটা দ্বিধায় পড়ে যায়। অন্য সাহাবিরাও বিদ্রোহীদের এমন জবাব দেন। যুবাইর রা. বলেন, 'তোমাদের প্রতিটি কাফেলা ছিল ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় ও দূরত্বে। তাহলে সবাই এখন একসাথে ফিরলে কী করে? সম্ভবত তোমাদের মাঝে কোনো চক্রান্ত কাজ করছে।'[৩০৩]

কোনো জবাব খুঁজে না পেয়ে বিদ্রোহীরা উসমান রা.-এর সাথে সাক্ষাৎ করে। তারা প্রশ্ন করে, 'আপনি আমাদের বিরুদ্ধে এই চিঠি লিখলেন কেন?' উসমান রা. ফিকহের নীতি[৩০৪] অনুসারে বলে দেন, 'চিঠি যে আমিই লিখেছি এই দাবির পক্ষে দুজন সাক্ষী নিয়ে এসো, অথবা আমার কাছ থেকে কসম গ্রহণ করো। আমি বলছি, আমি এই চিঠি লিখিনি, কাউকে দিয়ে লেখাইওনি। আমি কিছুই জানি না এ বিষয়ে। সিলমোহর তো ভুয়াও হতে পারে।'

বিদ্রোহীরা কোনো সাক্ষী উপস্থিত করতে পারেনি আবার তারা কসম নিতেও রাজি হয়নি। বরং তারা গোঁয়ারের মতো বলতে থাকে, 'আপনি খেলাফতের দায়িত্ব লঙ্ঘন করেছেন।'[৩০৫]

বিদ্রোহীরা বলে, 'চিঠি আপনি না লিখলে এই কাজ মারওয়ান ইবনুল হাকাম করেছে। তাকে আমাদের হাতে তুলে দেওয়া হোক।' মুহাম্মদ ইবনু মাসলামাও এই মত সমর্থন করেন। কিন্তু উসমান রা. ভয় করছিলেন, মারওয়ানকে বিদ্রোহীদের হাতে তুলে দিলে তারা তাকে হত্যা করবে। তিনি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

মূলত মারওয়ান এই চিঠি লিখেছে বলেও বিদ্রোহীদের কাছে কোনো প্রমাণ ছিল না। তারা নিছক অনুমান করছিল, কারণ মারওয়ান ছিলেন উসমান রা.-এর সকল চিঠিপত্র ও হিসাবকিতাবের লেখক। সরকারি সিলমোহর তার অধীনে ছিল। বাস্তবতা হলো মারওয়ান এই কাজ করেনি।[৩০৬] বরং এই কাজ করেছে মদিনায় থেকে যাওয়া সাবায়ি নেতা হুকাইম ইবনু জাবালা। এই এক চিঠির মাধ্যমে সে নিভে যাওয়া ফিতনাতে আবার ইন্ধন দেয়।

---

৩০৩. *তারিখুত তবারি*, ৪/৩৫১

৩০৪. ইসলামি ফিকহের প্রসিদ্ধ মূলনীতি হলো, البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ বাদী তার দাবির পক্ষে দলিল দেবে, সে দলিল দিতে ব্যর্থ হলে বিবাদী নিজের নির্দোষিতা বলে কসম করবে।

৩০৫. *তারিখু খলিফা ইবনি খইয়াত*, ১৬৯

৩০৬. এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন, *তারিখে উম্মতে মুসলিমাহ*, ২য় খণ্ড।

বিদ্রোহীরা তাদের দাবিতে অটল থাকে, উসমান রা.-ও নিজের অবস্থান ধরে রাখেন। বিদ্রোহীরা মদিনায় অবস্থান করতে থাকে। সাধারণ লোকজন নিজেদের ঘরের দরজা আটকে ভেতরে অবস্থান করতে থাকেন। তবে উসমান রা. তখনও মসজিদে নববিতে নিয়মিত জুমা পড়াচ্ছিলেন। একদিন তিনি মিম্বরে দাঁড়ালে বিদ্রোহীরা তার ওপর কঙ্কর নিক্ষেপ করে। তিনি মারাত্মক আহত হন এবং জ্ঞান হারান। সাহাবিরা তাকে ঘরে নিয়ে আসেন। সাহাবিদের অনেকে তাকে দেখতে যান, এবং এই ঘটনার জন্য দুঃখপ্রকাশ করেন।[৩০৭]

উসমান রা.-এর গৃহ অবরোধ

উসমান রা.-কে আঘাত করার মাধ্যমে বিদ্রোহীদের সাহস বেড়ে যায়। তারা উসমান রা.-কে মসজিদে নববিতে নামাজ পড়াতেও বাধা দেয়। কয়েকদিন পর তারা উসমান রা.-এর গৃহ অবরোধ করে। তাদের মুখে ছিল একটাই দাবি, উসমান রা.-কে ইস্তফা দিতে হবে। অপরদিকে উসমান রা.-এর কথা ছিল, 'আল্লাহ আমাকে যে পোশাক পড়িয়েছেন তা আমি নিজ থেকে কখনো খুলব না। কারণ নবিজি আমাকে গুরুত্বসহকারে অসিয়ত করেছিলেন, হে উসমান, যদি আল্লাহ কখনো তোমাকে এই দায়িত্ব দান করেন, এবং মুনাফিকরা চায় আল্লাহ যে পোশাক পরিয়েছেন তা তারা খুলে নেবে, তাহলে তুমি নিজে সেটা খুলে ফেলো না।'[৩০৮]

সাবায়িদের নেতা আশতার নাখয়ি উসমান রা.-এর সাথে দেখা করে দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার জন্য চাপ দেয়। তিনি বলেন, 'আমি কোনো পরোয়া করি না। আমার শরীর থেকে মাথা কেটে নিলেও না। মুসলিম উম্মাহকে আমি কোনো অবস্থাতেই এমন জায়গায় রেখে যাব না যেখানে একে অপরের খুনের পিপাসায় মেতে উঠবে।'

নিজের দাবি আদায় করতে না পেরে যুদ্ধের হুমকি দিতে থাকে আশতার নাখয়ি। উসমান রা. শান্তস্বরে বলেন, 'এমন হলে আর কোনোদিন আন্তরিকতা জন্ম নেবে না। এক কাতারে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে পারবে না। যুদ্ধের ময়দানে একসাথে লড়াই করতে পারবে না।'[৩০৯]

বিদ্রোহীদের দাবি মানা হলো না কেন

প্রশ্ন ওঠে এত নাজুক অবস্থাতেও কেন উসমান রা. নিজের মতেই অটল থাকলেন। কেন তিনি বিদ্রোহীদের দাবি মেনে নিলেন না। প্রথমত, নবিজি স্পষ্টভাবেই

---

৩০৭. *তারিখুত তবারি*, ৪/৩৫৩

৩০৮. *তিরমিযি*, ৩৭০৫। হাদিসের সনদ সহিহ। গুরুত্ব বোঝানোর জন্য নবিজি এই কথা তিনবার বলেছিলেন।

৩০৯. *তারিখুত তবারি*, ৪/৩৭১

উসমান রা.-কে মুনাফিকদের দাবি মেনে নিতে নিষেধ করে গিয়েছিলেন। ফলে উসমান রা.-এর জন্য নবিজির এই অসিয়ত মেনে নেওয়ার বিকল্প ছিল না। দ্বিতীয়ত, বিদ্রোহীদের কোনো দাবিই ন্যায্য ছিল না। তারা অভিযোগ করছিল, কিন্তু কোনো প্রমাণ দিতে পারছিল না। তাদেরকে বারবার প্রমাণ দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়, কিন্তু তারা কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেনি। সুতরাং তাদের দাবিতে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার মানে হলো ন্যায্য অধিকার ছেড়ে দেওয়া। এর ফলে কিয়ামত পর্যন্ত ফিতনাবাজদের সামনে একটি সুযোগ খুলে যেত। যখনই কোনো ন্যায়পরায়ণ শাসকের বিরুদ্ধে তারা মিথ্যা অভিযোগ এনে পদত্যাগ করতে বলত, তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হতেন। পদত্যাগ না করলে তার সামনে উসমান রা.-এর দলিল দেওয়া হতো। এই বাস্তবতা জেনেই আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-ও উসমান রা.-কে পদত্যাগ করতে নিষেধ করেন। তিনি বলেন, 'খেলাফতের দাবি ছেড়ে দিলেও কি আপনি অনন্তকাল বেঁচে থাকবেন? আল্লাহ আপনাকে যে রাজপোশাক পরিয়েছেন তা খুলে ফেলার কোনো সুযোগ আমি দেখি না। আপনি যদি এ কাজ করেন তাহলে নিয়ম দাঁড়িয়ে যাবে, যখনই কোনো জাতি নিজেদের শাসককে পছন্দ করবে না, তখনই তাকে পদচ্যুত করবে।'[৩১০]

তবে অনেকে আশা করছিলেন, উসমান রা. বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবেন। উসমান রা. বলে দেন, 'নবিজি আমার থেকে একটি অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। সুতরাং আমি ওয়াদা পূরণের জন্য নিজের জীবন বিলিয়ে দেবো।'[৩১১] মুগিরা ইবনু শুবা রা. চাচ্ছিলেন, বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ করা হোক। উসমান রা. বলেন, 'নবিজির প্রতিনিধিদের মধ্যে আমি প্রথম ব্যক্তি হতে চাই না যার হাত উম্মতের রক্তে রঞ্জিত হবে।'[৩১২]

উসমান রা. চাচ্ছিলেন না আল্লাহর নবির শহরে কোনো রক্তপাত হোক, মানুষের জীবন হয়ে উঠুক নিরাপত্তাহীন। নবিজি একবার উসমান রা.-কেই বলেছিলেন, মদিনার ভূমি সম্মানিত। এখানে কোনো গাছ কাটা যাবে না, কোনো অপরাধ করা যাবে না। যে এখানে অপরাধ করবে তার ওপর আল্লাহ, ফিরিশতা ও সকল মানুষের অভিশাপ।[৩১৩]

---

৩১০. *আত-তবাকাতুল কুবরা*, ৩/৬৬। *তারিখুল মদিনা*, ৪/১২২৬। *তারিখু খলিফা ইবনি খইয়াত*, ১৭০

৩১১. *মুসনাদে আহমাদ*, ২৪২৫৩। *ইবনে মাজাহ*, ১১৩। সনদ সহিহ।

৩১২. *মুসনাদে আহমাদ*, ৪৮১। আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর, কাব ইবনু মালিক ও অন্য সাহাবিরা বলেন, 'আপনি অনুমতি দিলে তাদেরকে মেরে তাড়িয়ে দিই।' উসমান রা. বলেন, 'এর কোনো দরকার নেই।' *আত-তবাকাতুল কুবরা*, ৩/৭০। *মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা*, ৩৭০৮২। *তারিখু খলিফা ইবনি খইয়াত*, ১৭০

৩১৩. *সহিহ বুখারি*, ১৮৬৭

নবিজির এমন সতর্কতাবাণী শোনার পরেও উসমান রা. কী করে রক্তপাতের ঝুঁকি নেবেন। তিনি তাই রক্তপাতের বদলে নিজের জীবনকেই কুরবানি করতে প্রস্তুত হলেন। এদিকে মদিনা অবরুদ্ধ হয়েছে শুনে বিভিন্ন শহরের মুসলিমরা আসার প্রস্তুতি নেন। অনেকে শহর ছেড়ে বেরও হন।[৩১৪] কিন্তু শহরে অবস্থানরত সাবায়িরা সংবাদ ছড়িয়ে দেয়, মদিনায় এখন আর কোনো অবরোধ নেই, সব সমস্যার সমাধান হয়েছে। এর ফলে লোকজন নিজ নিজ শহরেই অবস্থান করতে থাকে।[৩১৫]

অবরোধের দিনগুলো

উসমান রা. ছিলেন নিজের গৃহে অবরুদ্ধ। সময়টা ছিল গ্রীষ্মকাল। এদিকে বিদ্রোহীরা ছিল অবরোধে কঠোর। তারা উসমান রা.-এর গৃহে খাবার-পানীয় কিছুই প্রবেশ করতে দিচ্ছিল না। আলি রা. একদিন কিছু খাবার-পানীয় নিয়ে এলেন। বিদ্রোহীরা তা ভেতরে প্রবেশ করতে দিলো না। আলি রা. রেগে বললেন, তোমাদের এ আচরণ মুসলমানদের মতো না, কাফেরদের মতোও না। রোমান ও পারসিকরাও তো তাদের বন্দিদের খাবার দেয়। এই মানুষটা তোমাদের কী ক্ষতি করেছে যে তোমরা তার বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগেছ!

আলি রা.-এর এ কথায়ও বিদ্রোহীদের মন গলেনি। মূলত শয়তান তাদের বিবেকবুদ্ধি গ্রাস করে ফেলেছিল। আলি রা. বুঝলেন, এদের সাথে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। তিনি নিজের পাগড়ি খুলে দেয়ালের ওপর দিয়ে উসমান রা.-এর ঘরের ভেতর ছুড়ে মারলেন। যেন উসমান রা. বুঝতে পারেন, আলি রা. এসেছিলেন কিন্তু কিছু করতে পারেননি।[৩১৬]

উম্মুল মুমিনিন উম্মে হাবিবা রা.-ও একদিন খাবার নিয়ে এসেছিলেন উসমান রা.-এর গৃহে। কিন্তু এই মানুষরূপী পশুরা তাকেও ফিরিয়ে দেয়। তারা উম্মুল মুমিনিনের সাথে অভদ্র আচরণ করে, সব খাবার কেড়ে নেয় এমনকি তার খচ্চরকে এমনভাবে আঘাত করে যে তিনি পড়তে পড়তে কোনোরকম বেঁচে যান।[৩১৭] তবে আমর ইবনু হাজম লুকিয়ে লুকিয়ে কিছু খাবার পাঠাতেন। এভাবে উসমান রা. খুব কষ্টে দিন অতিবাহিত করছিলেন। উম্মুল মুমিনিন সফিয়্যা একদিন খাবার নিয়ে এলে কাপুরুষ আশতার নাখয়ি তার বাহনকে আঘাত করে। আম্মাজান ফিরে যান।[৩১৮] আশতার নাখয়ি উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রা.-এর সাথে দেখা করে

---

৩১৪. *তারিখুত তবারি*, ৪/৩৫১। *আত-তারিখুল আওসাত*, ১/৬২

৩১৫. *মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা*, ৭৭৫৭

৩১৬. *তারিখুত তবারি*, ৪/৩৮৬

৩১৭. *প্রাগুক্ত*

৩১৮. *মুসনাদে আহমাদ*, ১/৩৯০। সনদ সহিহ।

উসমান রা.-কে হত্যার ব্যাপারে তার মতামত জানতে চায়। আম্মাজান বলেন, 'মুসলিমদের রক্ত প্রবাহিত করা, তাদের খলিফাকে হত্যা করা এবং হারামকে হালাল করার পক্ষে আমি কী করে অনুমতি দিতে পারি?'[৩১৯]

ইতিমধ্যে হজের মৌসুম চলে এলে উসমান রা. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে আদেশ করেন হাজিদের কাফেলা নিয়ে মক্কা যেতে। ইবনু আব্বাস রা. বলেন, 'আল্লাহর কসম, এই শয়তানদের বিরুদ্ধে লড়াই করা আমার কাছে হজের চেয়ে বড়।' কিন্তু উসমান রা. তাকে হজে যেতে বলেন, যেন ইসলামের এই রুকন স্বাভাবিকভাবেই পালিত হয়।[৩২০] হজের কাফেলা তৈরি হলে উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রা. সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনিও হজে যাবেন। সম্ভাবনা ছিল উসমান রা.-কে হত্যার পর বিদ্রোহীরা উম্মুল মুমিনিনদের সাথেও অভদ্র আচরণ করবে। ইতিপূর্বে উম্মে হাবিবা ও সফিয়্যা রা.-এর সাথেও তারা খারাপ আচরণ করেছিল।

মদিনার অবস্থা ছিল বেশ টালমাটাল। একদিকে বিদ্রোহীরা উসমান রা.-এর ঘর অবরোধ করে রেখেছে, অন্যদিকে তিনি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়ার অনুমতি দিচ্ছেন না, ফলে সাহাবিদের অনেকেই মদিনা ত্যাগ করে অন্য অঞ্চলে চলে যান। তারা চোখের সামনে উসমান রা.-এর শাহাদাত দেখতে চাচ্ছিলেন না। যুবাইর রা.-ও মদিনা ত্যাগ করেন। বিদ্রোহীরা তাকে নিজের লোক বলে দাবি করছিল। তাই তিনি মদিনা ত্যাগ করে তাদের দাবির অসারতা প্রমাণ করেন।

যুবাইর রা. মদিনার বাইরে এসে বনু আওফ গোত্রের সাথে দেখা করেন। এই গোত্রের লোকেরা উসমান রা.-এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য যেকোনো পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত ছিল। যুবাইর রা. এক পত্র পাঠিয়ে উসমান রা.-কে জানান, 'তিনি সাহায্য করতে প্রস্তুত।' উসমান রা. ফিরতি পত্রে নির্দেশ দেন, 'যেখানে আছেন, সেখানেই থাকুন। হতে পারে বনু আওফের মাধ্যমে আল্লাহ বিষয়টি সুরাহা করবেন।'[৩২১]

এদিকে নাজুক পরিস্থিতিতেও উসমান রা. বিদ্রোহীদের সাথে আলাপ চালিয়ে যান। তিনি তাদেরকে শান্ত করার চেষ্টা চালান। তিনি প্রায়ই ঘরের ছাদে উঠে বিদ্রোহীদের সাথে কথা বলতেন। তিনি বলতেন, 'আমার আগে কাউকে তো নামাজে বাধা দেওয়া হয়নি। আমাকে কেন বাধা দিচ্ছ? রুমার কূপ আমি ক্রয় করেছি, অথচ আমাকে তার পানি পান করতে দিচ্ছ না। তোমরা কি জানো না, নবিজি বাইআতে রিজওয়ানের দিন নিজের হাতের দিকে ইশারা করে বলেছিলেন,

---

৩১৯. *তারিখুল মদিনা*, ৪/১২২৪। *তারিখু খলিফা ইবনি খইয়াত*, ১৭৬
৩২০. *তারিখুত তবারি*, ৪/৩৮৭
৩২১. *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, ৩৯/৩৭৪

এটা উসমানের হাত। তোমাদের কি মনে নেই, একবার ওহুদের ওপর নবিজির সাথে আমিও উপস্থিত ছিলাম, সে সময় তিনি ওহুদকে লক্ষ করে বলেছিলেন, তোমার ওপর নবি, সিদ্দিক ও শহিদ ছাড়া আর কেউ নেই! তোমরা তো জানো, তাবুকের যুদ্ধে আমি নিজের অর্ধেক সম্পদ দান করেছিলাম। কী অপরাধে তোমরা আমাকে হত্যা করবে? নবিজি তো বলেছেন, তিন কারণে কোনো মুসলমানকে হত্যা করা যায়। ব্যভিচার করলে, অন্য কাউকে অকারণে হত্যা করলে, মুরতাদ হয়ে গেলে।

আল্লাহর কসম, জাহিলি যুগেও আমি কখনো ব্যভিচার করিনি। আমি কাউকে হত্যা করিনি, মুরতাদ হয়েও যাইনি। তবুও কেন তোমরা আমাকে হত্যা করতে চাও!'[৩২২]
উসমান রা.-এর আবেগঘন বক্তব্য শুনে অনেক সময় বিদ্রোহীদের মধ্যে অনুশোচনা জেগে উঠত। তাদের কেউ কেউ বলে বসত, 'আমিরুল মুমিনিনের ওপর আমাদের হাত তোলা উচিত নয়। তাকে সুযোগ দেওয়া উচিত।'[৩২৩]

কিন্তু যখনই কেউ সুর নরম করত, তখন লুকিয়ে থাকা সাবায়ি চক্র আবার তাদেরকে উত্তেজিত করে দিত। উসমান রা.-এর নামে নানা মিথ্যা অভিযোগ তুলে ধরত। এতে যারা সুর নরম করেছিল তারাও আবার উত্তেজিত হয়ে যেত।

---
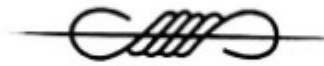
৩২২. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ১০/২৯২
৩২৩. *তারিখু খলিফা ইবনি খইয়াত*, ১৭২

উসমান রা.-এর শাহাদাত

হজের দিনগুলো শেষ হলে শোনা যায় হাজিরা মদিনার দিকে আসবেন। এমনকি শোনা যায়, কুফা, বসরা ও সিরিয়া থেকে উসমান রা.-এর সাহায্যে সেনাদল আসছে।[৩২৪] বিরক্তির পাশাপাশি বিদ্রোহীদের শঙ্কাও বাড়ছিল। বেশ কয়েকদিন ধরে অবরোধ চললেও উসমান রা. নতিস্বীকার করেননি। তিনি কোনোভাবেই দায়িত্ব ছাড়তে রাজি নন। বিদ্রোহীদের একটি অংশ সিদ্ধান্ত নেয়, 'আর দেরি করা যাবে না। কারণ বাহির থেকে সেনাদল মদিনায় প্রবেশ করলে তাদের আর কিছুই করার থাকবে না। সুতরাং সমাধান একটাই, উসমান রা.-এর শয়নকক্ষে প্রবেশ করে তাকে হত্যা করা হবে।'[৩২৫]

তাদের এই পরিকল্পনা এতটাই ঘৃণ্য ছিল যে, আশতার নাখয়ির মতো প্রথম সারির ভয়ংকর বিদ্রোহীও এতে একমত ছিল না। সে উল্টো উম্মুল মুমিনিন উম্মে হাবিবার মাধ্যমে উসমান রা.-কে ঘর থেকে সরানোর চেষ্টা চালায়, কিন্তু তার পরিকল্পনা অন্যরা জেনে গেলে তাকে তিরস্কার করে এবং বাধা দেয়।[৩২৬] উসমান রা. বুঝতে পারছিলেন বিদ্রোহীদের পরিকল্পনা। তিনি প্রায়ই তাদের উদ্দেশে কথা বলতেন। বিভিন্ন ঘটনা থেকে বোঝা যায়, তিনি এ সময় খেলাফতের উত্তরাধিকার নিয়েও চিন্তা করছিলেন। যেমন তিনি প্রায়ই বলতেন, 'অন্য কেউ খলিফা হওয়ার চেয়ে আলি রা. খলিফা হওয়া আমার কাছে অধিক প্রিয়।'[৩২৭] একবার তিনি উসামা ইবনে যায়দের মাধ্যমে সাহাবিদের কাছে একটি বার্তা পাঠান, যেখানে লেখা ছিল, 'আমার ঘরে কিছু মানুষ আছে যারা রক্ত প্রবাহিত করতে আগ্রহী। আমি চাই না তাদের রক্ত প্রবাহিত হোক। আপনারা আলি রা.-এর কাছে যান, তাকে বলুন, জনগণের দায়িত্ব এখন আপনার কাঁধে। আল্লাহ আপনার অন্তরে যা ঢেলে দেন তাই করুন। এরপর তালহা ও যুবাইরের কাছে যান এবং তাদেরকেও একই কথা বলুন!'

---

৩২৪. *তারিখুত তবারি*, ৪/৩৮৫

৩২৫. *প্রাগুক্ত*

৩২৬. *মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা*, ৩৭৭০৯

৩২৭. *তারিখুল মদিনা*, ৪/১২০৬

সাহাবিরা আলি রা.-এর কাছে গেলে দেখা গেল, তার ঘরের সামনে প্রচুর ভিড় এবং তিনি ঘরের দরজা বন্ধ করে রেখেছেন। সাহাবিরা যুবাইর রা.-এর কাছে গেলে তিনি বললেন, 'উসমান রা. ইনসাফের কথাই বলেছেন।' তালহা রা.-এর কাছে গেলে তিনি কিছু না বলে কান্না করতে থাকেন।

শেষ দিন—এক মহান সাহাবির অভিমানি প্রস্থান

১৮ জিলহজ দিনের শুরুটি যেন কীসের বার্তা দিচ্ছিল। উসমান রা.-ও টের পাচ্ছিলেন, ক্রমেই গুমোট হয়ে উঠছে আবহাওয়া। বাতাসে কীসের যেন বিষাদের সুর। মদিনাতুর রাসুলে অবস্থানরত বিদ্রোহীদের চোখগুলো যেন ক্রমেই রক্তের নেশায় কাতর হয়ে উঠছে। এ দিন সকাল থেকেই উসমান রা. বেশ কিছু পদক্ষেপ নিতে থাকেন যা থেকে বোঝা যাচ্ছিল, তিনি বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। প্রথমে তিনি ২০ জন দাস মুক্ত করে দেন। স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম করে পাজামা পরে নেন, যেন নিহত হলেও সতর অনাবৃত না হয়। এরপর তিনি কুরআন তিলাওয়াতে ব্যস্ত হয়ে যান। তাঁর আচরণে ছিল শান্তভাব, যেন পরিণতি সম্পর্কে স্পষ্ট জানেন তিনি। কারণ আগের রাতেই তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন, নবিজি তাকে বলছেন, 'উসমান আমার সাথে ইফতার করো।'[৩২৮]

উসমান রা.-এর নিরাপত্তায় তখনও সাহাবি ও তাবিয়িদের একটি দল তৎপর ছিল। তারা উসমান রা.-এর দরজার সামনে অবস্থান করছিলেন। এই দলে ছিলেন আবু হুরাইরা রা., হাসান রা., হুসাইন রা., আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর রা., সাইদ ইবনুল আস রা., মুহাম্মদ ইবনু তালহা ও মারওয়ান ইবনুল হাকাম। আবদুল্লাহ ইবনু উমরও জোড়া বর্ম পরে এই দলে উপস্থিত ছিলেন।

দিনের শুরুভাগে বিদ্রোহীরা উসমান রা.-এর ঘরে হামলা শুরু করলে এই দলটি তাদের প্রতিহত করে। শুরু হয় ধাওয়া-পালটা ধাওয়া ও আক্রমণ-পালটা আক্রমণ।[৩২৯] তালহা রা. বিদ্রোহীদের ওপর একাধিক তির নিক্ষেপ করেন।[৩৩০] কিন্তু সংঘর্ষ চলাকালেই উসমান রা. সবাইকে ঘরের ভেতর প্রবেশ করতে বলেন। সবাই ফটক বন্ধ করে ভেতরে চলে আসেন। উসমান রা. সবাইকে নির্দেশ দেন, তারা যেন লড়াই বন্ধ করে বাড়ি ফিরে যায়। মূলত তিনি বোঝাতে চাচ্ছিলেন, তিনি দায়িত্ব আঁকড়ে রেখেছেন নবিজির আদেশ রক্ষার্থে। কিন্তু তিনি চান না এর জন্য সংঘাত হোক। তিনি স্পষ্ট বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যে আমার আদেশ মানা

---

৩২৮. *মাজমাউয যাওয়ায়েদ*, ১২০০৭। *আত-তবাকাতুল কুবরা*, ৩/৭৪
৩২৯. *তারিখু খলিফা ইবনি খইয়াত*, ১৭৩
৩৩০. *তারিখুল মদিনা*, ৪/১১৬৯

অপরিহার্য মনে করে সে অস্ত্র থেকে তার হাত সরিয়ে নিক এবং অস্ত্র কোষবদ্ধ রাখুক।'[৩৩১]

উসমান রা.-কে নিজের সিদ্ধান্তে অনড় দেখে সাহাবিরা আদেশ রক্ষার্থে তার ঘর ত্যাগ করেন। শুধু হজরত হাসান রা. বসে ছিলেন। উসমান রা. তাকে বলেন, 'তোমাকে কসম দিচ্ছি। চলে যাও!' এবার হাসান রা.-ও বের হয়ে যান। উসমান রা. একজন লোককে ডেকে বাইতুল মালের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন।

সবাই বের হলে উসমান রা. কুরআন এনে তিলাওয়াত শুরু করেন। ঘরে তখন তিনি ছাড়া আর কোনো পুরুষ ছিল না। মহিলাদের মধ্যে শুধু পরিবারের সদস্যরাই ছিল। উসমান রা.-এর গৃহের ফটক ছিল খোলা, এখন যে-কেউ চাইলে তার ঘরে প্রবেশ করতে পারে।[৩৩২]

ফটক খোলা দেখে বিদ্রোহীরা এক ব্যক্তিকে ভেতরে পাঠায়। সে উঁকি দিয়ে দেখে ভেতরে কোনো প্রহরা নেই। এবার একজনকে পাঠানো হয় উসমান রা.-কে শহিদ করার জন্য। কিন্তু সে সাহস হারিয়ে ফেলে। সে উসমান রা.-কে বলে, 'আপনি খেলাফত ছেড়ে দিন। আমরা আপনাকে আর কিছুই বলব না।' উসমান রা. বলেন, 'আল্লাহর দেওয়া পোশাক আমি কীভাবে খুলব? আমি এভাবেই থাকব, যতক্ষণ না আল্লাহ সৌভাগ্যবানদের সম্মানিত ও দুর্ভাগাদের অপমানিত করেন।' উসমান রা.-এর কথা শুনে লোকটি কেঁপে যায়। সে বাইরে এসে মন্তব্য করে, তাকে হত্যা করা আমাদের জন্য জায়িজ নয়। এবার আরেকজনকে পাঠানো হয়, কিন্তু সেও সাহস হারিয়ে ফিরে আসে। এভাবে বেশ কজনকে পাঠানো হয়, কিন্তু প্রত্যেকেই ফিরে আসে।

হজরত আবু বকরের ছেলে মুহাম্মদ ইবনু আবু বকরও বিদ্রোহীদের দলে ছিলেন। তিনি ছিলেন সেসব বিদ্রোহী যাদের পরিস্থিতি সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান ছিল না এবং যারা নিজের অজান্তেই সাবায়ি চক্রের হাতের খেলনায় পরিণত হয়েছিল। তিনি ঘরের ভেতরে প্রবেশ করেন, কিন্তু উসমান রা. তাকে দেখে বলেন, তুমি এমন আচরণ করছ যা তোমার পিতা দেখলে পছন্দ করতেন না। এ কথা শুনে মুহাম্মদ ইবনু আবু বকর ফিরে যান। তিনি বিদ্রোহীদেরও ফিরে যেতে বলেন, কিন্তু কেউ তার কথায় কর্ণপাত করেনি।[৩৩৩]

---

৩৩১. *তারিখু খলিফা ইবনি খইয়াত*, ১৭৪

৩৩২. *তারিখুত তবারি*, ৪/৩৯২। *আত-তবাকাতুল কুবরা*, ৩/৭০। *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, ৩৯/৩৯৯। *তারিখু খলিফা ইবনি খইয়াত*, ১৭৪

৩৩৩. বেশ কিছু গ্রন্থে মুহাম্মদ ইবনু আবু বকরকে হত্যাকারীদের একজন বলা হলেও এটা সত্য নয়।

সাবায়ি চক্র দেখল কর্মীদের ওপর ছেড়ে দিলে হচ্ছে না। যে-ই ভেতরে যাচ্ছে সেই সাহস হারিয়ে ফিরছে। উসমান রা.-এর ভদ্র আচরণ ও কোমল ব্যবহারের সামনে তারা নিজেদের মনের পশুকে জাগ্রত করতে পারছে না। তাই সাবায়ি চক্র সিদ্ধান্ত নিল, তারা নিজেরাই ভেতরে প্রবেশ করে উসমান রা.-কে হত্যা করবে।

সাবায়ি চক্র ঘরের ভেতর প্রবেশ করে উসমান রা.-কে তিলাওয়াতরত অবস্থায় পায়। রুমান নামে এক সাবায়ি ভারী লোহা দিয়ে উসমান রা.-এর মাথায় আঘাত করে। আবদুর রহমান গাফিকি নামে আরেক সাবায়িও উসমান রা.-কে আঘাত করে।[৩৩৪] আল-মাওতুল আসওয়াদ (কালো মৃত্যু) নামে এক কুলাঙ্গার এগিয়ে এসে উসমান রা.-এর গলা চেপে ধরে। বাতাসের অভাবে তিনি ছটফট করতে থাকেন। এবার সেই হতভাগা তরবারি দিয়ে উসমান রা.-কে আঘাত করে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরে উসমান রা.-এর শরীর থেকে। রক্তে লাল হয়ে যায় সামনে রাখা কুরআন কারিমের পৃষ্ঠা। আরেক নরপশু সাবায়ি বর্শা দিয়ে উসমান রা.-কে আঘাত করে। তাঁর শরীর থেকে স্রোতের মতো রক্ত বের হতে থাকে। ঘরের নারীদের অংশেও হইচইয়ের শব্দ শোনা যায়। উসমান রা.-এর স্ত্রী নাইলা ও অন্যরা ছুটে আসেন। সুদান ইবনে হুমরান নামে এক নরাধম তরবারি দিয়ে নাইলার হাতে আঘাত করলে তার আঙুল কাটা পড়ে। মিশরের এক বিদ্রোহী উসমান রা.-এর বুকে তরবারি চেপে ধরে। তার বুক এফোঁড়-ওফোঁড় করে তরবারি বের হয়ে যায়। এভাবেই ইসলামের তৃতীয় খলিফা, নবিজির আদরের জামাতা, যিন-নুরাইন উসমান রা. শহিদ হয়ে যান। সময়টা ছিল ৩৫ হিজরির ১৮ জিলহজ সূর্যাস্তের একটু আগে।[৩৩৫]

হইচই শুনে উসমান রা.-এর সদ্য আজাদকৃত কয়েকজন গোলাম ছুটে আসেন। উসমান রা. তাদের বলেছিলেন, কোনোভাবেই যেন বিদ্রোহীদের আঘাত করা না হয়, কিন্তু উসমান রা.-এর শাহাদাত দেখে তারা আর সহ্য করলেন না। একজন এসে পাপিষ্ঠ দুরাচার সুদান বিন হুমরানের মাথা তরবারির এক কোপে কেটে ফেলেন। আরেকজন হত্যা করেন কুতাইবা নামে আরেক খুনিকে। কুলসুম নামে আরেক সাবায়ি টের পাওয়ার আগেই তার শরীর থেকে মাথা আলাদা হয়ে যায়। এভাবে উসমান রা.-এর আজাদকৃত গোলামরা বিদ্রোহীদের কয়েকজনকে হত্যা করেন। এ সময় গোলামদের মধ্য থেকেও শহিদ হন।[৩৩৬]

---

৩৩৪. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ১০/৩১৮। *তারিখুত তবারি*, ৪/৩৯১

৩৩৫. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ১০/৩১৮। *তারিখুত তবারি*, ৪/৩৯৩

৩৩৬. *তারিখুত তবারি*, ৪/৩৯৪

এদিকে হাঙ্গামার শব্দ শুনে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর ও মারওয়ান ইবনুল হাকামও এগিয়ে আসেন। বিদ্রোহীদের সাথে লড়াই করতে করতে তারা আহত হন। পরে মদিনাবাসী তাদের রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে।[৩৩৭] বিদ্রোহীরা উসমান রা.-এর ঘর লুণ্ঠন করে, এরপর তারা লুণ্ঠন করে বাইতুল মাল। মূলত তারা ছিল দুনিয়ালোভী চোর ও ডাকাত। তারা ছিল সেই পাপাচারীর দল, যারা নিজেদের কাজকে মনে করেছিল নেককাজ। শয়তান যাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল খুব সহজে।

জানাজা ও দাফন

বাতাসের গতিতে ছড়িয়ে পড়ে উসমান রা.-এর শাহাদাতের সংবাদ। সে রাতেই সাহাবিরা উসমান রা.-এর গৃহে চলে আসেন। উসমান রা.-এর লাশ ঘরের ভেতর খাটিয়ায় রাখা হয়েছিল। লোকেরা দলে দলে ঘরে প্রবেশ করে তার লাশ দেখতে থাকে, এ সময় মদিনার শিশুরাও ছুটে আসে। এক বিদ্রোহী উসমান রা.-এর লাশের সাথে বেয়াদবি করতে গেলে সাথে সাথে তার হাত শুকিয়ে যায়। ইবনে সিরিন বলেন, 'আমি তাকে দেখেছি। মনে মতো তার হাত শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।'[৩৩৮]

উসমান রা.-কে গোসল দেওয়া হয়নি। তার পরনের কাপড়ই ছিল তার কাফন। তার জানাজা পড়ান মারওয়ান ইবনুল হাকাম। তারপর জান্নাতুল বাকিতে দাফন করা হয় উসমান রা.-কে। ইনতিকালের সময় উসমান রা.-এর বয়স ছিল ৮২ বছর।

সাহাবিদের প্রতিক্রিয়া

উসমান রা.-এর শাহাদাতের সংবাদে সাহাবিরা তীব্র শোকাহত হন। তারা নানাভাবে নিজেদের শোক ও দুঃখ প্রকাশ করতে থাকেন। উসমান রা.-এর শাহাদাতের সংবাদ শুনে যুবাইর রা. বললেন, 'আল্লাহ উসমান রা.-এর ওপর রহম করুন! তাঁর মৃত্যুর বিচারের ব্যবস্থা করুন!' সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রা. বলেন, 'হে আল্লাহ, আপনি ওই লোকদের অপদস্থ করুন।'[৩৩৯] সামুরা ইবনে জুনদুব বলেন, 'ইসলামের একটি শক্তিশালী দুর্গ ছিল, এই লোকগুলো উসমান রা.-কে হত্যা করে সেই দুর্গে ফাটল ধরিয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত এই ফাটল মেরামত করা সম্ভব নয়।' বদরি সাহাবি আবু হুমাইদ সায়িদি বলেন, 'কিয়ামত পর্যন্ত আমি আর হাসব না।'[৩৪০] সাইদ ইবনু যায়েদ বলেন, 'কোনো ঘটনার প্রভাবে যদি ওহুদ

---

৩৩৭. *আল-ইসতিআব*, ৩/১০৪৬

৩৩৮. *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, ৩৯/৪৫৮। *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ১০/৩২০

৩৩৯. *তারিখুত তবারি*, ৪/৩৯২

৩৪০. *আত-তবাকাতুল কুবরা*, ৩/৮১

পাহাড়ে ফাটল ধরতে হয় তাহলে উসমান রা.-এর শাহাদাত হলো সেই ঘটনা।'[৩৪১]

আলি রা. বলতেন, 'উসমান রা.-এর হত্যা থেকে আমি পবিত্র। না আমি তাকে হত্যা করেছি, না আমি কাউকে উদ্বুদ্ধ করেছি।[৩৪২] যেদিন উসমান রা. শহিদ হন, সেদিন থেকে আমি অনুভূতিশূন্য। আমি যেন নিজের কাছেই অপরিচিত হয়ে উঠছি।'[৩৪৩]

হত্যাকারীদের পরিচয়—কিছু প্রশ্ন

উসমান রা.-এর খুনিদের একজনের উপাধি ছিল আল-মাওতুল আসওয়াদ। এই ব্যক্তির প্রকৃত নাম জানা যায় না। শুধু জানা যায়, তার উপাধি ছিল আল-মাওতুল আসওয়াদ। সে ছিল মিশর থেকে আগত এক কৃষ্ণাঙ্গ। সেই উসমান রা.-কে শহিদ করে অভিযানের সমাপ্তি ঘোষণা করে। এই তথ্যগুলো সামনে রাখলে আবদুল্লাহ ইবনে সাবার সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কারণ সেও অবস্থান করছিল মিশরে। তার চেহারাও ছিল কালো। তাকেও বলা হতো ইবনুস সাওদা। আল-মাওতুল আসওয়াদের সাথে যা মিলে যায়। হত্যাকারীর আরেক উপাধি ছিল জাবালা। ইয়ামানের ইহুদিরা এই নাম রাখত। আবদুল্লাহ ইবনে সাবাও ছিল ইয়ামানের ইহুদি।

আরেকটি বিষয় হলো, শুরু থেকে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিচ্ছিল আবদুল্লাহ ইবনে সাবা। কিন্তু হত্যাকাণ্ডের সময়টায় তার কোনো উপস্থিতি দেখা যায় না। এটি কী করে সম্ভব? যে সব গুছিয়ে এনেছিল আসল সময়ে সে থাকবে না তা মানা যায় না। বরং সে অবশ্যই বিদ্রোহীদের মাঝে ঘাপটি মেরে ছিল। ঘটনার বিবরণেও আমরা দেখি, বিদ্রোহীরা সাহস হারালে সাবায়ি চক্র ঘরে প্রবেশ করে হত্যায় এগিয়ে যায়। অসম্ভব নয় ঘরে প্রবেশ করা লোকদের মাঝে ইবনে সাবা ছিল।

এসব সামনে রেখে এই অনুমান করা অসম্ভব নয় যে, আল-মাওতুল আসওয়াদই ছিল আবদুল্লাহ ইবনে সাবা।
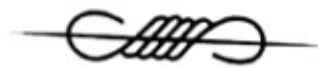
৩৪১. *সহিহ বুখারি*, ৩৮৬২

৩৪২. *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, ৩৯/৩৭২

৩৪৩. *আল-মুসতাদরাক আলাস সহিহাইন*, ৪৫২৭

উসমান রা.-এর শাহাদাত—কিছু সংশয় ও সমাধান

উসমান রা.-এর মৃত্যুর সাথে জড়িয়ে আছে নানা প্রশ্ন ও সংশয়। আধুনিক লেখকদের কেউ কেউ উসমান রা.-এর মৃত্যুর ইতিহাস লিখতে গিয়ে তার ওপরই জুলুম করেছেন নানা অন্যায় অভিযোগ তুলে। এ অভিযোগগুলোর মীমাংসা জানা থাকা দরকার। উসমান রা.-এর ওপর আরোপিত এসব প্রশ্নের জবাব জানা না থাকলে তাকে অযোগ্য, স্বজনপ্রীতির অধিকারী এক শাসক মনে হবে, যার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাটাই ছিল উপযুক্ত সমাধান। এ ছাড়াও উসমান রা.-এর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে জন্ম নিয়েছে আরও কিছু সংশয়, যা আঘাত করতে চায় সাহাবায়ে কেরামের নিষ্কলুষ ব্যক্তিত্বে। এই অধ্যায়ে আমরা এমন কিছু প্রশ্নের মীমাংসা করব, যা ওরিয়েন্টালিস্ট ও তাদের দ্বারা প্রভাবিত লেখকরা নিয়মিত তাদের লেখায় ছড়াচ্ছেন।

সংশয় ১ – উসমান রা. গভর্নর নিয়োগের বেলায় স্বজনপ্রীতি করেন। তিনি বেছে বেছে শুধু নিজের আত্মীয় ও বনু উমাইয়ার লোকদেরকেই গভর্নর বানান।

জবাব – বনু উমাইয়াদেরকে উচ্চপদে আসীন করার ধারা নবিজিই শুরু করেছিলেন। নবিজির জীবদ্দশাতেই বনু উমাইয়ার অন্তত ১০ জনকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়। এজন্যই ইমাম ইবনে তাইমিয়া লিখেছেন, 'নবিজির যুগে নিয়োগকৃত কর্মকর্তাদের মধ্যে বনু উমাইয়ার চেয়ে কারও সংখ্যা বেশি ছিল না। এর কারণ হলো, তাদের আভিজাত্য ও রাজনৈতিক দক্ষতা বেশি ছিল।'[৩৪৪]

উসমান রা.-এর যুগে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের ৪৭ জনের মধ্যে উসমান রা.-এর আত্মীয় ছিলেন মাত্র ছয়জন। এর মধ্যে বনু উমাইয়ার সদস্য ছিলেন চারজন।[৩৪৫] অপরদিকে হজরত উমরের শাসনামলেই প্রশাসনে বনু উমাইয়ার সদস্য ছিলেন পাঁচজন। উসমান রা. ক্ষমতায় বসার আগ থেকেই উমাইয়াদের তিনজন দায়িত্ব পালন করছিলেন। দেখা যাচ্ছে, আনুপাতিক হারে হিসাব করলেও উসমান রা. নিকটাত্মীয়দের বেশি নিয়োগ দেননি। যারা যোগ্য ছিল

---

৩৪৪. *মিনহাজুস সুন্নাহ*, ৬/১৯২

৩৪৫. বিস্তারিত দেখুন, *তারিখে উম্মতে মুসলিমা*, ২য় খণ্ড।

তাদেরকেই পদে বহাল করেছেন। এতে দোষের কিছু নেই। যোগ্যদের পদে বহাল করাকে কেন্দ্র করে উসমান রা.-এর ওপর স্বজনপ্রীতির অভিযোগ করা মূলত খুলাফায়ে রাশিদিনের সাথে বেয়াদবি ও মিথ্যাচার।

কেউ যদি মক্কাবিজয় থেকে শুরু করে উসমান রা.-এর শাসনকাল পর্যন্ত প্রশাসনে উমাইয়াদের অবস্থান পর্যালোচনা করে, তাহলে দেখা যাবে আগের সময়ের তুলনায় উসমান রা.-এর সময়ে প্রশাসনে উমাইয়াদের সংখ্যা কম ছিল।

সংশয় ২ – উসমান রা.-এর ওপর নানা কারণে সাহাবিরা ক্ষিপ্ত ছিলেন। তাই এই বিদ্রোহে তারাও সায় দিয়েছিলেন।

জবাব – এই অভিযোগ সঠিক নয়। সাহাবায়ে কেরামের কেউ এই বিদ্রোহে জড়িত ছিলেন না। এটা সত্য যে, বিভিন্ন সময় সাহাবায়ে কেরামের অনেকে উসমান রা.-এর নানা সিদ্ধান্তের সাথে দ্বিমত করেছেন, তাদের মতামত জানিয়েছেন, কিন্তু এর মানে এই নয় যে তারা বিদ্রোহ করেছেন বা এতে উস্কানি দিয়েছেন। সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব বলেন, 'আমি আলি রা. ও উসমান রা.-কে দেখেছি, তারা একে অপরকে যা বলার বলে ফেলতেন। একটু পর উভয়েই উভয়ের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যান। একে অপরের জন্য ইসতিগফার করেন।' আবু সাইদ খুদরি রা বলেন, 'দ্বিমতের পর তারা যখন একে অপরের হাত চেপে ধরতেন, মনে হতো তারা দুজন আপন মায়ের পেটের ভাই।'[৩৪৬]

মূলত এটিই ছিল সাহাবিদের সম্পর্কের প্রকৃত ধরন। তারা দ্বিমত করতেন, কিন্তু এতে অনৈক্য হতো না। তারা তাদের মতামত অবশ্যই জানাতেন, কিন্তু নিজের মত প্রতিষ্ঠার জন্য রক্ত ঝরানোর পথ বেছে নিতেন না। হাসান বসরি বলেন, 'আমি সাহাবিদের এমন কাউকে চিনি না, উসমান রা.-এর খুনে যিনি জড়িত ছিলেন। কিংবা যিনি খুনিদের কোনো সাহায্য করেছিলেন।'[৩৪৭]

ইবনু কাসির রহ. স্পষ্ট লিখেছেন, 'কিছু মানুষ বলে বেড়ায়, সাহাবিদের অনেকে উসমান রা.-এর হত্যাকাণ্ডে সন্তুষ্ট ছিলেন, এটা কোনো সাহাবির ব্যাপারেই সত্য নয়। বরং তারা সবাই-ই এটিকে ঘৃণা করেছেন, এ থেকে দূরে থেকেছেন এবং যারা এমন করেছে তাদের গালমন্দ করেছেন।'[৩৪৮]

---

৩৪৬. *আস-সুন্নাহ*, বর্ণনা নং-৬১৫, ৬১৬

৩৪৭. *তারিখুল মদিনা*, ৪/১২২৫

৩৪৮. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ১০/৩৪৫

সংশয় ৩ – হজরত আবু বকরের ছেলে হয়েও মুহাম্মদ বিন আবু বকর উসমান রা.-এর হত্যায় জড়িত ছিলেন।

জবাব – মুহাম্মদ ইবনু আবু বকর বিদ্রোহীদের সাথে ছিলেন, কিন্তু তিনি হত্যায় জড়িত ছিলেন এমন কোনো বিশুদ্ধ বর্ণনা নেই। মূলত কয়েকটি কারণে তিনি এই বিদ্রোহে অংশ নেন। প্রথমত, ভুল বোঝাবুঝি ও সাবায়ি প্রতারণার শিকার হন। দ্বিতীয়ত, হজরত আবু বকর রা.-এর সন্তান হিসেবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রতি আগ্রহ ছিল। এই আগ্রহ মেটানোর সহজ মাধ্যম ছিল সাবায়িদের বিদ্রোহে যোগ দেওয়া। তৃতীয়ত, তার কাছে এক লোকের পাওনা ছিল। তিনি দিতে গড়িমসি করলে উসমান রা. প্রভাব খাটিয়ে তা আদায় করে দেন। এ কারণে উসমান রা.-এর প্রতি তার ব্যক্তিগত ক্রোধ ছিল। সালিম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়, 'মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর উসমান রা.-এর ওপর ক্ষিপ্ত ছিলেন কেন?' তিনি বলেন, 'রাগ আর লোভ।'[৩৪৯]

তবে বিদ্রোহে অংশ নিলেও খুনে তিনি জড়িত ছিলেন না। খুন করার জন্য উসমান রা.-এর ঘরে প্রবেশ করলেও পরে অনুতপ্ত হয়ে ফিরে এসেছিলেন।[৩৫০]
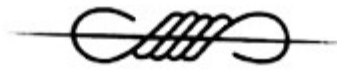
৩৪৯. *তারিখুত তবারি*, ৪/৪০০
৩৫০. *তারিখু খলিফা ইবনি খইয়াত*, ১৭৪

হত্যার বিচার প্রসঙ্গ

আলি রা.-এর বাইআত গ্রহণ

উসমান রা.-এর হত্যার পর বিদ্রোহীরা মদিনায় পাঁচ দিন অবস্থান করে। এ সময় তারা তালহা রা., যুবাইর রা. ও আলি রা.-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাদেরকে খেলাফতের দায়িত্ব নিতে আহ্বান জানায়। কিন্তু তারা প্রত্যেকেই তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাদের ফিরিয়ে দেন। এই পাঁচ দিন মুসলমানদের কোনো ইমাম বা খলিফা ছিলেন না। এ সময় মসজিদে নববিতে নামাজ পড়াচ্ছিল উসমান রা.-এর ওপর হামলাকারী বিদ্রোহী নেতা আবদুর রহমান গাফিকি।[৩৫১]

পাঁচ দিন কেটে গেলেও খলিফা নির্বাচিত না হওয়ায় বিদ্রোহীরা রেগে যায়। উসমান রা.-এর শাহাদাতের ষষ্ঠ দিনে তারা মসজিদে নববিতে মদিনাবাসীকে জোর করে একত্র করে বলে, তোমরা আহলুল হাল্লি ওয়াল-আকদ অর্থাৎ নীতি-নির্ধারক। তোমরাই খলিফা নির্বাচন করবে। তোমাদের দুদিন সময় দেওয়া হচ্ছে, এর মধ্যে যদি তোমরা খলিফা নির্বাচিত করতে না পারো, তাহলে তালহা, যুবাইর ও আলিকে আমরা হত্যা করব।'

সাবায়িদের এই হুমকিতে মদিনার লোকজন ঘাবড়ে যায়। তারা আলি রা.-এর সাথে দেখা করে তাকে দায়িত্ব নিতে আহ্বান জানায়। তিনি তাদের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে সরাসরি হজরত তালহার সাথে সাক্ষাৎ করতে যান। তিনি তালহা রা.-কে বলেন, 'আপনি হাত প্রসারিত করুন, আমি বাইআত হব।' তালহা রা. বললেন, 'আপনি আমার চেয়ে বেশি যোগ্য। আপনি আমিরুল মুমিনিন। আপনিই হাত দিন।' এরপর আলি রা. তাঁর হাত দিলে তালহা রা. বাইআত গ্রহণ করেন।[৩৫২] এটিই ছিল আলি রা.-এর পক্ষে প্রথম বাইআত। এরপর তালহা রা. আলি রা.-কে নিয়ে যুবাইর রা.-এর সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনিও আলি রা.-এর হাতে বাইআত হন। এরপর মদিনার লোকজন তার হাতে বাইআত গ্রহণ করে। এভাবেই খেলাফতের মসনদে বসেন আলি রা.।

---

৩৫১. *তারিখুত তবারি*, ৪/৪৩২। *আল-আওয়াসিম মিনাল কাওয়াসিম*, ১২২

৩৫২. *তারিখুত তবারি*, ৪/৪৩৪

৩৫ হিজরির ২৪ জিলহজ তিনি খলিফা হিসেবে মসজিদে নববিতে প্রথম বক্তব্য রাখেন। এই বক্তব্যে তিনি বলেন, 'এই দায়িত্ব কাঁধে নেওয়া আমার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু তোমরা ছিলে নাছোড়বান্দা। বাইতুল মালের চাবি আমার হাতে থাকবে, তবে তোমাদের অনুমতি ছাড়া আমি সেখান থেকে একটি কানাকড়িও নেব না।'[৩৫৩]

দলে দলে লোকেরা আলি রা.-কে বাইআত দেয়। বিদ্রোহীদের অনেকেও এ সময় তার হাতে বাইআত হয়।

উসমানহত্যার বিচার প্রসঙ্গ

আলি রা. বাইআত নেওয়ার পর একটা বড় প্রশ্ন সামনে আসে। উসমান রা.-এর হত্যায় জড়িত খুনি ও বিদ্রোহীদের বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে সাহাবিদের মধ্যে চারটি মত দেখা যায়।

১। একাংশের মত ছিল উসমান রা.-এর হত্যার বিচার অবশ্যই করা হবে। কিন্তু বর্তমানে রাজনৈতিক যে অস্থিরতা চলছে এর মধ্যে বিচার শুরু করলে অনেক নির্দোষ মানুষকেও হত্যা করা হতে পারে। তাই সবার আগে প্রয়োজন ইসলামি ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা। তারপর সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে অপরাধীদের চিহ্নিত করে শাস্তি দেওয়া। তা ছাড়া বিদ্রোহীদের অনেকে তওবা করে আলি রা.-এর হাতে বাইআত হয়েছে। এদের অনেকেই ভুল বুঝেছিল এবং হত্যায় তারা জড়িত ছিল না। ফলে তাদেরকেও ক্ষমা করা প্রয়োজন। সাহাবিদের একাংশের তাই ধারণা ছিল, এখন বিচার শুরু করলে ষড়যন্ত্রকারীরা পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে অনেক নিরপরাধ মানুষকেও ফাঁসিয়ে দিতে পারে। তাই তারা সময় নিয়ে বিষয়টি সমাধান করতে চাচ্ছিলেন। এই মতের পক্ষে ছিলেন আলি রা., আম্মার ইবনু ইয়াসির রা., উসমান ইবনু হুনাইফ রা., সাহল ইবনু হুনাইফ রা., আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা., হাসান রা., হুসাইন রা., কাকা ইবনু আমর প্রমুখ।

২। আলি রা.-এর হাতে বাইআত নেওয়া সাহাবিদের কয়েকজনের মত ছিল, খেলাফত লাভের পর আলি রা.-এর দায়িত্ব হলো উসমান রা.-এর খুনিদের বিচার করা। তিনি যদি এই কাজে বিলম্ব করেন, তাহলে আমরা নিজ হাতে তাদের শাস্তি দেবো। এই মতের পক্ষে ছিলেন তালহা রা., যুবাইর রা. ও আয়েশা রা.।

৩। হজরত মুআবিয়া রা. ও শামবাসীর মত ছিল বাইআত নেওয়ার আগে খুনিদের শাস্তি নিশ্চিত করা জরুরি। তাই তারা জানিয়ে দেন, আলি রা. খুনিদের কিসাস

---

৩৫৩. *তারিখুত তবারি*, ৪/৪২৮

কার্যকর করলে তারা বাইআত হবেন, নইলে হবেন না। মূলত দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলের মত একই ছিল। তবে দ্বিতীয় দল বাইআত হয়েছিলেন এবং এই বাইআতকে তারা বৈধ মনে করতেন। কিন্তু তাদের বক্তব্য ছিল আলি রা. কিসাস কার্যকর না করলে তারা নিজ হাতে তা করবেন। অপরদিকে তৃতীয় দল কিসাস কার্যকরের আগে বাইআত হতেই প্রস্তুত ছিলেন না। তারা বাইআতকে শর্তযুক্ত করেছিলেন কিসাস কার্যকরের সাথে।

৪। একাংশ সিদ্ধান্ত নেন, তারা কোনো কিছুতেই জড়াবেন না। তারা সবার থেকেই আলাদা থাকবেন। তারা একদম নীরব থাকবেন, যেন কাউকে কষ্ট দিতে না হয়। এই মতের প্রবক্তা ছিলেন সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রা., আবদুল্লাহ ইবনু আমর রা., সাইদ ইবনু যায়দ রা., উসামা ইবনু যায়দ রা. প্রমুখ। এই মতের সাহাবিদের মনোভাব জানা যায় মুহাম্মদ ইবনু মাসলামার বক্তব্য থেকে। তিনি নিজের তরবারি ভেঙে ফেলে মদিনার বাইরে চলে যান। তিনি বলেন, 'নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, ফিতনার সময় তরবারি ভেঙে ফেলে ঘরে বসে থাকতে। আমি এটাই করছি।'[৩৫৪]

এই চারটি মতের চতুর্থ মত যারা লালন করতেন, তারা বেছে নিয়েছিলেন নির্বিঘ্ন জীবন। তারা সাতে-পাঁচে থাকতেন না। রাজনৈতিক অস্থিরতা থেকেও তারা গুটিয়ে নিয়েছিলেন হাত। ফলে ইখতিলাফ বা মতানৈক্যটি সক্রিয় থাকে প্রথম তিন দলের মাঝে। এর মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় দল ছিলেন একদিকে, আলি রা. ও তাঁর সমমনারা ছিলেন অন্যদিকে। মূলত সার্বিক বিচারে আলি রা.-এর সিদ্ধান্তই ছিল সঠিক। কয়েকটি কারণে তখনই খুনিদের শাস্তি নিশ্চিত করা সম্ভব ছিল না। যেমন খুনিদের মধ্যে ছিল কয়েক ভাগ।

১। আবদুল্লাহ ইবনে সাবা সবসময় পর্দার আড়ালে ছিল। সে কোনো প্রমাণ রাখেনি নিজের কাজের। এ অবস্থায় তাকে নাটের গুরু হিসেবে চিনলেও আইনিভাবে শাস্তি দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। মদিনায় নবিজিও এই কারণে মুনাফিকদের শাস্তি দেননি, এবং তাবুকের যুদ্ধে সব জেনেও বাহ্যিকভাবে তাদের ওজর কবুল করেছিলেন।

২। কিছু মানুষ ছিল নিরপরাধ, অথচ তাদেরকে খুনি বলে প্রচার করা হচ্ছিল। যেমন আমর ইবনুল হামিক ও আবদুর রহমান ইবনু উদাইস। আলি রা. তাদের নির্দোষিতা সম্পর্কে জানতেন। তাই তাদেরকে শাস্তি দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

৩। হত্যাকারীদের অনেকে ঘটনাস্থলেই নিহত হয়, ফলে তাদের শাস্তি দেওয়ার প্রসঙ্গই রইল না। আবার অনেককে চিহ্নিত করা যাচ্ছিল না। ঘটনার সবচেয়ে বড়

---

৩৫৪. *মুসনাদে আহমাদ*, ১৬০২৯

সাক্ষী ছিলেন উসমান রা.-এর স্ত্রী নাইলা ও উসমান রা.-এর গোলাম। গোলাম তো যুদ্ধ করতে করতে শহিদ হন। অপরদিকে নাইলা স্বামীকে রক্ষা করার জন্য তার ওপর উপুড় হয়ে পড়েছিলেন। ফলে মারণাঘাত কে করেছিল তা তিনি দেখেননি।

৪। হত্যাকারীদের অনেকে সিরিয়া ও মিশরের সীমান্তে পালিয়ে যায়। এই এলাকাটি আলি রা.-এর নিয়ন্ত্রণে ছিল না। এমনকি দীর্ঘদিন এটাও জানা যায়নি তারা এখানে অবস্থান করছে।[৩৫৫]

৫। অনেকে খুন করেনি, কিন্তু বিদ্রোহে জড়িয়ে বিশৃঙ্খলা করেছিল। এদের বড় অংশ আলি রা.-এর হাতে বাইআত হয়, তাই তিনি চাচ্ছিলেন না কোনো যাচাই-বাছাই ছাড়াই ব্যাপকভাবে সবাইকে শাস্তি দিতে।

আলি রা. এসব বিষয় সামনে রেখে সিদ্ধান্ত নেন, বিস্তারিত অনুসন্ধান সেরে অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া হবে। অপরদিকে শুধু বিদ্রোহে জড়িত যারা ক্ষমা চাইবে, তাদের মাফ করে বাইআত গ্রহণ করা হবে। এর বিপরীতে তালহা রা., যুবাইর রা. ও আয়েশা রা.-এর মত ছিল বিদ্রোহে জড়িত সবাই সমান অপরাধী। তাদের সবাইকে হত্যা করতে হবে। আলি রা. তাদের এ মতের সাথে দ্বিমত করতেন। তিনি বিদ্রোহে জড়িত সবাইকে হত্যাযোগ্য মনে করতেন না। মনে রাখতে হবে, এটি ছিল এমন এক ঘটনা যা ইসলামের ইতিহাসে আর ঘটেনি। ফলে এ সম্পর্কে ফিকহি ইখতিলাফ থাকা ছিল খুবই স্বাভাবিক। যদি বিষয়টি পূর্ব থেকে নিষ্পত্তিকৃত কোনো বিষয় হতো, তাহলে দুপক্ষ একমত হতে পারতেন, কিন্তু যেখানে বিষয়টিই নতুন সেখানে পরস্পরের ইজতিহাদের পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক।[৩৫৬]

আলি রা. ক্ষমতায় বসেই বিদ্রোহীদের শহর ত্যাগের নির্দেশ দেন। বিদ্রোহীরা মদিনা ত্যাগ করে নিজ নিজ শহরে চলে যায়। এভাবে খুব দ্রুতই মদিনার পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে সক্ষম হন তিনি। কিন্তু অন্য সাহাবিরা চাচ্ছিলেন দ্রুত কিসাস কার্যকর করতে। তালহা রা. এই দাবি নিয়ে একাধিকবার আলি রা.-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। আলি রা. বলেন, 'আমি এই সংকট নিয়ে চিন্তা করছি। শীঘ্রই

---

৩৫৫. পরে মুআবিয়া রা. তাদের অবস্থান সম্পর্কে জেনে গেলে তাদের বন্দি করে হত্যা করেন। *মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা*, ৩৭৬৯১। *মিনহাজুস সুন্নাহ*, ২/২৯৬

৩৫৬. উদাহরণস্বরূপ ২০২০ সালের কথা মনে করা যেতে পারে। এ বছর করোনার কারণে মসজিদে জামাতে লোকসংখ্যা সীমিত করা হয়। যেহেতু মহামারির এই রূপটি ছিল নতুন, ফলে আলেমদের মধ্যে এই মাসআলায় ইখতিলাফ দেখা দেয়। তাদের কেউ জামাতে লো' চসমাগম বন্ধের পক্ষে ছিলেন, কেউ বিরুদ্ধে ছিলেন।

তোমরা এর ফলাফল দেখবে। কিসাসের বিষয়টি এখনই আলোচনায় আনা হলে মানুষ তিন ভাগে ভাগ হবে। একদল পক্ষ নেবে, আরেকদল সমালোচনা করবে, আরেকদল কোনো পক্ষেই যাবে না। মানুষকে শান্ত হতে দাও। তাদের মন আগে স্থির হোক।'[৩৫৭]

আলি রা.-এর এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, তিনি আগে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে চাচ্ছিলেন এবং নতুন কোনো বিতর্কে জড়াতে চাচ্ছিলেন না। তিনি চাচ্ছিলেন, সাধারণ বিদ্রোহীদের মূলধারায় ফিরিয়ে এনে স্বাভাবিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত করতে। এতে সমাজে বিশৃঙ্খলা ও অপরাধের মাত্রা কমে যাবে। কিন্তু আলি রা.-এর সামনে সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল শামবাসীর বাইআত। তাদের কাছে বাইআতের আহ্বান পাঠানো হলেও তারা প্রত্যাখ্যান করে। তাদের একদাবি, 'উসমান রা.-এর কিসাস চাই।' এ সময় সাবায়িরা আবার নতুন খেল খেলে। তারা উসমান রা.-এর রক্তমাখা জামা নিয়ে দামেশকে চলে যায় এবং নানা বিভ্রান্তিকর কথা বলে আলি রা.-এর বিরুদ্ধে লোকজনকে খেপিয়ে তোলে। কিছু কিছু মানুষ তো আলি রা.-কেই এই হত্যার জন্য দায়ী করতে থাকেন। আলি রা.-বিরোধী প্রচারণা তুঙ্গে ওঠে। পুরো শাম উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তাদের সবার মুখে এককথা, 'উসমান হত্যার কিসাস গ্রহণের আগে কোনো বাইআত হবে না।'

আলি রা. বাইআতের জন্য শামে যে দূত পাঠিয়েছিলেন, সে ফিরে এসে জানায়, 'আমি সেখানে ৬০ হাজার মানুষ দেখেছি যারা উসমান রা.-এর রক্তমাখা কাপড় নিয়ে ক্রন্দন করছে। তারা শহিদের রক্তের বদলা দাবি করছে।'[৩৫৮]

আয়েশা রা.-এর সিদ্ধান্ত

উসমান রা.-এর হত্যার সময় আয়েশা রা. অবস্থান করছিলেন মক্কায়, হজের সফরে। হজ থেকে মদিনায় ফেরার সময় তিনি উসমান রা.-এর শাহাদাতের সংবাদ পান। হত্যার সংবাদ শুনে তিনি আর মদিনা ফেরেননি। মক্কাতেই ফিরে যান এবং সেখানে অবস্থান করতে থাকেন। চার মাস পর মদিনা থেকে তালহা ও যুবাইর রা. এসে তার সাথে পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। এ সময় তারা প্রত্যেকেই ছিলেন উসমান রা.-এর খুনে শোকাহত। আয়েশা রা. বলেন, 'উসমান রা.-কে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে। আল্লাহর কসম, আমি তার হত্যার প্রতিশোধ নেব।'[৩৫৯] তালহা রা. বলেন, 'উসমান রা.-এর বিষয়ে আমার ভুল হয়েছে। তাঁর

---

৩৫৭. *তারিখুত তবারি*, ৪/৪৩৭
৩৫৮. *তারিখুত তবারি*, ৪/৪৪৩
৩৫৯. *তারিখুত তবারি*, ৪/৪৮৫

রক্তের বদলায় আমার রক্ত ঝরানো ছাড়া এই ভুলের কোনো প্রায়শ্চিত্ত নেই।'[৩৬০] যুবাইর রা. বলেন, 'আমরা জনগণকে উৎসাহ দেবো, যেন তারা উসমান রা.-এর রক্তের বদলা নিতে প্রস্তুত হয়। যদি খুনিদের শাস্তি দিয়ে অপরাধের এই পথ চিরতরে বন্ধ করা না হয়, তাহলে পরবর্তী সকল খলিফাই এ ধরনের হত্যাকাণ্ডের শিকার হবেন।'[৩৬১]

আয়েশা রা. ও এই দুই সাহাবি আলি রা.-এর বাইআতকে বৈধ মনে করলেও খুনিদের বিচারপ্রক্রিয়া নিয়ে তাদের তীব্র দ্বিমত ছিল। তাদের বক্তব্য ছিল, বিচারে দেরি করা মানে খুনিদের ফসকে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া। খুনিদের বিচারের দাবি নিয়ে আয়েশা রা. জনগণের উদ্দেশে বক্তব্য দেন। মসজিদুল হারামের প্রাঙ্গণে পর্দা টানিয়ে তিনি বক্তব্য দেন। সেখানে তিনি বলেন, 'উসমান রা.-এর বিরুদ্ধে তারা আর কোনো বাহানা খুঁজে পায়নি, তাই তারা জুলুমের পথ বেছে নিয়েছিল। তারা তাকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। মদিনার সম্মান লুণ্ঠন করেছে। লুটপাট করেছে। জিলহজ মাসের পবিত্রতাকে নষ্ট করেছে। আল্লাহর কসম, এদের মতো এক পৃথিবী মানুষের চেয়ে উসমান রা.-এর একটি আঙুলের দাম বেশি। মুক্তির পথ কেবল একটাই। এদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এদেরকে অন্যদের জন্য শিক্ষণীয় দৃষ্টান্তে পরিণত করা।'[৩৬২]

আয়েশা রা.-এর বক্তব্যে মক্কার মানুষরাও একমত হয়। তারা তাঁর পাশে থাকার অঙ্গীকার করে। মূলত আয়েশা রা. ছিলেন এই আন্দোলনের পুরোধা। তাঁর পাশে ছিলেন তালহা রা. ও যুবাইর রা.। তারা তিনজন সিদ্ধান্ত নেন, কুফা ও বসরা যাবেন এবং সেখানে সমমনাদের নিয়ে খুনি ও বিদ্রোহী চক্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামবেন। মূলত এটি ছিল খুবই জটিল একটি প্রক্রিয়া। একদিকে তাঁরা আলি রা.-এর বাইআত মানতেন, এবং অন্যদেরকেও বাইআত হতে বলতেন,[৩৬৩] কিন্তু অপরদিকে তাঁরা আলি রা.-এর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করছিলেন। এতে সম্ভাবনা ছিল তাঁরা আলি রা.-এর সাথে সংঘাতপূর্ণ অবস্থানের দিকে চলে যাবেন। এই সম্ভাবনা তাঁদের জানা ছিল, কিন্তু তারা আর অপেক্ষাও করতে পারছিলেন না। তাই তারা সিদ্ধান্ত নেন, সর্বোচ্চ সতর্ক থেকে কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

---

৩৬০. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১/৩৪। মূলত তিনি বোঝাতে চাচ্ছিলেন, উসমান রা.-এর নিরাপত্তা দিতে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন, তাই এখন খুনিদের বিচার কার্যকর করা তার দায়িত্ব।

৩৬১. *তারিখুত তবারি*, ৪/৪৮৭

৩৬২. প্রাগুক্ত, ৪/৪৪৮

৩৬৩. বসরার গভর্নর আহনাফ ইবনু কাইস এই তিনজনের সাথে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞেস করেন, 'কার হাতে বাইআত নেব?' তিনজনই জবাব দেন, 'আলি রা.-এর হাতে বাইআত হও!' *মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা*, ৩০৬২৯

সাহাবিদের মধ্যে সাইদ ইবনুল আস[৩৬৪], ওলিদ ইবনু উকবা, ইয়ালা ইবনু উমাইয়া[৩৬৫] ও আবদুল্লাহ ইবনে আমের[৩৬৬] এই সিদ্ধান্তে একাত্মতা পোষণ করেন। প্রায় ৬০০ মানুষ আয়েশা রা.-এর দলে যোগ দেয়। ৬০০ সদস্যের এই দলটি যখন মক্কা থেকে ইরাকের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে, তখন মক্কার লোকদের কান্নায় আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠেছিল। পরে এই দিনকে নামকরণ করা হয় ইয়াওমুন নাহিব বা কান্নার দিন বলে। মূলত এই অভিযানে যারা অংশ নিয়েছিলেন, তাদের সামনে ছিল এক অনিশ্চিত গন্তব্য, যেখানে পথের শেষে কী আছে তা কারওই জানা ছিল না। তাদের উদ্দেশ্য ছিল উসমানহত্যার বদলা নেওয়া, সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ বাস্তবায়ন করা। তারা চাচ্ছিলেন খুনিচক্রকে থামাতে, যেন ভবিষ্যতে আর কখনো তারা ফণা তুলতে না পারে। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে নিজের জীবন বিলিয়ে দিতেও তাদের পরোয়া ছিল না। তাদের স্বজনরাও জানতেন এই কথা। সেজন্যই বিদায়কালে সবার চোখ ভিজে উঠেছিল।

আলি রা. জেনে গেলেন আম্মাজান আয়েশা রা.-এর নেতৃত্বে একটি কাফেলা ইরাকের উদ্দেশে যাত্রা করেছে। তাদের উদ্দেশ্য বিদ্রোহে জড়িতদের শাস্তি দেওয়া। আলি রা. সিদ্ধান্ত নেন, এই বাহিনীকে পথেই থামাতে হবে। কিন্তু হাসান রা. ভিন্নমত দেন। তিনি বলেন, 'তাদেরকে থামানোর দরকার নেই উসমান রা.-এর খুনিদের সাথে তাঁদের বোঝাপড়া করতে দেওয়া হোক।'[৩৬৭] আবদুল্লাহ ইবনে সালামও এই মত দেন। কিন্তু আলি রা. স্থির সিদ্ধান্তে চলে এসেছিলেন। তিনি দ্রুত নিজের লোকজন নিয়ে মদিনা থেকে বের হন, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মাঝপথেই মক্কার কাফেলাকে আটকে দেওয়া। কিন্তু তিনি জানতে পারেন, মক্কার কাফেলা আরও আগেই চলে গেছে। ফলে তিনি সিদ্ধান্ত নেন তাদের পিছু নেবেন।[৩৬৮]

বসরায় মক্কার কাফেলা

৩৬ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসের শেষদিকে মক্কার কাফেলা বসরা পৌঁছে। এ সময় তারা অতিক্রম করেছিল প্রায় ১২৩৪ কিলোমিটার পথ। দীর্ঘ সফরে সবার মধ্যেই এক ধরনের ক্লান্তি ছিল। বসরার নিকটবর্তী খফির নামক এলাকায় শিবির স্থাপন করা হয়। ২৬ দিন এখানে অবস্থান করে নানা বিষয়ে পরামর্শ ও পর্যালোচনা করা হয়। এ সময় আয়েশা রা.-এর পক্ষ থেকে বসরার গণ্যমান্য লোকদের কাছে

---

৩৬৪. তিনি ছিলেন তখন মক্কার গভর্নর।
৩৬৫. ইয়ামানের সাবেক গভর্নর।
৩৬৬. বসরার সাবেক গভর্নর।
৩৬৭. *তারিখুত তবারি*, ৪/৪৫৬
৩৬৮. *তারিখুত তবারি*, ৪/৪৫৯

চিঠি পাঠিয়ে নিজেদের উদ্দেশ্য পরিষ্কার করা হয়, যেন পরে আর ভুল বোঝাবুঝি না হয়। বসরার গভর্নর উসমান ইবনু হুনাইফ কয়েকজন সাথিসহ আম্মাজানের সাথে এসে দেখা করেন। আয়েশা রা. এ সময় বলেন, 'আমার মতো নারী কোনো গোপন উদ্দেশ্য নিয়ে এত দীর্ঘ সফর করে না। নিজের সন্তানদের কাছে বাস্তবতা লুকানো যায় না। বিভ্রান্ত লোকেরা মদিনাতুর রাসুল আক্রমণ করেছে। সেখানে লুটপাট করেছে। উসমান রা.-কে শহিদ করেছে। মানুষের বাড়িঘর দখল করেছে। নিরাপত্তা বলতে কিছু নেই। তাই আমি উঠে দাঁড়িয়েছি। সুতরাং আমরা এসব সংশোধনের জন্য এসেছি। আমরা আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার বাস্তবায়ন করতে চাই।'[৩৬৯]

গভর্নর এ সময় তাদেরকে আলি রা.-এর বাইআতের কথা মনে করিয়ে দিলে তালহা ও যুবাইর রা. বলেন, 'তিনি যদি আমাদের মাঝে ও হত্যাকারীদের মাঝে বাধা না হন, তাহলে আমরা তাঁর বাইআতের ওপর অটল থাকব।'[৩৭০]

এদিকে শীর্ষ সাহাবিদের আগমনের সংবাদ শুনে দলে দলে লোকজন দেখা করতে আসে। যেখানে তাঁবু খাটানো হয়েছিল সেই স্থানটি লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না সেখানে। তালহা ও যুবাইর রা. জনগণের সামনে আবেগঘন কণ্ঠে বক্তব্য রাখেন। তাঁরা বারবার তাঁদের আগমনের উদ্দেশ্য পরিষ্কার করেন। তাঁরা বলেন, 'মজলুম খলিফার কিসাস গ্রহণ করা আল্লাহর নির্ধারিত হদের অন্তর্ভুক্ত। হদ কায়েম করার মাধ্যমে সমাজ থেকে অপরাধ ও বিশৃঙ্খলা দূর হবে। হদ কায়েম না করলে শক্তি ও নেতৃত্ব ধ্বংস হয়ে যাবে। প্রশাসনিক কোনো শৃঙ্খলাই আর টিকবে না।'[৩৭১]

আয়েশা রা. তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'আমাদের করণীয় একটাই। উসমান রা.-এর হত্যাকারীদের গ্রেফতার করে তাদের ওপর কুরআনের বিধান প্রয়োগ করা।'

এসব বক্তব্যের ফলে বসরাবাসীর বড় অংশ তাদের সাহায্যে প্রস্তুত হয়ে যায়। তারাও উসমান রা.-এর হত্যাকারীদের শাস্তি দেওয়ার শপথ নেয়। বলতে গেলে পুরো শহরেই এই আবেগ সঞ্চারিত হয়, এমনকি জনগণের ওপর থেকে শহরের গভর্নর উসমান ইবনু হুনাইফের নিয়ন্ত্রণ ছুটে যায়। তবে সাবায়িদের একটি দল গভর্নরের সাথে থেকে যায়। তাদের ভয় ছিল, আয়েশা রা.-এর অভিযান সফল হলে তারা পাকড়াও হবে। তাই তারা চাচ্ছিল যেকোনোমূল্যে এই অভিযান

---

৩৬৯. *তারিখুত তবারি*, ৪/৪৬১

৩৭০. এ থেকে বোঝা যায়, 'তাঁরা আলি রা.-এর খেলাফতকে অস্বীকার করেননি। বরং তাঁর একটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিলেন।'

৩৭১. *তারিখুত তবারি*, ৪/৪৬২

ঠেকাতে। এই লোকেরা যুক্তি দিচ্ছিল আলি রা.-এর বাইআত নেওয়ার পর তাঁর বিরোধিতা করার অধিকার নেই কারও। সাবায়িদের এই দলটি উম্মুল মুমিনিনের শানেও বাজে কথা বলছিল। তারা নিজেদেরকে আলি রা.-এর পক্ষের লোক বলে নিজেদের ভণ্ডামি আড়াল করতে চাইছিল। সাবায়িদের অন্যতম নেতা হুকাইম ইবনু জাবালা লোকজন জড়ো করে মক্কার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়।[৩৭২]

হুকাইম ইবনু জাবালার শয়তানি পরিকল্পনার কারণে ৩৬ হিজরির ২৪ ও ২৫ রবিউস সানিতে মক্কার বাহিনীর সাথে বসরার বিদ্রোহীদের লড়াই হয়। বিদ্রোহীদের প্রায় সবাই এই যুদ্ধে অংশ নেয়। তাদের সাথে হাত মেলায় আবদুল কাইস ও রবিয়া গোত্রের মূর্খ লোকজন, যারা কেবল গোত্রপ্রীতির কারণে তাদের সাহায্য করছিল। বিনা উস্কানিতে এই যুদ্ধ শুরু করে বিদ্রোহীরা। আয়েশা রা. পরে কুফার জনগণের উদ্দেশে লিখিত এক পত্রে বলেন, 'তখনও রাতের আঁধার কাটেনি, এর মধ্যে হামলা করে বসে বিদ্রোহীরা। তারা চাচ্ছিল আমাকে ও আমার সাথিদের হত্যা করতে। তাদের সাথে একজন পথপ্রদর্শক ছিল, যে আমার অবস্থান দেখিয়ে দিচ্ছিল তাদের। কিন্তু আমাদের সাথিরা লড়াই শুরু করলে যুদ্ধের চাকা উল্টো ঘুরতে শুরু করে। মুসলিমরা শত্রুদের ঘেরাও করে হত্যা করতে থাকে।'[৩৭৩]

দুদিনের এই যুদ্ধে হুকাইমসহ বিদ্রোহীদের বড় অংশ নিহত হয়। অনেকে পালিয়ে যায়। নিরীহ অনেকে প্রাণভিক্ষা চাইলে তা গ্রহণ করা হয়। সিদ্ধান্ত হয় অপরাধীদের ওপর হদ কায়েম করা হবে। উসমানহত্যার বিচার নিশ্চিত করা হবে, এতে কেউ বাধা দেবে না। সাবায়িদের অনেকে শহরের বিভিন্ন এলাকায় আত্মগোপন করে ছিল। ঘোষণা করে দেওয়া হয়, এদের সবাইকে তালহা রা.-এর হাতে তুলে দিতে হবে। প্রসিদ্ধ সাবায়িদের নাম লিখে কাগজ ছড়িয়ে দেওয়া হয় শহরে। ফলে বেশ কজন অপরাধী ধরা পড়ে। তাদেরকে কুকুরের মতো টেনে আনা হয়। উসমান রা.-কে হত্যার অপরাধে তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

এই বিজয়ের ফলে মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি নেমে আসে। বিভিন্ন এলাকায় লিখিত পত্রে তালহা ও যুবাইর রা. জানান, 'অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত করা হয়েছে। বিদ্রোহীদের নেতাদের মধ্যে হুরকুস ইবনু জুহাইর ছাড়া আর কেউ বাঁচতে পারেনি।' লিখিত পত্রে তাঁরা বলেন, 'হুরকুস ইবনু জুহাইর থেকেও আল্লাহ প্রতিশোধ নেবেন। দয়া করে আপনারা জাগ্রত হোন। অন্তত আল্লাহর সামনে

---

৩৭২. *তারিখুত তবারি*, ৪/৪৬৬

৩৭৩. *তারিখুত তবারি*, ৪/৪৭৪

দাঁড়ালে ক্ষমার একটা অসিলা যেন পাওয়া যায়। আমরা তো আমাদের দায়িত্ব পালন করেছি।'[৩৭৪]

কুফায় আলি রা.

৭৬০ জন সঙ্গী নিয়ে কুফায় পৌঁছুলেন আলি রা.। শহরের বাইরে তাকে অভ্যর্থনা জানালেন ৪ হাজার ফকিহ, যাদের অনেকে ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের ছাত্র।[৩৭৫] আলি রা. কুফায় এসেছিলেন দুই কারণে। প্রথমত, এই শহরকে তিনি রাজধানী বানাতে চাচ্ছিলেন। দ্বিতীয়ত, মক্কি বাহিনীর অভিযান নিয়ে তাঁর দ্বিমত ছিল। তাঁর ধারণা ছিল, তিনি এখানে সশরীরে উপস্থিত না হলে শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে যাবে।

কুফায় প্রবেশ করে আলি রা. শহরের জামে মসজিদে যান। তিনি মিম্বরে বসেন, এ সময় তাঁর পাশে ছিলেন আম্মার ইবনে ইয়াসির রা.। এ সময় মক্কার বাহিনী নিয়ে কথা ওঠে। কেউ প্রতিবাদ জানায়, কেউ সম্মতি দেয়। সেখানে দুটি পক্ষ হয়ে যায়। উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় শুরু হলে কাকা ইবনু আমর বলেন, 'সরকারের কাজ হলো শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করবে, জালিমকে প্রতিহত করে মজলুমকে বাঁচাবে। আলি রা. এই দায়িত্ব পালনের জন্যই নিযুক্ত হয়েছেন। তাঁর আহ্বান ন্যায়ের আহ্বান। তিনি সংশোধনের দাওয়াত দিচ্ছেন। তাই এ বিষয়ে সতর্কতা ও দূরদৃষ্টি নিয়ে সামনে এগোতে হবে।'

আম্মার ইবনু ইয়াসির রা. চলমান পরিস্থিতি নিয়ে বলেন, 'আমাদের সকলের মা আয়েশা রা. বসরায় উপস্থিত হয়েছেন। আল্লাহর কসম, তিনি দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর নবির সহধর্মিণী। কিন্তু এখন আল্লাহ তোমাদের পরীক্ষা নিচ্ছেন এই সংকটে তোমরা খলিফা আলি রা.-এর আনুগত্য করো, নাকি তাঁর আনুগত্য করো।'[৩৭৬] মূলত আম্মার ইবনু ইয়াসির রা. একদিকে আম্মাজানের সম্মান রক্ষা করছিলেন, অপরদিকে আলি রা.-এর আনুগত্যের দিকে আহ্বান করছিলেন। তিনি একে ইজতিহাদি বিষয় ও আল্লাহর পরীক্ষা বলে অভিহিত করেন। যেন লোকেরা বুঝতে পারে, তারা শরয়ি কানুন অনুসারে চলবে নাকি নিজেদের আবেগ অনুসারে চলবে। উপস্থিত এক ব্যক্তি উম্মুল মুমিনিনকে নিয়ে বাজে মন্তব্য করলে তিনি বলেন, 'দূর হ এখান থেকে! খবিশ কোথাকার! তুই আল্লাহর নবির স্ত্রীকে কষ্ট দিচ্ছিস!'[৩৭৭]

---

৩৭৪. *তারিখুত তবারি*, ৪/৪৭৪
৩৭৫. *আল-মাবসুত*, ১৬/৬৮
৩৭৬. *সহিহ বুখারি*, ৭১০০
৩৭৭. *তিরমিযি*, ৩৮৮৮। হাদিসের সনদ সহিহ।

এসব বক্তব্যের ফলে কুফার প্রায় ৯ হাজার মানুষ আলি রা.-এর পক্ষে বাইআত হয়। বাইআত শেষে আলি রা. বলেন, 'হে কুফাবাসী, এবার চলো আমাদের বসরার ভাইদের কাছে যাওয়া যাক। আমরা চাই তারা শুধু আপন অবস্থান থেকে ফিরে আসুক। যদি তারা না মানে তাহলেও আমরা তাদের সাথে ভদ্র ও নম্র ব্যবহার করব। শরিয়তের গণ্ডিতে থেকেই আমরা সমাধানের চেষ্টা চালাব।'[৩৭৮]

আলি রা. সিদ্ধান্ত নেন, তালহা ও যুবাইর রা.-এর সাথে আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টির সুরাহা করতে হবে। তিনি বুঝতে পারছিলেন, দ্রুত বিষয়টির সমাধান করা না গেলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে। কাকা ইবনু আমরকে তিনি দূত হিসেবে তালহা ও যুবাইর রা.-এর কাছে পাঠান। বিদায়ের সময় তাঁকে বলেন, 'ভালোবাসা ও ঐক্যের দিকে ডাকবে। বিচ্ছিন্নতার ক্ষতি সম্পর্কে তাদের সচেতন করবে।'

কাকা ইবনু আমর প্রথমে আয়েশা রা.-এর কাছে যান। তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, 'আম্মাজান, আপনি কী উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন?' আয়েশা রা. বলেন, 'হে সন্তান, আমি এখানে এসেছি জনগণের সংশোধন ও পথপ্রদর্শন করতে।' কাকা ইবনু আমর তাঁর কথায় সম্মতি দেন।' এরপর তিনি বলেন, 'তালহা ও যুবাইর রা.-কেও উপস্থিত করতে।' তাঁরা উপস্থিত হলে তিনি বলেন, 'আম্মাজান বলেছেন, আপনারা এখানে এসেছেন জনগণের সংশোধন করতে। এই কথায় আপনারা একমত নাকি দ্বিমত পোষণ করেন?'

তাঁরা দুজনই বললেন, 'আমরা একমত।' কাকা ইবনু আমর বলেন, 'তাহলে জনগণের সংশোধনের উপায় কী হতে পারে?' তাঁরা বলেন, 'উসমান রা.-এর হত্যাকারীদের আটক করা। এই ঘটনাকে এড়িয়ে যাওয়া মানে কুরআনকে বর্জন করা। এর বিচার বাস্তবায়ন করা মানে কুরআনের বিধান জিন্দা করা।'

কাকা ইবনু আমর বলেন, 'বসরায় উসমান রা.-এর হত্যাকারীদের আপনারা হত্যা করেছেন। তাদের ৬০০ জনকে আপনারা মেরেছেন। পরিণামে ৬ হাজার লোক আপনাদের ত্যাগ করেছে। জান নিয়ে পালানো একমাত্র বিদ্রোহী নেতা হুরকুস ইবনু জুহাইরের পতাকার নিচে এখন ৬ হাজার মানুষ একত্র হয়েছে। এখন যদি তাকে আপনারা এড়িয়ে যান, তাহলে আপনারাও তো বিদ্রোহীদের শাস্তি দেওয়া এড়ালেন। আবার যদি তার সাথিদের সাথেও লড়াই করেন, তাহলে জাতিকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিলেন।'

---

৩৭৮. *তারিখুত তবারি*, ৪/৪৮৭

কাকা ইবনু আমরের বক্তব্যে ছিল এমন এক তিক্ত সত্যের উপস্থাপন, যার বাস্তবতা সম্পর্কে তাঁরা তিনজনই সচেতন ছিলেন। আয়েশা রা. বলেন, 'তাহলে আপনিই বলুন এখন কী করা যায়?'

কাকা ইবনু আমর বলেন, 'আমার মতে পরিস্থিতি শান্ত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হোক। অবস্থা স্বাভাবিক হলে এমনিতেই ফেতনাবাজদের মাঝে কোন্দল শুরু হবে। তখন উসমান রা.-এর কিসাস নেওয়া যাবে। আপনারা যদি একমত না হন, তাহলে উসমান রা.-এর ত্যাগ বৃথা যাবে।'

উম্মুল মুমিনিন ও অপর দুই সাহাবি বলেন, 'যদি আলি রা.-ও এই বিষয়ে একমত হন, তাহলে বিষয়টির সমাধান হয়ে যাবে।' কাকা ইবনু আমর ফিরে গিয়ে আলি রা.-কে তাদের বক্তব্য জানালে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল, সংকট সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া গেছে।[৩৭৯]

কাকা ইবনু আমর ফেরার পর আলি রা. আবার কুফার জামে মসজিদে বক্তব্য রাখলেন। তিনি বললেন, 'এতদিন যা হয়েছে তার দায় দুনিয়ালোভীদের। তারা আল্লাহর বান্দাদের হিংসা করে। খোদাপ্রদত্ত মর্যাদাকে তারা অস্বীকার করে। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আগামীকাল আমি বসরাবাসীদের কাছে যাব। তোমরাও আমার সাথে চলো, তবে উসমান রা.-এর হত্যাকাণ্ডে শরিক ছিল কিংবা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল এমন কেউ আমার সাথে যাবে না। এসব মূর্খ যেন আমাকে তাদের থেকে পৃথক মনে করে।'

আলি রা.-এর ঘোষণা একদিকে নেককারদের আনন্দিত করল, অপরদিকে সাবায়ি শিবিরে নেমে এলো শোকের ছায়া।

নতুন ষড়যন্ত্র

আলি রা. নিজের অবস্থান পরিষ্কার করেছেন। স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, তার শিবিরে সাবায়ি বা তাদের সমর্থকদের ঠাঁই নেই। বিষয়টি সাবায়িদের চিন্তায় ফেলে দেয়। তারা বুঝতে পারে, তাদের পায়ের নিচের মাটি সরে যাচ্ছে। দ্রুত কোনো ব্যবস্থা নিতে না পারলে তাদের অবস্থা হবে বসরার বিদ্রোহীদের মতোই করুণ। আবদুল্লাহ ইবনে সাবা তখনও কুফায় অবস্থান করছিল। সে নিজের অনুসারীদের নিয়ে বৈঠকে বসে। তারা বর্তমান পরিস্থিতিতে করণীয় নিয়ে আলোচনা করতে থাকে। ইবনে সাবা বলে, 'পরিস্থিতি খুব নাজুক। এখন চাইলেও আলিকে হত্যা করা যাবে না। তাহলে আমাদের সবাইকে হত্যা করা হবে। আমরা এখানে মাত্র

---

৩৭৯. *তারিখুত তবারি*, ৪/৪৯৩

আড়াই হাজার। এই শক্তি নিয়ে তাদের সাথে কুলিয়ে উঠতে পারব না। তালহা ও জুবাইরের সাথেই আছে ৫ হাজার সেনা। তাদেরও উদ্দেশ্য আমাদের হত্যা করা। তাদের সাথেও আমরা যুদ্ধে পারব না। আমরা চাইলে দূরে কোথাও যেতে পারব না। লোকে আমাদের খুঁজে বের করে হত্যা করবে। আমাদের সামনে সমাধান একটাই। জনগণের সাথে মিশে গিয়ে তাদের ওপর আঘাত হানা। অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও লড়াই লাগিয়ে দেওয়া। তরবারির মাধ্যমেই সবকিছুর মীমাংসা করে ফেলা। তোমরা জনগণের সাথে মিশে যাও। তাদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে দাও। এমনভাবে কাজ করবে, তারা যেন বিবেচনাবোধ হারিয়ে ফেলে। তারা যেন চিন্তাভাবনার সময় না পায়। সবাইকে যুদ্ধে জড়িয়ে দিলে আলি, তালহা ও জুবাইরের পক্ষে আমাদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া আর সম্ভব হবে না।'[৩৮০]

সিদ্ধান্তমতো সাবায়িরা দ্রুত দুই শিবিরেই মিশে গেল। মূলত তারা কোনো পক্ষেই ছিল না, কিন্তু তারা দুপক্ষেই অবস্থান করে নিজেদের উদ্দেশ্য সাধন করতে চাচ্ছিল। তালহা রা. নিজের শিবিরে এ ধরনের অনাহুত লোকজনের অবস্থান ও আচরণ টের পান। তিনি বলে বসেন, 'আফসোস, এরা দেখি লোভী মাছির মতো। এরা তো আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়া পতঙ্গের মতো।'[৩৮১]

বসরার উদ্দেশে আলি রা.

কাকা ইবনু আমরের দূতিয়ালির কারণে দুপক্ষের মাঝে সমঝোতার সম্ভাবনা দেখা দেয়। তবে তখনও নিয়মতান্ত্রিক সন্ধি হয়নি এবং বিষয়টি নিয়ে আরও আলোচনার অবকাশ ছিল। বিষয়টি নিষ্পত্তি করার জন্য আলি রা. কুফার উদ্দেশে রওনা হন। জুমাদাল আখিরার শুরুর দিকে তিনি বসরায় উপস্থিত হন। বিশুদ্ধ বর্ণনামতে, এ সময় তার সাথে ৯৭০০ মানুষ ছিলেন।[৩৮২]

বসরা এসে মক্কার বাহিনীর সাথে আলি রা. মুখোমুখি হন। প্রথমে তার সাথে যুবাইর রা.-এর সাক্ষাৎ হয়। এ সময় তিনি যুবাইর রা.-কে নবিজির হাদিস মনে করিয়ে দেন, যেখানে নবিজি বলেছিলেন, 'একদিন তুমি হকের বিপরীতে আলির মুখোমুখি হবে।' যুবাইর রা. এই হাদিস মনে পড়তেই সতর্ক হয়ে যান। তিনি কসম

---

৩৮০. ঘটনাটির সনদ কিছুটা দুর্বল। দেখুন, *তারিখুত তবারি*, ৪/৪৯৩

৩৮১. *তারিখু খলিফা ইবনি খইয়াত*, ১৮২

৩৮২. *তারিখুত তবারি*, ৪/৫০৫। বর্ণনার মান হাসান। এটি বর্ণনা করেছেন আলি রা.-এর ছেলে মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়্যা। কিছু কিছু বর্ণনায় সংখ্যা আরও বাড়িয়ে বলা হয়েছে যা অতিরঞ্জিত।

করে বলেন, 'তিনি এই আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়াবেন এবং এখান থেকে চলে যাবেন।'[৩৮৩]

আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর পিতাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, 'আপনি তো এখানে আলি রা.-এর সাথে যুদ্ধ করতে আসেননি। আপনি এখানে এসেছেন সংস্কার করতে। সুতরাং আপনি এখানেই থাকুন। হতে পারে আল্লাহ আপনার মাধ্যমে দু দলকে একত্র করবেন ' যুবাইর রা. বলেন, 'আল্লাহর কসম, আমি তাদের মোকাবিলা করব না।' তবে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরের পরামর্শে তিনি কসমের কাফফারা হিসেবে একটি গোলাম আজাদ করে দেন এবং সেখানে অবস্থান করতে থাকেন। মূলত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর চাচ্ছিলেন, তার বাবার উপস্থিতিতেই যেন দুপক্ষের মধ্যকার বিবাদ নিষ্পত্তি হয়।

আয়েশা রা.-এর বাহিনী ও আলি রা.-এর বাহিনী মুখোমুখি অবস্থান নেয়। দুই শিবিরের মাঝে দূরত্ব ছিল সামান্যই। যেহেতু দুদিকেই ছিলেন মুসলমানগণ এবং অনেকের মাঝে পূর্বপরিচয় ও ঘনিষ্ঠতাও ছিল, তাই তারা নির্বিঘ্নে একে অপরের শিবিরে আসা-যাওয়া করতেন এবং খোশগল্পে মেতে উঠতেন।

আলি রা. চাইছিলেন দ্রুত স্বাভাবিক সম্পর্ক ফিরিয়ে আনতে। আড়ষ্টভাব দূর করতে। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-কে পাঠালেন আয়েশা রা.-এর শিবিরে। ইবনে আব্বাস এসে তালহা রা. ও যুবাইর রা.-কে প্রশ্ন করলেন, 'আপনারা কি কোনো কারণে আলি রা.-এর খেলাফতে অসন্তুষ্ট? যেমন বেতন-ভাতার হক নষ্ট করা বা অন্য কোনো অভিযোগ আছে কি না আপনাদের?' তারা দুজনেই জবাব দিলেন, 'না, এমন কিছুই নয়।'[৩৮৪]

দুই শিবিরের মাঝখানে একটি তাঁবু স্থাপন করা হয়, যেখানে তালহা রা., যুবাইর রা. ও আলি রা. লাগাতার তিনদিন সাক্ষাৎ করেন এবং নানা বিষয়ে আলোচনা করেন। তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন, উভয় বাহিনীর মধ্যে কোনো যুদ্ধ হবে না। পরামর্শের মাধ্যমে গৃহীত দায়িত্বগুলো সবাই পালন করতে থাকবে।[৩৮৫]

বাহ্যত মনে হচ্ছিল সবকিছুর সুন্দর সমাপ্তি ঘটতে চলেছে। কিন্তু সাবায়িরা বসে ছিল না। তারা ততদিনে তাদের চাল চেলে দিয়েছে। যেহেতু উভয় শিবিরে প্রবেশে কোনো বিধিনিষেধ ছিল না, সাবায়িরা তাই দুই শিবিরেই ঢুকে পড়ে এবং উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় থাকে।

---

৩৮৩. *আল-মুসতাদরাক আলাস সহিহাইন*, ৫৫৭৪
৩৮৪. *ফাজায়িলুস সাহাবা*, ১০১৫। সনদের মান হাসান।
৩৮৫. *মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা*, ৭৭৭৭

জংগে জামাল—উটের যুদ্ধ

দুপক্ষ থেকেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে এসেছিল, যুদ্ধের কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। কিন্তু ৩৬ হিজরির ১০ জমাদিউল আখিরে দুই পক্ষের মাঝে যুদ্ধ বেধে গেল। দুপক্ষের কেউই যুদ্ধের নির্দেশ দেননি, এর জন্য কোনো প্রস্তুতিও নেননি। তাহলে এর শুরুটা হলো কীভাবে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণমতে, এ দিন আচমকা দুই শিবির থেকেই বেশ কিছু লোক বের হয়ে আসে এবং একে অপরকে বকাঝকা করতে থাকে। এক পর্যায়ে তারা বিপক্ষ শিবির লক্ষ্য করে তির বর্ষণ শুরু করে। উভয় শিবিরের দাস শ্রেণির লোকেরা আচমকাই যুদ্ধে জড়িয়ে যায়। তারা অজানা আক্রোশে একে অপরের ওপর হামলে পড়ে।[৩৮৬] শুরুর দিকে আলি রা. পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালান। তিনি নিজের সেনাদের যুদ্ধ থেকে বিরত রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা চালান। কিন্তু পরিস্থিতি কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছিল না। দুই শিবিরে লুকিয়ে থাকা সাবায়ি চক্র ক্রমেই উত্তেজিত করছিল সাধারণ নাগরিকদের। ফলে দুই শিবিরেই উত্তেজনা বাড়তে থাকে। যুদ্ধের পরিধিও ছড়িয়ে পড়ে।

আচমকা এই যুদ্ধ শুরু হওয়ায় দুই শিবিরের নেতারাই চমকে যান। আশপাশে থাকা সাবায়ি চক্র তাদেরকে ভুল তথ্যও সরবরাহ করে। যেমন তালহা রা.-কে বলা হয় আলি রা.-এর শিবির থেকে প্রথমে আক্রমণ করা হয়েছে। অপরদিকে আলি রা.-কে বলা হয়, তালহা রা.-এর শিবির থেকে প্রথমে হামলা হয়েছে।

আলি রা. মধ্যাহ্ন পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। এর মাঝে তিনি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার সব চেষ্টা চালান, কিন্তু কোনো লাভ হলো না। মধ্যাহ্নের পর তিনি নিজের সেনাদের যুদ্ধ করার অনুমতি দেন। আদেশ পাওয়ার পরপর শুরু হয় তীব্র যুদ্ধ।[৩৮৭]

ক্রমেই যুদ্ধ তুমুল আকার ধারণ করে। সাবায়ি চক্র ক্ষণে ক্ষণে স্থান পরিবর্তন করছিল। তারা জনসাধারণের মাঝে বিভ্রান্তি ও উত্তেজনা ছড়িয়ে দেয়। এদিকে যুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করলে যুবাইর রা. ময়দান ত্যাগ করেন। তিনি ছেলে আবদুল্লাহ

---

৩৮৬. *মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা*, ৭৭৫৭। এই বর্ণনাটি করেছেন প্রত্যক্ষদর্শী আসিম ইবনু কুলাইব। তিনি সেদিন আলি রা.-এর শিবিরে ছিলেন।

৩৮৭. *মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা*, ৭৭৭৭। এটি আলি রা.-এর শিবিরে অবস্থানকারী আবদু খাইরের বর্ণনা। তিনিও এই যুদ্ধে অংশ নেন।

ইবনে যুবাইরকে বলেন, 'আজকের এই যুদ্ধে নিহত সব লোক হয় জালিম হবে, নয় মজলুম হবে। আমার বিশ্বাস, মজলুম হিসেবে আমার মৃত্যু হবে। এ কথা বলে তিনি যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে চলে যান।'[৩৮৮]

এদিকে যুদ্ধ চলাকালে তালহা রা. তিরবিদ্ধ হন। আহত অবস্থায় তিনি এক আলাবি সেনার হাতে হাত রেখে বাইআত নবায়ন করেন। কিছুক্ষণ পরেই তার ইনতিকাল হয়।[৩৮৯] আলি রা. যখন শুনলেন তালহা রা. ইনতিকালের আগে বাইআত নবায়ন করেছেন, তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে তাকবির দিয়ে বললেন, 'নিশ্চয় আল্লাহর ইচ্ছা ছিল তিনি আমার হাতে বাইআতবদ্ধ অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবেন।'[৩৯০]

লড়াইয়ের ময়দানে উম্মুল মুমিনিন

এতক্ষণ উম্মুল মুমিনিন যুদ্ধের ময়দান থেকে একটু দূরে বসরার একটি গ্রামে অবস্থান করছিলেন। বসরার বিচারপতি কাব ইবনু সুওয়ার তাকে এই মর্মান্তিক যুদ্ধ সম্পর্কে অবগত করেন। কাব অনুরোধ করে বলেন, আপনি নিজেই ময়দানে এসে মুসলমানদের তরবারি কোষবদ্ধ করার নির্দেশ দিন। হয়তো আপনার উসিলায় আল্লাহ দু দলের মাঝে সন্ধি করে দেবেন।

উম্মুল মুমিনিন তো তার সন্তানদের নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। তিনি জানের পরোয়া না করে যুদ্ধের ময়দানে চলে এলেন। কাবকে বললেন, 'আপনি কুরআন হাতে অগ্রসর হন। মানুষদেরকে কুরআনের প্রতি আহ্বান করুন!' কাব ইবনে সুওয়ার কুরআনের একটি কপি নিয়ে ময়দানে নেমে আসেন। তিনি কুরআনের পাতা খুলে সবাইকে সন্ধি করতে আহ্বান জানান। এই প্রচেষ্টা সাবায়িদের পছন্দ হলো না। তারা তির নিক্ষেপ করে তাকে শহিদ করে দেয়। উম্মুল মুমিনিন তখন পর্দাবেষ্টিত একটি উটের ওপর বসে ছিলেন। তার নিরাপত্তার জন্য উটের হাওদার চারপাশে বর্ম লাগানো ছিল। সাবায়িদের স্পর্ধা এত বেড়ে যায় যে, তারা উম্মুল মুমিনিনের উট লক্ষ্য করে তির নিক্ষেপ করতে থাকে।

কিন্তু উম্মুল মুমিনিন নিজের নিরাপত্তার কথা চিন্তা না করে উম্মাহর অভ্যন্তরীণ এই কোন্দল থামাতে চাচ্ছিলেন। তিনি বিন্দুমাত্র না দমে চিৎকার করতে থাকেন, 'বাবারা থামো, আল্লাহকে ভয় করো। বিচারের দিনকে স্মরণ করো। যুদ্ধ থামাও!'

সাবায়িরা তাঁর কথায় কর্ণপাত করল না। মূর্খ জনতাও আগের মতোই যুদ্ধে ব্যস্ত রইল। বাধ্য হয়ে আয়েশা রা. দুহাত তুলে মুনাজাত করতে থাকেন। মুনাজাতে তিনি

---

৩৮৮. *তারিখুত তবারি*, ৪/৫৩৪

৩৮৯. ইনতিকালের সময় তার বয়স ছিল ৫৫ বা ৫৮ বছর। দেখুন, *ফাতহুল বারি*, ৭/৮২

৩৯০. *আল-ইতিকাদ*, ৩৭১

উসমান রা.-এর খুনি ও তাদের সাহায্যকারীদের বিরুদ্ধে বদদুআ করতে থাকেন। তার সাথিরা জোরে জোরে আমিন বলতে থাকেন। তাদের আমিনের উচ্চকিত শব্দ আলি রা.-ও শুনতে পান। তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'এটা কীসের শব্দ।' তাকে জানানো হয় উসমান রা.-এর খুনিদের বিরুদ্ধে উম্মুল মুমিনিন বদদুআ করছেন। তাদেরকে অভিশাপ দিচ্ছেন। এই কথা শুনে আলি রা.-ও উচ্চৈঃস্বরে বলতে থাকেন, 'হে আল্লাহ, উসমান রা.-এর খুনিদের ওপর আপনি আজাব পাঠান।'[৩৯১]

যুদ্ধ থামার কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছিল না। সবচেয়ে কঠিন যুদ্ধ চলছিল উম্মুল মুমিনিনের অবস্থানের পাশে। সাবায়ি ও বিদ্রোহীরা বারবার তাঁর ওপর হামলা করতে চাচ্ছিল। অপরদিকে সাহাবি ও তাবিয়িদের বড় একটি অংশ উম্মুল মুমিনিনকে রক্ষা করে চলেছিল। উম্মুল মুমিনিনকে নিরাপত্তা দিতে গিয়ে মুহাম্মদ ইবনু তালহা শহিদ হয়ে যান। আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইরও এখানে যুদ্ধ করছিলেন। বিদ্রোহীদের আঘাতে আঘাতে তিনি জর্জরিত হয়ে যান, তবু খালাকে[৩৯২] ছেড়ে সরেননি তিনি। তার শরীরে মোট ৩৫টি আঘাত লেগেছিল। তবু তিনি লড়াই চালিয়ে যান। উম্মুল মুমিনিনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ছিল তার একমাত্র চিন্তা। মারওয়ান ইবনুল হাকামও উম্মুল মুমিনিনের নিরাপত্তার জন্য লড়াই করে আহত হয়।[৩৯৩]

উম্মুল মুমিনিনকে নিরাপত্তা দিতে গিয়ে অন্তত ৭০ জন ব্যক্তি শাহাদাতবরণ করেন।[৩৯৪] যুদ্ধের তীব্রতা দেখে আলি রা. নিজেই চমকে যান। তিনি বারবার বলতে থাকেন, 'আজকের পর আর কোনো কল্যাণের আশা করা যেতে পারে?' হাসান রা. বললেন, 'এজন্য আমি আপনাকে আগেই নিষেধ করেছিলাম।'[৩৯৫]

কাকা ইবনু আমরের বুদ্ধিমত্তা ও যুদ্ধের সমাপ্তি

বাহ্যত যুদ্ধ থামার কোনো লক্ষণই ছিল না। আলি রা.-ও চিন্তা করে খুঁজে পাচ্ছিলেন না কী করে এই যুদ্ধ থামানো যায়। এ সময় কাকা ইবনু আমর পরামর্শ দেন, 'যেকোনো উপায়ে উম্মুল মুমিনিনের উট বসিয়ে দেওয়া হোক। কারণ বসরাবাসী এখনো তার নিরাপত্তার জন্য প্রাণ দিয়ে যাচ্ছে।' আলি রা. এই পরামর্শ পছন্দ করলেন। তিনি সম্মতি দিলে কাকা ইবনু আমর, বুহাইর ইবনু দুলজা নামে এক ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে উম্মুল মুমিনিনের উটের কাছে চলে যায়। কাকা ইবনু

---

৩৯১. *তারিখুত তবারি*, ৪/৫১৩
৩৯২. আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর ছিলেন আয়েশা রা.-এর বোন আসমা রা.-এর ছেলে।
৩৯৩. *তারিখুত তবারি*, ৪/৫৩০
৩৯৪. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ১০/৪৬৩
৩৯৫. *আল-মুসতাদরাক আলাস সহিহাইন*, ৫৫৭৮

আমর চিৎকার করে বলতে থাকেন, 'তোমাদেরকে নিরাপত্তা দেওয়া হলো।' এই কথা শুনে বসরাবাসী যুদ্ধ থামিয়ে দেয়। কাকা ইবনু আমর উম্মুল মুমিনিনের উটের কাছে গিয়ে বলে, 'হে মুমিনদের মা, উসমান হত্যার দিনে আপনি আমাকে বলেছিলেন, আলির আস্তিন চেপে ধরো। আল্লাহর কসম, এতে সামান্য রদবদলও হয়নি।' আয়েশা রা. কোনো জবাব না দিয়ে চুপ থাকেন।

কাকা ইবনু আমর নির্দেশ দেন উটকে বসিয়ে দিতে। উটের পা কেটে দেওয়া হয়। উট মাটিতে পড়ার আগেই হাওদা ধরে ফেলেন মুহাম্মদ ইবনু আবি বকর ও আবদুল্লাহ ইবনে বুদাইল। তারা উম্মুল মুমিনিনের হাওদা ধরে সসম্মানে আলি রা.-এর কাছে নিয়ে আসেন।[৩৯৬]

উম্মুল মুমিনিনের হাওদা আলি রা.-এর সামনে এলে তিনি পূর্ণ শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার সাথে উম্মুল মুমিনিনকে অভ্যর্থনা জানান। আয়েশা রা.-কে ভিন্ন একটি তাঁবুতে নেওয়া হয়। আলি রা. তার কুশলাদি জিজ্ঞেস করে বলেন, 'আম্মা, আল্লাহ আমাদেরকে এবং আপনাকে ক্ষমা করুন।' উম্মুল মুমিনিন জবাবে বলেন, 'আল্লাহ আমাকে ও আপনাকে মাফ করে দিন।'[৩৯৭]

এভাবে আকস্মিক থেমে গেল যুদ্ধের দাবানল, যা জ্বলে উঠেছিল কোনো কারণ ছাড়াই। ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হয়েছিল মধ্যাহ্নের পর আর তা থেমে গেল মাগরিবের আগেই।[৩৯৮]

বিপক্ষের যোদ্ধাদের সাথে আলি রা.-এর ব্যবহার

এ যুদ্ধ ইমান-কুফরের লড়াই ছিল না। এটি ছিল সাবায়ি চক্রের সৃষ্ট একটি ভুল বোঝাবুঝি, যেখানে দুপক্ষের নেককাররা অস্ত্র হাতে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।[৩৯৯] সাবায়ি চক্র এ যুদ্ধ শুরু না করলে দুপক্ষের মাঝে কোনো যুদ্ধই হতো না। আলোচনার মাধ্যমেই বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়ে যেত। দুপক্ষই সেদিকে এগোচ্ছিলেন। কিন্তু বাধ সাধে সাবায়ি চক্র।

---

৩৯৬. *মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা*, ৩৭৮৩১

৩৯৭. *তারিখুত তবারি*, ৪/৫৩৪

৩৯৮. *মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা*, ৩৭৮৩৩। প্রত্যক্ষদর্শী আসিম ইবনু কুলাইবের বর্ণনা। সনদের মান হাসান।

৩৯৯. ইমাম তহাবি লেখেন, 'জংগে জামাল সংঘটিত হয় আলি রা., আয়েশা রা., তালহা রা. ও যুবাইর রা.-এর কোনো ইচ্ছা ছাড়াই। বরং এটি ঘটিয়েছিল ফিতনাবাজরা।' দেখুন, *শারহুল আকিদাতিত তহাবিয়্যা*, ২/৭২৩। ইমাম ইবনে হাযম বলেন, 'এটি সুস্পষ্ট যে, আয়েশা রা.-এর কাফেলা আলি রা.-এর সাথে যুদ্ধ করার জন্য বসরা যায়নি। কিংবা তাঁর বিরোধিতা করা বা বাইআত ভঙ্গ করার জন্যও তাঁরা সেখানে যাননি। যদি তাদের এমন কোনো ইচ্ছা থাকত, তাহলে তো তাঁরা আলি রা.-এর বিরুদ্ধে অন্য কারও বাইআত নিতে পারতেন। কিন্তু তারা তা করেননি। মূলত তারা বসরা গিয়েছিলেন উসমান রা.-এর মৃত্যুর ফলে সৃষ্ট ফিতনা দমন করতে।'

যুদ্ধ থেমে যাওয়ার পর আলি রা. প্রথমেই মনোযোগ দেন সম্পর্ক স্বাভাবিক করার ক্ষেত্রে। তিনি নির্দেশ দেন, 'কোনো আহত ব্যক্তিকে হত্যা করা যাবে না। যে অস্ত্র ত্যাগ করবে তাকেই নিরাপত্তা দেওয়া হবে। যে পালাতে চাইবে তাকেও হত্যা করা যাবে না।' নিহত সবাইকে তিনি সমান মর্যাদা দেন, এবং নিজেই তাদের জানাজা পড়ান। বিপক্ষদলের সম্পদকে তিনি গনিমতের মাল ঘোষণা করেননি, বরং তিনি বলেছেন, 'এই সম্পদ হারানো মালের মতো। যার মাল সে যেন প্রমাণ দিয়ে নিয়ে যায়।'[৪০০]

বিশুদ্ধ বর্ণনামতে, এই যুদ্ধে ৩ হাজার মানুষ নিহত হয়। এর মধ্যে কুফাবাসী ছিল ৫০০ আর বসরাবাসী ছিল ২৫০০।[৪০১]

যুদ্ধের পরের পরিস্থিতি

যুদ্ধের পর আয়েশা রা. এই যুদ্ধের জন্য আফসোস করতে থাকেন। তিনি বলতেন, 'হায়, আমি যদি ২০ বছর আগে মারা যেতাম।'[৪০২] এর দ্বারা তিনি বোঝাতেন, যদি এই যুদ্ধে তাকে জড়াতে না হতো, তাহলেই ভালো ছিল। আলি রা.-ও এই যুদ্ধে অত্যন্ত মর্মাহত হন। কাব ইবনু সুওয়ারের লাশের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, 'আল্লাহর কসম, আমি জানি তুমি সত্যের ওপর অটল ছিলে। তুমি ইনসাফ ও ন্যায়ের ফয়সালা করতে সবসময়।' তালহা রা.-এর লাশ দেখে তিনি নিজের আবেগ দমন করতে পারেননি। তিনি তালহা রা.-এর লাশ কোলে তুলে নেন। চেহারা থেকে ধুলোবালি পরিষ্কার করে বলেন, 'আবু মুহাম্মদ, আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। উন্মুক্ত আকাশের নিচে তোমাকে এভাবে পড়ে থাকতে দেখে আমার কষ্ট হচ্ছে। খোদার কসম, আমি ২০ বছর আগে মারা গেলেই ভালো হতো।'[৪০৩]

তালহা রা.-এর ছেলে মুহাম্মদ ইবনে তালহার লাশ দেখে আলি রা. বলেন, 'আল্লাহর কসম, তুমি ছিলে নেককার যুবক।'[৪০৪] বসরায় তালহা রা.-এর অনেক সম্পদ ছিল। আলি রা. কিছুদিন এই সম্পদ নিজে দেখভাল করেন। তারপর ইমরান ইবনু তালহার হাতে পুরো সম্পদ বুঝিয়ে দেন। আলি রা. বলেন, 'এই সম্পদ

---

৪০০. *মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা*, ৩৭৮৩৩, ৩৭৮১৬
৪০১. *তারিখু খলিফা ইবনি খইয়াত*, ১৮৬
৪০২. *তারিখুত তবারি*, ৪/৫৩৭
৪০৩. *মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা*, ৩৭৭৯৬। হাইসামি রহ. বলেন, 'সনদের মান হাসান।'
৪০৪. *আল-মুসতাদরাক আলাস সহিহাইন*, ৫৬০৮

দখলের কোনো ইচ্ছা আমার ছিল না। সম্পদ বেদখল হতে পারে এই আশঙ্কায় আমি তা নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়েছিলাম।'[৪০৫]

এই যুদ্ধে আম্মার ইবনে ইয়াসির রা. আলি রা.-এর পক্ষে ছিলেন। তার সম্পর্কে আয়েশা রা. বলেন, 'আল্লাহর কসম, আমি জানি আপনি সর্বদা হক কথা বলেন।'

যুবাইর রা. এই যুদ্ধে অংশ নেননি। তিনি ময়দান ছেড়ে মদিনার পথে যাত্রা করেন, পথে আমর ইবনু জুরমুয নামে এক সাবায়ি তাকে হত্যা করে।[৪০৬]

এই যুদ্ধের পর উম্মুল মুমিনিনের থাকার ব্যবস্থা হয় বসরায়। তাঁর জন্য বিশেষ একটি ঘরের ব্যবস্থা করা হয়। তাঁর সার্বিক দেখভালের জন্য আলি রা. কয়েকজনকে দায়িত্ব দেন। কয়েকদিন অবস্থানের পর উম্মুল মুমিনিন মদিনায় যাত্রা করেন। এ সময় আলি রা. তার জন্য প্রয়োজনীয় সকল জিনিসের ব্যবস্থা করে দেন। উম্মুল মুমিনিনের সফরসঙ্গী হিসেবে তিনি বসরার সম্ভ্রান্ত পরিবারের ৪০ জন মহিলাকেও সাথে দেন।[৪০৭]

শহর ত্যাগের আগে আয়েশা রা. উপস্থিতদের লক্ষ্য করে বলেন, 'হে আমার সন্তানরা, আমার কাছে আলি উত্তম ব্যক্তিদের একজন।' আলি রা. বলেন, 'ছোটখাটো বিষয় ছাড়া তাঁর আর আমার মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। তিনি তোমাদের নবির স্ত্রী। ইহকাল ও পরকাল দুই স্থানেই।' আলি রা. তার ছেলে হাসান রা.-কে নির্দেশ দেন, তিনি যেন সম্মানের সাথে আয়েশা রা.-কে এগিয়ে দিয়ে আসেন। হাসান রা. প্রায় ২৬ কিলোমিটার পথ পর্যন্ত উম্মুল মুমিনিনকে এগিয়ে দেন।[৪০৮]

আয়েশা রা.-এর কাফেলা প্রথমে মক্কা যায়। কিছুদিন সেখানে অবস্থান করে তিনি মদিনায় যান। জংগে জামালের স্মৃতি তিনি ভুলতে পারেননি। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি এই যুদ্ধের কথা মনে করতেন। যখনই এই যুদ্ধের কথা মনে পড়ত তিনি বলতেন, 'হায়, আমি যদি অতীতের সব কথা ভুলে যেতাম।' এরপর তিনি এত বেশি কান্না করতেন যে তার ওড়না ভিজে যেত।[৪০৯] জংগে জামালের কথা মনে পড়লে তিনি সবার জন্যই রহমতের দুআ করতেন। এ ক্ষেত্রে আলি রা.-এর শিবিরের লোকজনের প্রতি তিনি কোনো বিদ্বেষ রাখতেন না। তাদের জন্যও একই দুআ করতেন। এক ব্যক্তি বলে বসে, 'তারা তো একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

---

৪০৫. *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, ৪৩/৫০৬

৪০৬. *মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা*, ৩০৬২৯

৪০৭. *তারিখুত তবারি*, ৪/৫৪৪

৪০৮. *মুসনাদে আহমাদ*, ২৭১৯৮। *শারহু মুশকিলিল আসার*, ৫৬১২। *আল-মুজামুল কাবির*, ১/৩৩২। ইমাম হাইসামির মতে এই সনদের বর্ণনাকারীরা নির্ভরযোগ্য।

৪০৯. *তারিখুত তবারি*, ৪/৫৪২

করেছিল। আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতে একত্র করবেন না।' আয়েশা রা. বলেন, 'তুমি কি জানো না আল্লাহর অনুগ্রহ সীমাহীন!'[৪১০]

উম্মাহর সংশোধন ও সংস্কারের লক্ষ্যে শুরু হওয়া এই আন্দোলন তালহা রা., যুবাইর রা.-এর শাহাদাত ও উম্মুল মুমিনিনের ঘরে ফেরার মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়। এই আন্দোলনের সাফল্য ছিল বসরায় তারা বিদ্রোহীদের বড় অংশকে হত্যা করেছিলেন। তবে পরবর্তী সময়ে সাবায়িদের ষড়যন্ত্রের কারণে এই আন্দোলনের সাথে আলি রা.-এর অনুসারীদের সংঘর্ষ শুরু হয়। এই আন্দোলনে অংশ নেওয়া বেশিরভাগ নেতাই পরে সমকালীন রাজনীতি থেকে নিজেদের গুটিয়ে নেন। আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর, ওলিদ ইবনু উকবা, সাইদ ইবনুল আস, ইয়ালা ইবনু উমাইয়া, আবদুল্লাহ ইবনে আমের পরবর্তী সময় আর কোনো রাজনৈতিক জটিলতায় নিজেদের জড়াননি।

৪১০. *আল-মুনতাজাম*, ৫/৯৫

সংক্ষেপে জংগে জামালসংশ্রান্ত কয়েকটি মৌলিক কথা

১। আয়েশা রা. ও তাঁর সঙ্গীরা বসরায় গিয়েছিলেন উসমান রা.-হত্যার বিচার নিশ্চিত করতে। তাঁরা চাচ্ছিলেন খুনিদের কাছ থেকে কিসাস নিতে। এটিই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল।

২। আয়েশা রা., তালহা রা. ও যুবাইর রা. এই তিনজনের কেউই খেলাফতের দাবি করেননি, কিংবা আলি রা.-এর শাসনের প্রতিও কোনোপ্রকার অনাস্থা প্রকাশ করেননি। এককথায় আলি রা.-এর খেলাফত নিয়ে তাদের সাথে কোনো বিতর্ক ছিল না।

৩। জংগে জামালের ঘটনা শুরু হয়েছি কুচক্রী সাবায়ি চক্রের হাত ধরে। অন্যথায় দুপক্ষই এই সংঘাত এড়ানোর বিষয়ে একমত ছিলেন।

৪। জংগে জামালের ঘটনায় দুপক্ষের কারও থেকেই উম্মুল মুমিনিনের সম্মানহানির মতো কোনো ঘটনা ঘটেনি। এ সংক্রান্ত বানোয়াট বর্ণনাগুলো শিয়াদের অপপ্রচার।

৫। যদি সাবায়ি চক্র বিশৃঙ্খলা না ছড়াত, তাহলে এ যুদ্ধ হতো না। কারণ দুপক্ষের মাঝে মতবিরোধীদের জায়গা ছিল খুব সামান্য ও কৌশলগত। আলোচনার মাধ্যমেই এটি সমাধান হয়ে যেত, যেমনটা হয়েছে যুদ্ধের পর।

৬। সে সময় জীবিত সব সাহাবি এই যুদ্ধে জড়াননি, বরং বড় অংশই এই যুদ্ধে অংশ নেওয়া থেকে বিরত ছিলেন।
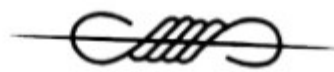
জংগে জামালসংক্রান্ত সংশয় ও সমাধান

জংগে জামালের যুদ্ধকেও ঘিরে আছে নানা সংশয় ও অপপ্রচার। বিশেষ করে শিয়াদের রচিত বইপত্র তো এ বিষয়ে বানোয়াট বর্ণনায় পরিপূর্ণ। এসব বর্ণনা ওরিয়েন্টালিস্ট ও তাদের মানসপুত্ররা গ্রহণ করেছে কোনো যাচাই-বাছাই না করেই। ফলে তাদের রচিত বইপত্রেও এসব জাল বর্ণনা আমদানি হয়েছে প্রবলভাবে, যা মুসলিম সমাজের ধর্মীয় জ্ঞানে অজ্ঞ অংশটিকে খুব সহজেই বিভ্রান্ত করেছে। এই অধ্যায়ে এমন কিছু সংশয় ও আপত্তির সমাধান দেওয়া হবে।

সংশয় ১ – আলি রা.-এর হাতে শামবাসী বাইআত হননি। ফলে তিনি ঐকমত্যের ভিত্তিতে নির্বাচিত কোনো খলিফা ছিলেন না। এজন্য উসমান রা.-এর হত্যাকারীদের বিষয়ে তার সিদ্ধান্তও গ্রহণযোগ্য নয়।

সমাধান – আলি রা.-এর খেলাফতের জন্য মদিনাবাসীর ঐক্যই যথেষ্ট ছিল। তাঁর আগের তিন খলিফার ক্ষেত্রেও মদিনাবাসীর বাইআতকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। তাঁদের বাইআতের মাধ্যমে গোটা উম্মাহর ওপর বাইআত হওয়া আবশ্যক হয়ে যায়। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলকে জিজ্ঞেস করা হয়, 'আলি রা.-এর খেলাফত কি প্রমাণিত?' তিনি বলেন, 'সুবহানাল্লাহ, আলি রা. কি তাহলে অধিকার ছাড়াই শরিয়তের হদ কায়েম করতেন? জাকাত আদায় ও তা বণ্টনের ব্যবস্থা করতেন? তিনি এমন এক সাহাবি যার ওপর নবিজির সাহাবিরা সন্তুষ্ট ছিলেন। তারা আলি রা.-এর পেছনে নামাজ পড়েছেন। তার সাথে যুদ্ধে গিয়েছেন। তাঁরা তাঁকে আমিরুল মুমিনিন বলতেন। তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন সাহাবিরা। তাঁরা তাঁর শত্রু ছিলেন না। আমরা তাঁকে অনুসরণ করি। আমাদের আশা তাঁকে অনুসরণের মাধ্যমে সওয়াব পাওয়া যাবে।'[৪১১]

ইমাম শাফিয়ি বলেন, 'আবু বকর রা.-কে এগিয়ে রাখো। তারপর উমর, তারপর উসমান, তারপর আলি রা.। তাঁরা সবাই খুলাফায়ে রাশিদিন।'[৪১২] আলি রা. খলিফা ছিলেন, এটাই মুজতাহিদ ইমাম ও আহলুস সুন্নাহর সর্বসম্মত মত। এই কথায়

---

৪১১. *আস-সুন্নাহ লি-আবি বকর খল্লাল*, বর্ণনা নং-৬১৩
৪১২. *হাকিকাতুস সুন্নাহ ওয়াল-বিদআহ*, ২০৯

আহলুস সুন্নাহর কেউ দ্বিমত করেনি কখনো। সাহাবিদের আমল থেকেও এই কথারই প্রমাণ মেলে।

সংশয় ২ – যদি ধরে নেওয়া হয় উসমান রা.-এর কিসাসের মাসআলায় আলি রা.-এর অবস্থান সঠিক ছিল, তাহলে প্রশ্ন ওঠে আয়েশা রা., তালহা রা. ও যুবাইর রা.-এর দ্বারা এই ভুল সিদ্ধান্ত কীভাবে গৃহীত হলো।

সমাধান – বিষয়টি ছিল ইজতিহাদি। আর ইজতিহাদের ক্ষেত্রে কোনো এক পক্ষের ভুল হওয়া অসম্ভব কিছু না, কিংবা এতে কারও সম্মান বা মর্যাদাহানিও হয় না। সর্বময় জ্ঞান শুধু আল্লাহর। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিরাও অনেক সময় ফিকহি ক্ষেত্রে ভুল ইজতিহাদ করেছেন। পরে তাঁরা এটি স্বীকারও করেছেন। এ ধরনের ভুল-ইজতিহাদের দ্বারা তাদের সম্মান কমে না। খেলাফতে রাশেদার যুগেও আমরা দেখি একাধিক মাসআলায় সাহাবিদের মধ্যে মতবিরোধ হয়েছে। ইলমি ইখতিলাফ হয়েছে। তাদের কেউ সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, কেউ ভুল ইজতিহাদ করেছেন।

উসমান রা.-এর শাহাদাত ছিল একেবারেই নতুন একটি ঘটনা। ইসলামের ইতিহাসে এর আগে এমন কিছু ঘটেনি। উমর রা.-কেও শহিদ করা হয়েছিল, কিন্তু সেখানে খুনি ছিল একজন এবং সে ছিল চিহ্নিত। ফলে খুব দ্রুত তাকে শাস্তি দেওয়া হয়। কিন্তু উসমান রা.-এর শাহাদাতে খুনি ছিল একাধিক, সাথে ছিল বিদ্রোহী একটি দল, যাদের সবাইকে চিহ্নিত করা যাচ্ছিল না, আবার সবার অপরাধের মাত্রাও এক ছিল না। ফলে বিষয়টি সহজ ছিল না।

সে সময় আলি রা. যে সিদ্ধান্ত নেন সেটিই সঠিক ছিল। বিষয়টি ছিল বিচার-ফয়সালাসংশ্লিষ্ট। আর বিচার-ফয়সালার ক্ষেত্রে আলি রা.-এর জ্ঞান অন্যদের চেয়ে বেশি ছিল। সার্বিক বিচারে তিনি সঠিক সিদ্ধান্তটিই নিয়েছিলেন। ফিকহে ইসলামি আলি রা.-এর মতকেই সমর্থন করেছে। জংগে জামাল ও জংগে সিফফিনের কিছুকাল পরেই উম্মতের মধ্যে ইজমা হয়ে যায়, এই বিষয়ে আলি রা.-এর সিদ্ধান্তই সঠিক ছিল।

তবে যারা তাঁর বিরোধিতা করেছিলেন, তাঁদের নিয়তও ছিল বিশুদ্ধ, তাঁরা পার্থিব কোনো স্বার্থে বিরোধিতা করেননি। তবে তাঁরা ভুল ইজতিহাদের শিকার হয়েছিলেন। এই ভুল ইজতিহাদকে কেন্দ্র করে তাঁদেরকে অপবাদ দেওয়া যাবে না, দোষারোপ করা যাবে না। তাদের শানে কোনো কটু বাক্য বলা যাবে না।

সংশয় ৩ – আয়েশা রা. একজন মহিলা। কুরআনে আল্লাহ নারীদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন, 'তোমরা ঘরে অবস্থান করবে। জাহিলি যুগের অনুরূপ নিজেদের

প্রদর্শন করবে না।' এই আয়াতে সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও তিনি কেন বসরা গেলেন?

সমাধান – উম্মাহর বৃহত্তর স্বার্থে ঘর থেকে বের হওয়া উক্ত আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল- জামাআতের সর্বসম্মত মত এটিই। নবিজির ইনতিকালের পর নবিজির স্ত্রীরাও মাহরাম সাথে নিয়ে হজ ও উমরায় যেতেন। এতে কোনো সমস্যা ছিল না। আয়েশা রা. এদিকে লক্ষ্যে করেই ঘর থেকে বের হয়েছিলেন। তা ছাড়া এই সফরে তিনি একা বের হননি। তাঁর সাথে মাহরাম হিসেবে ছিলেন তাঁর ভাগিনা আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর।

ইমাম ইবনু তাইমিয়া বলেন, 'তিনি তো জাহিলি যুগের নারীদের মতো ঘর থেকে বের হননি। মাহরামের সাথে হজ বা উমরার সফরে যেতে যেমন কোনো সমস্যা নেই, তেমনই বৃহত্তর কল্যাণের জন্য ঘর থেকে বের হওয়াও কুরআনের বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। আম্মাজানের এই সফর ছিল বৈধ, কারণ এখানে তিনি সফর করেছিলেন উম্মাহর সংশোধন ও সংস্কারের জন্যই।'[৪১৩]

সংশয় ৪ – কুরআন কারিম ও হাদিস শরিফে বারবার ইমাম তথা শাসকের আনুগত্য করতে বলা হয়েছে। আলি রা. একজন খলিফায়ে রাশিদ হওয়া সত্ত্বেও আয়েশা রা., তালহা রা. ও যুবাইর রা. কেন তাঁর বিরোধিতা করলেন? এটা কি বিদ্রোহ বলে গণ্য হবে না? তাঁরা কি অপরাধী সাব্যস্ত হবেন না?

সমাধান – মৌলিকভাবে শাসকের আনুগত্য করা ফরজ। তাঁর অবাধ্যতা করা কিংবা বিদ্রোহ করা গুনাহ। কিন্তু সকল বিদ্রোহের মান এক নয়। সব বিদ্রোহীর স্তরও এক নয়। যদি সাধারণ বিদ্রোহী হয়, তাহলে তার কাজ মূল্যায়ন হবে একভাবে। অপরদিকে যদি কোনো মুজতাহিদ অবাধ্যতা বা বিদ্রোহ করেন, তার কাজের মূল্যায়ন হবে অন্যভাবে। যেমন একজন সৎ, নেককার, সম্মানিত, জ্ঞানী ব্যক্তি তার ইজতিহাদের কারণে বিদ্রোহ করে বসলেন, এ ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহর মত হলো, তার এই কাজটি ইজতিহাদি ভুল তো অবশ্যই, কিন্তু একে গুনাহ বা পাপাচার বলা যাবে না।

রাজনীতি শরিয়তের একটি শাখামাত্র। শরিয়তের অন্যান্য শাখার মতো এই শাখাতেও বিধানের ক্ষেত্রে নানা মতবিরোধ হওয়াটাই স্বাভাবিক। স্বাভাবিক অবস্থায় বিদ্রোহ করা কবিরা গুনাহ। কিন্তু কেউ যদি ইজতিহাদের যোগ্যতা রাখেন, এবং নিজের যোগ্যতা দ্বারা বিদ্যমান পরিস্থিতিকে পর্যবেক্ষণ করেন, নিজের কাছে থাকা খবর ও সংবাদ বিশ্বাস করে শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে বৈধ মনে করেন,

---

৪১৩. *মিনহাজুস সুন্নাহ*, ৪/৩১৭

তাহলে এই কারণে তিনি ফাসিক হবেন না। বরং তার ইজতিহাদটি ভুল হলে একে ভুল ইজতিহাদ হিসেবেই দেখা হবে, কবিরা গুনাহ মনে করা হবে না।[৪১৪]

ইবনে কুদামা লেখেন, 'মুজতাহিদ বিদ্রোহী যদি বিদআতি না হয়, তাহলে সে ফাসিক হবে না বরং সে তার ব্যাখ্যায় ভুলকারী। শরয়ি আহকামে যেমন মুজতাহিদদের মাঝে মতবিরোধ হয়, এই ব্যাপারটিও তেমন বলে ধর্তব্য হবে।'[৪১৫]

রশিদ আহমাদ গংগোহি লেখেন, 'আলি ও মুআবিয়া রা.-এর মধ্যে যা-কিছু হয়েছে, সেগুলো ইজতিহাদি ভুল। ইজতিহাদি ভুলকে দেখতে অপরাধ মনে হলেও তা আসলে অপরাধ নয়।'[৪১৬]

আয়েশা রা., তালহা রা. ও যুবাইর রা.-এর বিষয়টিও ছিল এমন। তারা আলি রা.-এর বিরোধিতা করলেও এটি ছিল তাদের নিজস্ব ইজতিহাদ। এর কারণে তারা অপরাধী হিসেবে গণ্য হবেন না, কিংবা তাদেরকে ফাসিকও বলা হবে না। শুধু এটুকুই বলা হবে, তারা ভুল ইজতিহাদ করেছিলেন।

সংশয় ৫ – নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের বলেছিলেন, 'হায়, আমি যদি জানতাম তোমাদের মধ্যে কার জন্য বাওয়াবের কুকুর ক্রন্দন করবে!'[৪১৭] এই হাদিস বাস্তবায়িত হয় জংগে জামালের সময়। এ সময় আয়েশা রা.-এর কাফেলা বাওয়াবের কূপ অতিক্রম করে, সে সময় তারা সেখানে কুকুরের কান্না শোনেন। এ থেকে আয়েশা রা.-কে অপরাধী সাব্যস্ত করে অনেকে। (নাউজুবিল্লাহ)

সমাধান – বাওয়াবের কূপ সম্পর্কিত হাদিসটি যেমন সহিহ, তেমনই আয়েশা রা. এই কূপ অতিক্রমকালে কুকুরের কান্না শুনে চমকে ওঠেন, এই বর্ণনাও সহিহ।[৪১৮] কিন্তু এই বর্ণনায় তেমন নেতিবাচক কিছু নেই। এই হাদিসে শুধু বাওয়াব কূপ পর্যন্ত নবিজির কোনো স্ত্রী যাবেন এতটুকুর প্রমাণ মেলে। কিন্তু এই কূপে আসার পর থেমে যাওয়া বা ফিরে যাওয়া এমন কোনো নির্দেশনা দেওয়া হয়নি এই

---

৪১৪. শর্ত হলো তিনি খারিজি হবেন না। সরকার ও তার অনুসারীদের কাফের মনে করবেন না এবং জনসাধারণের রক্ত নিজের জন্য হালাল মনে করবেন না।

৪১৫. *আল-মুগনি*, ৮/৫৩৬

৪১৬. *হিদায়াতুশ শিয়াইয়্যা*, ২৯

৪১৭. *মুসনাদে আহমাদ*, ২৪৬৫৪। সনদ সহিহ। এ ছাড়াও দেখুন, *মুসনাদে আবু ইয়ালা*, ৪৮৬৮। *মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা*, ৩৭৭৭১। *মুসনাদে ইসহাক ইবনে রাহওয়াই*, ১৫৬৯। *মাজমাউয যাওয়ায়েদ*, ১২০২৫। *সহিহ ইবনে হিব্বান*, ২৭৩২

৪১৮. *আল-মুসতাদরাক আলাস সহিহাইন*, ১২৩৪

হাদিসে।[৪১৯] তা ছাড়া হাদিসে নবিজি তাঁর স্ত্রীর নামও নির্দিষ্ট করেননি। বরং তিনি বলেছেন, তাঁর কোন স্ত্রী এখানে আসবেন তা তিনি জানেন না। এটি ছিল একেবারেই সাধারণ একটি ভবিষ্যদ্বাণী যা থেকে জংগে জামালের ইঙ্গিত মেলে। কিন্তু এই হাদিসে আয়েশা রা.-এর নিন্দার প্রমাণ নেই।

মূলত বাওয়াব কূপের হাদিসটি হলো, নবিজির একটি ভবিষ্যদ্বাণী। যেখানে তিনি উপরিউক্ত পরিস্থিতিতে করণীয় কী হবে সে সম্পর্কে কোনো নির্দেশই দেননি। আম্মাজান ও অন্য সাহাবিরাও বিষয়টি জানতেন।

কুকুরের ডাকেরও কোনো নেতিবাচক অর্থ নেই। কুকুর ডাকতেই পারে। কিন্তু শিয়ারা কুকুরের ডাকের অর্থ করে যে, 'কুকুরও আয়েশা রা.-কে দেখে ক্ষিপ্ত হয়েছিল।' এটি নির্জলা মিথ্যাচার। ৬০০ মানুষের একটি কাফেলায় আম্মাজানের অবস্থান ছিল একেবারেই পর্দার আড়ালে। এ ক্ষেত্রে কুকুর কী করে তার অবস্থান টের পাবে।

ফলে এই হাদিস এনে আম্মাজান আয়েশা রা.-কে আঘাত করা কোনো নেককারের কাজ হতে পারে না। এর মাধ্যমে তারা শুধু আম্মাজানের বিরুদ্ধে তাদের বক্ষস্থিত বিদ্বেষই উগরে দেয়।

---

৪১৯. কিছু কিছু হাদিসে দেখা যায়, বাওয়াব কূপে আসার পর ফিরে যাওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। মুহাদ্দিসদের মতে এসব হাদিসের একটিরও ভিত্তি নেই। বিশুদ্ধ হাদিস শুধু ওই একটিই, যেখানে নবিজি বলেছেন, 'হায়, আমি যদি জানতাম তোমাদের মধ্যে কার জন্য বাওয়াবের কুকুর ক্রন্দন করবে।'

জংগে সিফফিন

আলি রা.-এর সাথে শামবাসীর দ্বন্দ্ব

আয়েশা রা.-এর আন্দোলনের সমাপ্তি হয়েছিল আলি রা.-এর সাথে সন্ধির মাধ্যমে। বাহ্যত এই আন্দোলনের সমাপ্তির পর আলি রা.-এর বিরুদ্ধে আর কোনো আন্দোলনের দরকার ছিল না। কিন্তু শামবাসী তাদের দ্বন্দ্ব জমিয়ে রাখে। আলি রা.-এর বিরোধিতায় তাদের উৎসাহে বিন্দুমাত্রও ভাটা পড়েনি। বিশেষ করে গুজবকারীরা সেখানে নিয়মিত গুজব ছড়াচ্ছিল। অনেকে কসম করে বলে, উসমান রা.-এর হত্যাকাণ্ডে আলি রা. জড়িত ছিলেন। কারও কারও ধারণা ছিল, আলি রা. নিজেই সাবায়ি চক্রের হাতে বন্দি এবং তিনি নিজে কিছু করার সক্ষমতা নেই। নিজের খেলাফত তিনি টিকিয়ে রেখেছেন সাবায়িদের মাধ্যমেই। এসব প্রচারণা ও অপপ্রচারের ফলে শামবাসী কোনোভাবেই আলি রা.-এর হাতে বাইআত হতে প্রস্তুত ছিল না।

শামের পরিস্থিতি সে সময় কতটা উত্তপ্ত ছিল তার চিত্র ফুটে উঠেছে ইমাম ইবনু তাইমিয়ার লেখায়। তিনি লিখেছেন, 'কিছু মানুষ মিথ্যা কসম করে বলতে থাকে, আলি রা. উসমান রা.-এর হত্যায় জড়িত ছিলেন। এই একটি বিষয় শামবাসীকে বাইআত পরিত্যাগে উদ্বুদ্ধ করে। তারা বিশ্বাস করে বসছিলেন, আলি রা. জালিম এবং উসমান রা.-এর হত্যাকারী। তিনিই হত্যাকারীদের আশ্রয় দিয়েছেন, কারণ তিনি নিজেই এই হত্যায় জড়িত।'[৪২০]

মূলত শামবাসী অবস্থান করছিলেন ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু মদিনা থেকে অনেক দূরে। সে কালে যাতায়াত ও যোগাযোগব্যবস্থা এখনকার মতো উন্নত ছিল না। প্রাপ্ত প্রতিটি সংবাদ যাচাইয়ের কোনো উপায়ও ছিল না। এর মাঝে সাবায়িরা ছড়াতে থাকে মিথ্যা সংবাদ। এদিকে উসমান রা.-এর শাহাদাতে মানুষের মনগুলো ছিল এমনিতেই শোকাহত। এমন আবেগঘন অবস্থায় যাচাই-বাছাই করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো পরিস্থিতি ছিল না। ফলে শামবাসী খুব সহজেই সাবায়িদের চক্রান্তের শিকার হয় এবং আলি রা.-কে অপরাধী ভাবতে থাকে।

---

৪২০. *মিনহাজুস সুন্নাহ*, ৪/৪০৬

শামের গভর্নর ছিলেন মুআবিয়া রা.। তিনি যদিও আলি রা.-এর ফজিলত ও মর্যাদা অস্বীকার করেননি, কিন্তু তিনিও দাবি তোলেন, 'হত্যার অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতি পেতে আলি রা.-এর উচিত উসমান রা.-এর খুনিদের কিসাস কার্যকর করা কিংবা শামের লোকজনের হাতে তাদের ছেড়ে দেওয়া। যদি তিনি এই কাজ না করেন, তাহলে তাঁর খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলা যাবে না। বরং তাঁর অবস্থান হবে এমন একটি দলের প্রধান হিসেবে, যাদের বিরুদ্ধে আগের খলিফাকে হত্যার অভিযোগ আছে।' মুআবিয়া রা.-এর কথা ছিল আগে কিসাস কার্যকর করা হোক। কিসাস কার্যকর হলে বাইআত দেওয়া হবে। তিনি সরাসরি বলতেন, 'আলি রা.-এর সাথে আমাদের দ্বন্দ্ব শুধু উসমান রা.-এর কিসাস বিষয়ে।'[৪২১]

এদিকে আলি রা.-এর মতে শামবাসীর এই অবস্থান ছিল ভিত্তিহীন ও অমূলক। তাঁর মতে এই সংকটের সমাধান ছিল একটাই, শামবাসী তাঁর হাতে বাইআত হয়ে খেলাফতকে মজবুত করবে, তারপর সবাই মিলে একত্রে ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া হবে। বলাবাহুল্য, আলি রা.-এর এই ইজতিহাদই সঠিক ছিল। স্বয়ং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'বিচার সম্পর্কিত বিষয়ে সাহাবিদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম যোগ্যতার অধিকারী আলি।'[৪২২] যেহেতু এই বিষয়টিও বিচার-ফয়সালাসংক্রান্ত ছিল, ফলে এখানেও আলি রা.-ই সঠিক অবস্থানে ছিলেন। ইমাম ইবনু তাইমিয়াও শামবাসীর অবস্থানকে ভুল আখ্যা দিয়ে লিখেছেন, 'যদি ধরে নেওয়া হয় উসমান রা.-এর খুনিদের বিচার করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আলি রা. কোনো ভুল ব্যাখ্যার মাধ্যমে তা পরিত্যাগ করেছিলেন, তবুও এই সামান্য অভিযোগে উম্মাহর মাঝে বিচ্ছিন্নতা তৈরি করা সঠিক হয়নি। এই বিচ্ছিন্নতার চেয়ে আলি রা.-এর হাতে বাইআত হওয়া ছিল অধিক উত্তম। কারণ নবিজি বারবার ঐক্যবদ্ধ হতে বলেছেন, বিচ্ছিন্নতা ত্যাগ করতে বলেছেন।'[৪২৩]

আলি রা. চাচ্ছিলেন দ্রুত সংকট নিরসন করতে। কুফার জামে মসজিদে দেওয়া এক ভাষণে তিনি বলেন, 'হে বনু উমাইয়া, যে চায় আমাকে হাজরে আসওয়াদ ও মাকামে ইবরাহিমের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দাও, আমার থেকে কসম নাও, না আমি উসমানকে হত্যা করেছি, না তাঁর হত্যায় অংশ নিয়েছি।'[৪২৪] এত শক্ত কথা বলার পরেও বনু উমাইয়া তাকে বিশ্বাস করেনি। তারা তাঁকে খুনি চক্রের একজনই ভাবছিল।

---

৪২১. *মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা*, ৩০৫৫২

৪২২. *সুনানে ইবনে মাজাহ*, ১৫৪। সনদের মান সহিহ।

৪২৩. *মিনহাজুস সুন্নাহ*, ৪/৪১১

৪২৪. *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, ৩৯/৪৫১

বসরায় সে সময় অনেক সাহাবি বসবাস করছিলেন। তাদের বেশিরভাগই ছিলেন নিরপেক্ষ। আলি রা. তাদেরকে নিজেদের দলে টানার চেষ্টা করেন। জারির ইবনু আবদুল্লাহ রা. বসবাস করতেন শাম ও ইরাকের সীমান্তে অবস্থিত একটি গ্রামে। তিনি এসব বিবাদ থেকে নিজেকে দূরে রেখেছিলেন। আলি রা. দূত পাঠিয়ে তার সাথে আলাপ করেন। জারির ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, 'আমাকে নবিজি ইয়ামান পাঠিয়েছিলেন। তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন, আমি যেন সেখানে জিহাদ করি এবং সেখানকার মানুষকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর দাওয়াত দিই। যখন কেউ এই কালিমা পড়বে, তার সাথে সাথে যেন তাকে নিরাপত্তা দিই। সুতরাং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়েছে এমন কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমি লড়ব না। (অর্থাৎ আমি আলি বা মুআবিয়া কারও বিরুদ্ধেই লড়ব না।)'[৪২৫]

জারির ইবনে আবদুল্লাহর মাধ্যমে আলি রা. সংকট নিরসনের চেষ্টা চালান, কিন্তু আশতার নাখয়ি ও অন্যদের চক্রান্তে তা পণ্ড হয়ে যায়। জারির রা. বিরক্ত হয়ে মুআবিয়া রা.-এর শিবিরে যোগ দেন, কিন্তু তিনি কোনো যুদ্ধে অংশ নেননি।

বিশিষ্ট তাবিয়ি আবু মুসলিম খাওলানিও আলি রা.-এর পক্ষ নিয়ে মুআবিয়া রা.-এর কাছে যান। তিনি বলেন, 'আপনি আলি রা.-এর বিরোধিতা করছেন কেন? তিনি কি আপনার সমস্তরের মানুষ?'

মুআবিয়া রা. বলেন, 'কখনোই না। আল্লাহর কসম, আমি জানি, তিনি আমার চেয়ে উত্তম এবং খেলাফতের অধিক হকদার। কিন্তু উসমান রা. নিরপরাধ অবস্থায় নিহত হয়েছেন। আপনারা আলি রা.-কে বলুন, তিনি যেন উসমান রা.-এর হত্যাকারীদের আমার হাতে তুলে দেন। আমি তার অনুগত হয়ে যাব।'[৪২৬]

আবু মুসলিম খাওলানি এই প্রস্তাব আলি রা.-কে জানান। কিন্তু আলি রা.-এর মতে শরয়ি দলিল ও রাষ্ট্রীয় বাস্তবতার প্রেক্ষিতে এমনটা করা সম্ভব ছিল না। ফলে বিষয়টি আর সামনে এগোয়নি।

মূলত শাম তখন কেন্দ্রীয় খেলাফত থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। আলি রা. সেখানে নিজের একজন গভর্নর পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তাকে পথেই ফিরিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে আলি রা.-এর কোনো আদেশ-নিষেধ কিছুই বাস্তবায়ন করা যায়নি। ফলে বিষয়টি গুরুত্ব না দিয়ে উপায় ছিল না। সার্বিক বিবেচনা করে আলি রা. সিদ্ধান্ত নেন, শামের বিষয়ে তিনি কঠোর হবেন। নিজের সিদ্ধান্তের যথার্থতা প্রমাণ করতে গিয়ে

---

৪২৫. *আল-মুজামুল কাবির*, ২/৩৩৪

৪২৬. *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, ৫৯/১৩২। *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ৩/১৪০। *ফাতহুল বারি*, ১৩/৮৬ ইবনু হাজার আসকালানির মতে এর সনদের মান হাসান।

আলি রা. বলেন, 'কেউ যদি আবু বকরের বাইআত ভঙ্গ করত, আমরা অবশ্যই তার বিরুদ্ধে লড়াই করতাম। কেউ যদি উমরের বাইআত ভঙ্গ করত, তার বিরুদ্ধেও আমরা লড়াই করতাম।'[৪২৭]

ইবনু হাযম জাহিরি লেখেন, 'মুআবিয়া রা. বাইআত হননি, শুধু এই কারণেই তাঁর বিরুদ্ধে আলি রা. অভিযান চালাননি। কারণ আরও অনেকেই বাইআত হননি, সেই সুবিধা মুআবিয়া রা.-ও পেতেন। মূলত যুদ্ধের কারণ ছিল মুআবিয়া রা. পুরো শামে আলি রা.-এর আদেশ-নিষেধ বাস্তবায়নের পথ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। অথচ আলি রা. ছিলেন খলিফা। তার আনুগত্য করা ছিল ওয়াজিব। সুতরাং এ ক্ষেত্রে আলি রা. যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা ছিল সঠিক।'[৪২৮]

যুদ্ধের প্রস্তুতি

শামে অভিযান চালানোর জন্য আলি রা. সেনাবাহিনী প্রস্তুত করেন। প্রস্তুতকৃত এই সেনাবাহিনীতে সেনাসংখ্যা ছিল জংগে জামালে অংশ নেওয়া সেনাবাহিনীর চেয়ে আকারে বড়। বসরা, কুফা, মাদায়েন ও মসুল থেকে অনেক গোত্রের লোকজন এসে এই সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়। আহনাফ ইবনু কাইসের মতো বিখ্যাত তাবিয়ি যোদ্ধা জংগে জামালে নিরপেক্ষ ছিলেন, কিন্তু এই যুদ্ধে তিনি আলি রা.-এর সেনাবাহিনীতে যোগ দেন।[৪২৯]

তবে বিশাল সেনাবাহিনী গঠন করলেও সরাসরি যুদ্ধ করা আলি রা.-এর উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল উম্মতের বিচ্ছিন্নতা সরিয়ে তাদেরকে ঐক্যের দিকে নিয়ে আসা। বিরাট বাহিনী তৈরির কারণ এটি নয় যে, তিনি সিরিয়ান বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাচ্ছিলেন, বরং তিনি চাচ্ছিলেন তাদের মনোবল নড়বড়ে করে দিতে। তিনি চাচ্ছিলেন বড় আকারের সেনাবাহিনী দেখে শামের বাহিনী যেন সহজেই তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে নেয়। এমনকি অভিযান শুরুর আগে আলি রা.-এর প্রতিনিধি আবু মাসউদ রা. কুফার মসজিদে জনগণের উদ্দেশে বলেন, আল্লাহ উম্মতে মুহাম্মদের মাঝে সন্ধি করে দিন। তাদের ভালোবাসা ও সৌহার্দ মজবুত করে দিন।[৪৩০]

এদিকে শামের বাহিনীও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। তাদের সংখ্যা আলি রা.-এর বাহিনীর চেয়ে কিছুটা কম ছিল। তবে শামবাসীর কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল যা তাদেরকে আলি রা.-এর বাহিনী থেকে এগিয়ে রেখেছিল। শাম কয়েক শতাব্দী শাসিত

---

৪২৭. *আল-ইতিকাদ লিল বাইহাকি*, ৩২১

৪২৮. *আল-ফাসলু ফিল মিলাল ওয়াল-আহওয়াই ওয়ান-নিহাল*, ৪/১২৪

৪২৯. *আনসাবুল আশরাফ*, ২/২৯৫

৪৩০. *মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা*, ৩৭৮৭৪

হয়েছিল রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে। ভ্রান্ত আকিদা থাকা সত্ত্বেও রোমানরা তাদের সাম্রাজ্যকে সফলভাবে গড়ে তুলেছিল। শুরু থেকেই তারা সভ্যতার অনুরাগী ছিল। অভ্যস্ত ছিল সুশৃঙ্খল জীবনযাপনে। খেলাফতে রাশেদার সময় থেকে প্রায় দুই যুগ তারা শাসিত হয় বনু উমাইয়ার অধীনে। হজরত মুআবিয়া রা. দীর্ঘদিন ধরে এখানে শাসন করছেন। তিনি ছিলেন সমরকুশলী ও দক্ষ রাজনীতিবিদ। ফলে তার বাহিনীটি ছিল সুগঠিত, অনুগত। তাদের সাজানো হয়েছিল সর্বোত্তম বিন্যাসে।

অপরদিকে ইরাকি বাহিনীর অবস্থা ছিল ভিন্ন। আলি রা.-এর অনুসারীদের বেশিরভাগের আবাস ছিল আরবের পূর্বাঞ্চলে। তারা ছিল জন্মগতভাবেই স্বাধীনচেতা স্বভাবের অধিকারী। দীর্ঘ সময় ধরে তারা পারসিয়ান সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল যা তাদেরকে আরও বেশি স্বাধীনচেতা ও অস্থিরচিত্ত বানিয়ে দেয়। বিশেষ করে পারসিয়ান সাম্রাজ্যের শেষ ৪০-৫০ বছর ছিল ঘন ঘন বিদ্রোহ ও রাজনৈতিক অস্থিরতার যুগ। এ সময় ঘন ঘন সরকার পরিবর্তিত হয়। ফলে জনগণও অস্থিরচিত্ত হয়ে ওঠে। ইসলামের আগমনের ফলে এখানকার লোকজন হেদায়াতের সন্ধান পায়, কিন্তু তাদের এই মানসিক অস্থিরতা দূর হয়নি। বিশেষ করে কুফা ও বসরা শহরের লোকজনের অস্থিরতা সম্পর্কে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। আলি রা.-এর গঠিত বাহিনীতেও এই অস্থিরতা বহাল ছিল।

একটি ছোট ঘটনা থেকেই দুই বাহিনীর অবস্থা স্পষ্ট হবে। যুদ্ধ শুরুর আগে আলি রা. একজন দূত পাঠান মুআবিয়া রা.-এর কাছে। এতে শেষবারের মতো হজরত মুআবিয়া রা.-কে সতর্ক করা হয়। দূতের বার্তা শুনে মুআবিয়া রা. মসজিদে যান। মিম্বরে বসে জনতাকে সব জানিয়ে তাদের মতামত জানতে চান। উপস্থিত সবাই মাথা নিচু করে নীরব থাকে। শুধু একজন আমির দাঁড়িয়ে বলেন, 'আপনি যা সিদ্ধান্ত নেবেন আমরা তা মেনে নেব। আদেশ দেওয়া আপনার কাজ, পালনের দায়িত্ব আমাদের।' উত্তর শুনে মুআবিয়া রা. সেনাবাহিনী প্রস্তুত করতে বলেন।

পুরো ঘটনা দেখে দূত আলি রা.-এর কাছে ফিরে আসে। আলি রা. নামাজের পর মসজিদের মিম্বরে বসে সবাইকে শামবাসীর অবস্থা জানান। তাদের মতামত জিজ্ঞেস করেন। তার কথা শেষ হতে না হতেই জনতা চিৎকার, হইচই শুরু করে দেয়। কেউ বলছিল, 'আপনি এটা করুন।' কেউ বলছিল, 'আপনি ওটা করুন।' চিৎকারের কারণে কারও কথাই ঠিকমতো বোঝা যাচ্ছিল না। অবস্থা দেখে আলি রা. ইন্নালিল্লাহ পড়তে পড়তে মিম্বর থেকে নিচে নেমে যান।[৪৩১]

৪৩১. *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, ১৭/৩৯১। *তারিখুল ইসলাম*, ৩/৫৪১

সিফফিনের পথ ধরে

নেতৃবৃন্দ ও আমিরদের সাথে পরামর্শের পর আলি রা. সিদ্ধান্ত নেন, তিনি নিজেই বাহিনীকে নেতৃত্ব দিয়ে যুদ্ধের ময়দানে যাবেন। আবু মাসউদ রা.-কে কুফায় নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করে তিনি সেনাবাহিনী নিয়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে যাত্রা শুরু করেন। প্রায় ১১২৭ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে তিনি ফুরাত নদীর তীরে উপস্থিত হন। সে সময় এটিই ছিল শামের সীমান্ত।[৪৩২]

রসদ ও সেনাবাহিনী নিয়ে তিনি রাক্কা নামক স্থানে নদী পার হন। ৩৬ হিজরির জিলহজ মাসের প্রথম দিকে তিনি সেনাবাহিনী নিয়ে সিফফিন নামক স্থানে পৌঁছেন। শামের বাহিনী আগ থেকেই এখানে অবস্থান করছিল।

পরিস্থিতির নাটকীয়তা ও সাবায়িদের ষড়যন্ত্র এই প্রথম মুসলিম উম্মাহর দুই শ্রেষ্ঠ সন্তানকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিলো।

সিফফিনের যুদ্ধ

মূল যুদ্ধ শুরুর আগে দুই বাহিনী সিফফিনের ময়দানে প্রায় দুই মাস অবস্থান করে। এ সময় তাদের মাঝে কিছু দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়, যেখানে দুই পক্ষের সেনারা অংশ নেয়।[৪৩৩] তবে জংগে জামালের মতো এখানেও দুই বাহিনীর পক্ষ থেকে সন্ধির চেষ্টা চালানো হয়। দুই বাহিনীতেই অনেক কারি ও আবিদ ছিলেন। তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০ হাজার। এই কারিগণ দুই বাহিনীর মাঝখানে নিজেদের শিবির স্থাপন করেন। তারা উভয় বাহিনীর পক্ষে দূতিয়ালি শুরু করেন। মূলত তারা চাচ্ছিলেন সংঘাত এড়াতে। যেকোনোমূল্যে দুই বাহিনীর মাঝে যুদ্ধ থামাতে।

দূতদের মাধ্যমে হজরত মুআবিয়া রা. বলেন, 'আমি শুধু উসমান রা.-এর হত্যার বদলা নিতে এসেছি।' আলি রা. বলেন, 'এই হত্যার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।' মুআবিয়া রা. বলেন, 'এই কথা সত্য হলে উসমান রা.-এর হত্যাকারীদের আমাদের হাতে তুলে দিতে হবে।' আলি রা. বলেন, 'মুহাজির ও আনসাররা আমার হাতে বাইআত হয়েছে। শামবাসীরও উচিত আমার আনুগত্য মেনে নেওয়া।' মুআবিয়া রা. বলেন, 'আমাদের সাথেও আনসার ও মুহাজিরদের অনেকে আছেন। তারা এখনো আলির হাতে বাইআত হননি।'

এভাবে আলোচনা চলছিল। কোনো পক্ষই অপর পক্ষের দাবি মানতে প্রস্তুত ছিল না সে সময়। এর মধ্যে কয়েকবারই দুপক্ষের সেনারা উত্তেজিত হয়ে যুদ্ধ শুরু

---

৪৩২. *তারিখুত তবারি*, ৪/৫৬৩

৪৩৩. *ওয়াকআতু সিফফিন*, ১৬৬-১৬৮

করে, কিন্তু প্রতিবাদে কারিদের দলটি দুদলের মাঝখানে এসে অবস্থান নেয়, ফলে তারা আর যুদ্ধ করতে পারেনি। অন্তত ৮৫ বার দুদলের সেনারা যুদ্ধ শুরু করলে কারিদের দল এসে যুদ্ধ থামিয়ে দেয়।[৪৩৪] মূলত দুই পক্ষের কারিরাই চাচ্ছিলেন যুদ্ধ আটকাতে। তারা চাচ্ছিলেন আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টির নিষ্পত্তি হোক। কিন্তু নানা মাধ্যমে আলোচনা চালিয়েও বিষয়টির নিষ্পত্তি করা যায়নি।

অবশেষে ৩৭ হিজরির ৭ সফর বেজে উঠল যুদ্ধের দামামা। এ দিন দুই বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। আলি রা. নিজের সেনাদের আদেশ দেন তারা যেন আগ বাড়িয়ে যুদ্ধ না করে। শুধু আক্রমণের শিকার হলে তবেই যেন প্রতিহত করে তারা। নিজের সেনাদের তিনি বলেন, 'আল্লাহর শুকরিয়া, তোমরা হকের ওপর আছ। বিপক্ষদল লড়াই শুরু না করলে তোমরা লড়াই শুরু করো না। যদি তাদের পরাস্ত করতে পারো তাহলে পলায়নরত কাউকে হত্যা করবে না। কোনো আহত ব্যক্তির ওপর হামলা করবে না। কারও লাশের সম্মানহানি করবে না। তাদের কোনো তাঁবুতে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করবে না। যুদ্ধের ময়দানে যত সম্পদই হাতে আসুক, তা ধরবে না। তাদের মহিলাদের কোনো অসম্মান করবে না।'[৪৩৫]

যুদ্ধ শুরু হলে দুপক্ষের সেনারা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। উভয় বাহিনীতেই সাহাবি ও তাবিয়িদের জামাত ছিল। তবে আলি রা.-এর বাহিনীতে বেশ কয়েকজন বদরি সাহাবিও ছিলেন। ছিলেন বাইআতে রিজওয়ানে অংশ নেওয়া কয়েকজন সাহাবিও। যুদ্ধ শুরু হলে উভয় বাহিনীর সেনারা একে অপরকে লক্ষ্য করে বর্শা নিক্ষেপ করতে থাকে। আলি রা. নিজে এই যুদ্ধে নেমে আসেন। জুলফিকার নামক তরবারি হাতে তিনি লড়তে থাকেন। এত বেশি তরবারি চালনা করেন যে শেষ পর্যন্ত তা বাকা হয়ে যায়।[৪৩৬]

যুদ্ধের ময়দানে দুপক্ষের সেনা ছিল অনেক বেশি, ফলে সারির শেষ অংশ দেখা যেত না। উভয় দিক থেকে ক্ষণে ক্ষণে তাকবিরধ্বনি উচ্চারিত হতো। দুদিকেই হতাহতের সংখ্যা বাড়ছিল। আলি রা.-এর শিবিরে ছিলেন প্রখ্যাত তাবিয়ি ওয়াইস করনি। তিনিও শামবাহিনীর হাতে শহিদ হয়ে যান। আলি রা.-এর দলে ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদের বিশিষ্ট ছাত্র আলকামা ইবনু কাইস। তার ছাত্র ইবরাহিম নাখয়ি পরে বলেছিলেন, আমাদের উস্তাদ এই যুদ্ধে পূর্ণ উদ্যমের সাথে তরবারি ব্যবহার করেছেন।[৪৩৭]

---

৪৩৪. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ১০/৫০৬

৪৩৫. *শারহু মাআনিল আসার*, ৫১১২। হানাফি মাজহাবের মতে বিদ্রোহীদের ওপর আগ বেড়ে হামলা করা যাবে না। দেখুন, *হিদায়া*, বাবুল বুগাত।

৪৩৬. *মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা*, ৩৭৮৭৮। সনদ সহিহ।

৪৩৭. *মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা*, ৩৭৮৬৯। সনদের মান সহিহ।

সময়টি ছিল জুন মাস। তীব্র গরম ছিল, তবুও অনেকে নফল রোজা রেখে ময়দানে নেমেছিলেন। বদরি সাহাবি আবু আমর আনসারি এ দিন রোজা রেখেছিলেন। দিনের শেষ ভাগে তিনি শহিদ হয়ে যান।[৪৩৮] তবে অনেকে যুদ্ধের ময়দানে নেমেও দ্বিধায় পড়ে যান। তারা সিদ্ধান্ত নেন যুদ্ধ করবেন না। আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস ছিলেন এমনই একজন। তিনি ছিলেন মুআবিয়ার শিবিরে। কিন্তু যুদ্ধ শুরুর পর তিনি সরে দাঁড়ান। পরে তিনি বলতেন, 'সিফফিনের সাথে আমার কী সম্পর্ক? মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করার আমার কী দরকার? আমি যদি আরও ১০ বছর আগে মারা যেতাম, তাহলে ভালো হতো।'[৪৩৯]

তীব্র যুদ্ধ চললেও দুপক্ষই যুদ্ধের আদব বজায় রাখে। আলি রা. যুদ্ধ চলাকালেও নিজের তাসবিহ আদায় করছিলেন একনিষ্ঠতার সাথে।[৪৪০] কেউ যুদ্ধ থেকে পালাতে চাইলেও তাকে দেওয়া হচ্ছিল না কোনো বাধা। আলি রা.-এর সামনে কোনো শামি সেনাকে আটক করে আনা হলে তিনি বলতেন, 'আমি আল্লাহকে ভয় করি। আমি কখনোই তোমাকে হত্যা করব না। এরপর তিনি সেই সেনাকে বলতেন আর যুদ্ধ না করার ওয়াদা করো। ওয়াদা করলে তাকে চার দিরহাম উপহার দিয়ে বিদায় দিতেন।'[৪৪১]

একবার আলি রা.-এর শিবিরের এক ব্যক্তি বলে ওঠে, 'শামবাসীর ওপর আল্লাহর অভিশাপ নেমে আসুক।' আলি রা. তাকে থামিয়ে বলেন, 'তাদের গালমন্দ করো না। শামবাসীর মধ্যে আবদাল (বিশেষ মর্যাদাবান ওলিগণ) আছেন।'[৪৪২] এক রাতে আলি রা. আকাশের দিকে হাত তুলে বলেন, 'হে আল্লাহ, আপনি আমাকে মাফ করে দিন, তাদেরকেও মাফ করে দিন।'

সবচেয়ে বিস্ময়কর বিষয় ছিল, যুদ্ধ যখন থেমে যেত, তখন দুদলের সেনারাই একে অপরের সাথে আলাপ করত। এমনকি এক দলের সেনারা অন্যদলের শিবিরে গিয়ে জামাতে নামাজ আদায় করত কোনো দ্বিধা ছাড়াই। আম্মার ইবনু ইয়াসির রা. শহিদ হলে দুই দলের সেনারাই তার জানাজায় অংশ নেয়। এটি ছিল এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত।[৪৪৩]

---

৪৩৮. *আল-মুজামুল কাবির*, ২২/৩৮১। *আল-মুসতাদরাক আলাস সহিহাইন*, ৫৬৮৭

৪৩৯. *আত-তবাকাতুল কুবরা*, ৪/২৬৬

৪৪০. *শুআবুল ঈমান*, ২/১২০

৪৪১. *মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা*, ৩৭৮৫৯। ৩৭৮৬১

৪৪২. *ইতহাফুল খিয়ারাহ*, ৭/৩৫৪। *মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক*, ২০৪৫৫

৪৪৩. *সুনানে সাইদ ইবনে মানসুর*, ২/৩৯৭। *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, ১০/৩৬০। *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১/৪২৬। *বুগইয়াতুত তালাব*, ১/৩০২। *মাজমাউয য. ওয়ায়েদ*, ১২০৪৮

টানা দুদিন কোনো নিষ্পত্তি ছাড়াই যুদ্ধ চলতে থাকে। অবশেষে যুদ্ধ গড়ায় তৃতীয় দিনে। এ দিনের যুদ্ধে ৯৩ বছর বয়সে আম্মার ইবনু ইয়াসির রা. শহিদ হন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি নিজের অবস্থানে দৃঢ় ছিলেন। তিনি বলতেন, 'আল্লাহর কসম, শামি বাহিনী যদি আমাদের মারতে মারতে হিজর পর্বতের চূড়ায় পৌঁছে দেয় তখনও আমি নিশ্চিত থাকব, আমরা হকের পক্ষে আছি আর তারা ভ্রান্তিতে আছে।'[৪৪৪]

তবে শামি বাহিনীকে বিভ্রান্ত মনে করলেও তাদের তিনি কাফের মনে করতেন না। এক ব্যক্তি শামি বাহিনীকে কাফের বললে তিনি বলেন, 'আমাদের ও তাদের রাসুল এক। আমাদের ও তাদের কিবলা এক। তারা ফিতনার শিকার এবং সঠিক পথ থেকে সরে গেছে। যতক্ষণ না তারা বিভ্রান্তি থেকে ফিরে আসে, ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা আমাদের জন্য আবশ্যক।'[৪৪৫]

তৃতীয় দিনের যুদ্ধে আম্মার রা. রোজাদার ছিলেন। তিনি দুধ দিয়ে ইফতার করেন। ইফতারের কিছু পরেই তিনি শহিদ হয়ে যান। এভাবে বাস্তবায়িত হয় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আরেকটি ভবিষ্যদ্বাণী, যেখানে তিনি বলেছেন, 'দুনিয়াতে তুমি সর্বশেষ যা পান করবে তা হলো দুধ।'[৪৪৬] আম্মার ইবনু ইয়াসিরকে শহিদ করেছিল শামি বাহিনীর যোদ্ধা আবু গাদিয়া জুহানি। অর্থাৎ মুআবিয়া রা.-এর বাহিনীর হাতে আম্মার শহিদ হন। আমর ইবনুল আসও বিষয়টি স্বীকার করে বলেছেন, 'আমাদের লোকেরাই তাকে হত্যা করেছে।'[৪৪৭]

---

৪৪৪. *মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা*, ৩৭৮৪০

৪৪৫. *মুসনাদে আবু দাউদ তয়ালিসি*, ৬২৮; *মুসনাদে আহমাদ*, ১৮৮৮৪; *সহিহ ইবনে হিব্বান*, ৭০৮০

৪৪৬. *আল-আহাদ ওয়াল-মাসানি*, ২৭২; *মুসনাদে আহমাদ*, ১৯৩৯৩; *আত-তবাকাতুল কুবরা*, ৩/২৬৭

৪৪৭. *আস-সুনানুল কুবরা*, ৮২১৬; *আত-তবাকাতুল কুবরা*, ৩/২৬৩। অনেকে বলে সাবায়িরা তাকে হত্যা করেছে। এই কথার কোনো ভিত্তি নেই। ইমাম বুখারি ও মুসলিমও বলেছেন, 'আম্মার রা.-এর শাহাদাত হয়েছে আবু গাদিয়ার হাতে।' ইমাম মুসলিম বলেন, 'আবু গাদিয়া ইয়াসার ইবনু সাবি। তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। তিনি আম্মার রা.-এর হত্যাকারী।' (*আল-কুনা ওয়াল-আসমা*, ২/৬৬৯।) ইমাম বুখারি বলেন, 'আবু গাদিয়া যখন শামের বাহিনীর নেতাদের সাথে দেখা করতে আসতেন, তখন তিনি নিজের পরিচয় দিতে বলতেন, আম্মারের হত্যাকারী দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।' (*আত-তারিখুল আওসাত*, ৭২৮)। ইমাম দারাকুতনিও তাকে আম্মারের হত্যাকারী বলেছেন। (*সুওয়ালাতুস সুলামি লিদ-দারাকুতনি*, ৪৩১। *আল-মুতালাফ ওয়াল-মুখতালাফ*, ৪/১৭৯৩) ইবনু হাজার আসকালানি, ইবনু আবদিল বার, ইমাম যাহাবি, ইবনুল আসির জাযারি প্রমুখও এই মত দিয়েছেন। (বিস্তারিত জানতে দেখুন, *আল-ইসাবা*, ৭.২৬৮। *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ২/৫৪৪। *আল-ইসতিআব*, ৪/১৭২৫।)

আম্মার রা.-এর শাহাদাতের ফলে নতুন একটি বিষয় সামনে আসে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, 'আম্মারকে বিদ্রোহীদের একটি দল হত্যা করবে।'[৪৪৮]

আম্মার রা.-এর শাহাদাতের ফলে নিশ্চিত হয়ে যায়, মুআবিয়া রা.-এর দল বিদ্রোহী। এর ফলে শামি বাহিনীর অনেকে আলি রা.-এর বাহিনীতে যোগ দেন। এমনকি আমর ইবনুল আস রা.-ও ঘাবড়ে যান। তিনি মুআবিয়া রা.-কে বিষয়টি জানান। কিন্তু মুআবিয়া রা.-এর বিশ্বাস ছিল বিদ্রোহী বলতে তিনি উদ্দেশ্য নন। ফলে তিনি যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন।

যুদ্ধ চলতে থাকে। সফর মাসের ৭ তারিখে শুরু হওয়া এই যুদ্ধ সফর মাসের নয় তারিখেও সারাদিন অব্যাহত থাকে। এমনকি রাতেরবেলাও যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। তীব্র যুদ্ধের কারণে এ রাতকে নাম দেওয়া হয় লাইলাতুল হারির বা গর্জনের রাত।[৪৪৯] এ রাতে আলি রা. মাগরিবের নামাজ আদায় করেন সালাতুল খাওফের পদ্ধতিতে। যুদ্ধের তীব্রতার কারণে এ সময় তিনি মাসনুন দুআও পাঠ করতে পারেননি।

রাতের শেষ প্রহরে এসে হতাহতের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। যোদ্ধাদের তরবারিগুলো ভেঙে গেছে। বর্শা বাঁকা হয়ে আছে। ক্লান্ত সেনারা আর যুদ্ধ করতে পারছিল না। রাতের শেষদিকে দুপক্ষই যুদ্ধ থামিয়ে দেয়।[৪৫০] আলি রা. যুদ্ধবিরতির জন্য শামি বাহিনীর প্রধান আমর ইবনুল আস রা.-এর কাছে বার্তা পাঠান, নিহতের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। আমাদের উচিত যুদ্ধ থামিয়ে দাফনের কাজ শেষ করা। আমর ইবনুল আস ইতিবাচক সাড়া দেন। যুদ্ধ থামিয়ে দুই পক্ষ জানাজা ও দাফনে ব্যস্ত হয়।[৪৫১]

সকালেও দেখা যায় দুপক্ষের লোকেরা মিলেমিশে নিজেদের লাশগুলো দাফন করছে। একটি কবরের পাশে আমর ইবনুল আস বসে ছিলেন। সেখানে আলি রা.-এর পক্ষের একজনকে দাফন করতে আনা হলে তিনি কেঁদে বললেন, 'এই লোক ছিল সাহসী যোদ্ধা। আল্লাহর বিধান শক্তভাবে পালন করে এমন কত মানুষই না

---

৪৪৮. *সহিহ মুসলিম*, ৭৫০৬; *সুনানে তিরমিযি*, ৪১৭০। এই হাদিসটি সহিহ, অনেক সাহাবি এই হাদিস বর্ণনা করেছেন। মুহাদ্দিসগণ এই হাদিসকে মুতাওয়াতির হিসেবে গণ্য করেছেন। ইমাম নববি লেখেন, 'সিফফিনের যুদ্ধে সাহাবিরা হজরত আম্মার রা.-এর পেছনে থাকতেন, কারণ তারা জানতেন, এই যুদ্ধে আম্মার রা. হকের পক্ষেই থাকবেন।' (*তাহজিবুল আসমা ওয়াল-লুগাত*, ২/৩৮।)

৪৪৯. *লিসানুল আরব*, ৫/২৬০। *ফাতহুল বারি*, ১১/২২৩

৪৫০. *আল-আখবারুত তিওয়াল*, ১৮৮

৪৫১. *আনসাবুল আশরাফ*, ২/৩২৮

জানি এই যুদ্ধে নিহত হয়েছে।'[৪৫২] যুদ্ধবিরতির সময় আলি ও মুআবিয়া রা. নিহতদের পরিদর্শন করতে এলে তারা দুদলের নিহতদের জন্যই রহমতের দুআ করেন।

এই যুদ্ধে ইরাকি বাহিনীর সেনাসংখ্যা ছিল ১ লাখ। শামের বাহিনীর সেনাসংখ্যা ছিল ৭০ হাজার। যুদ্ধে দুদলের মোট নিহত হয় ৭০ হাজার। এর মধ্যে শামের ৪৫ হাজার। ইরাকের ২৫ হাজার।[৪৫৩]

যুদ্ধবিরতি

শুরুতে যুদ্ধবিরতি হয়েছিল আলি রা.-এর অনুরোধে, যেন নিহতদের দাফন সারা যায়। কিন্তু পরদিন সকালেও দুই বাহিনীর অবস্থা ছিল অবসাদগ্রস্ত। মূলত দুদলই তখন চাচ্ছিল যুদ্ধবিরতি দীর্ঘ হোক। বিশেষ করে শামি বাহিনীর অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। তারা প্রচুর সেনা হারিয়েছিল। যদি আর একদিন যুদ্ধ চলত, তাহলে তাদেরকে অবশ্যই পরাজয় স্বীকার করতে হতো। মুআবিয়া রা.-ও সংকট ধরতে পেরেছিলেন। তিনি তাই সন্ধির দিকেই আগ্রহী হলেন। তার শিবির থেকে বার্তা এলো আলি রা.-এর কাছে। শামের বাহিনী সন্ধি করতে রাজি।

আলি রা.-এর কাছে আগত শামিদের দূত বলল, আমাদের মাঝে ও আপনাদের মাঝে চলমান সংকট নিরসনের জন্য আল্লাহর কিতাবের ফয়সালাই যথেষ্ট। আলি রা. বললেন, আমি তো এই প্রস্তাব সবার আগে গ্রহণ করব। মূলত আলি রা. দ্রুত সন্ধি করতে চাইছিলেন। কারণ—

১। ইরাকি সেনারা যুদ্ধে এগিয়ে থাকলেও নিজেদের অস্থিরচিত্তের কারণে তাদের মনোবলে চিড় ধরেছিল। বিশেষ করে সেনাপতিদের অনেকে যুদ্ধ করতেও অনাগ্রহী হয়ে ওঠে। আলি রা. তার বাহিনীতে ভাঙনের আলামত দেখেন। এমনকি তিনি বলতে বাধ্য হন, 'হায়, তোমাদের বদলে যদি বনু ফারাসের ১ হাজার সেনা আমার সাথে থাকত।'[৪৫৪]

২। শুরু থেকেই আলি রা. যুদ্ধ করতে অনাগ্রহী ছিলেন। তিনি ময়দানে এসেছিলেন বাধ্য হয়ে, শামবাসীর বেয়াড়া মনোভাবের কারণে। এখন যেহেতু সন্ধি করার মতো পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, তাই তিনি দ্রুত রাজি হয়ে গেলেন।

দুই পক্ষের মাঝে সন্ধি নিয়ে আলোচনা চলতে থাকে। আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয়, উভয় পক্ষ থেকে একজন করে ব্যক্তি নির্ধারণ করা হবে। তারপর এই দুজন

---

৪৫২. *আনসাবুল আশরাফ*, ২/৩২৮

৪৫৩. বিস্তারিত জানতে দেখুন, *তারিখু খলিফা ইবনি খইয়াত*, ১৯৩; *মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা*, ৩৭৮৬০

৪৫৪. *কিতাবুল আসার*, ৯২৯

একসাথে বসে ফয়সালা করবেন কুরআনের বিধান অনুসারে। নির্ধারিত দুজন যে ফয়সালা করবেন, উভয় দল তা মেনে নেবে। দুই শিবিরেই শুরু হয় সন্ধির প্রস্তুতি। কিন্তু লুকিয়ে থাকা সাবায়ি চক্র চেষ্টা করে এই প্রচেষ্টা বানচাল করে দিতে। তারা কোনোভাবেই সন্ধি মেনে নিতে পারছিল না। এ সময় দুই শিবিরে উপস্থিত কারি সাহেবদের একাংশ খারিজি হয়ে যায়। তারা হজরত আলি রা.-কে বলে, 'আমিরুল মুমিনিন, শামের লোকদের ব্যাপারে আমরা কীসের অপেক্ষায় আছি। কেন তাদের দিকে তরবারি তাক করে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি না। হয়তো আল্লাহ তাদের মাঝে ও আমাদের মাঝে ফয়সালা করে দেবেন।'

তাদের এ ধরনের ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথা শুনে সাহল ইবনু হুনাইফ রা. দাঁড়িয়ে বলেন, 'হে লোকেরা, নিজের মতকে দুর্বল ভাবো। আমরা হুদাইবিয়ার দিনের কথা ভুলে যাইনি।'[৪৫৫] সাহল ইবনু হুনাইফ বলে চলেন, 'হুদাইবিয়ার দিন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই আবু জানদালকে কাফেরদের হাতে তুলে দিতে বলেন। এতে সাহাবিদের কেউ কেউ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তারা ভাবেন, আমরা যদি হকের ওপরই থাকি তাহলে কাফেরদের সাথে এই সন্ধি আর নম্রতা কেন? কিন্তু পরে প্রমাণ হয়েছিল, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করাই ছিল কল্যাণকর এবং সাহাবিরা না বুঝেও তার কথায় আমল করেছিলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেছেন তারা তা মেনে নিয়েছেন।'[৪৫৬] সাহল বিন হুনাইফ দীর্ঘ আলোচনা করেন, কিন্তু বিশৃঙ্খলাকারী দলটি তা গ্রহণ করেনি। তারা দুই শিবির থেকেই পৃথক হয়ে যায়। পরে তারা পরিচিত হয় খারিজি নামে।[৪৫৭]

সালিশ নির্ধারণ

দুই শিবির থেকেই নিজেদের প্রতিনিধি মনোনীত করা হলো। আলি রা.-এর পক্ষ বেছেন নিলেন আবু মুসা আশআরি রা.-কে। মুআবিয়া রা.-এর পক্ষ বেছে নিলেন আমর ইবনুল আস রা.-কে। ইতিহাসের প্রচলিত অনেক বইপত্রে দেখানো হয়, আবু মুসা আশআরি রা. ছিলেন সরল ও বোকা। অপরদিকে আমর ইবনুল আস রা. ছিলেন ধূর্ত। এটি নেহাতই মিথ্যা প্রচারণা, এবং মহান সাহাবির চরিত্রে কালিমা লেপন।

আবু মুসা আশআরি রা. ছিলেন বয়স, মেধা, জ্ঞান, প্রজ্ঞায় ঋদ্ধ। উভয় বাহিনীর কাছেই তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ছিল। তাঁর যোগ্যতার স্বীকৃতি দিয়েছেন স্বয়ং নবিজি

---

৪৫৫. *মুসনাদে আহমাদ*, ১৫৯৭৫; *তাফসিরুন নাসায়ি*, ২/৩০৬

৪৫৬. *মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা*, ৩৭৯১৪

৪৫৭. খারিজিদের উদ্ভবের ইতিহাস আরও বিস্তৃত। আমাদের আলোচনার সঙ্গে খুব বেশি প্রাসঙ্গিক নয় বলে সে আলোচনা করা হলো না।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। নবিজি তাকে জর্ডানের গভর্নর নিযুক্ত করেন।[৪৫৮] উমর রা. ও উসমান রা.-এর যুগে তিনি কুফা ও বসরার গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অপরদিকে আমর ইবনুল আস রা.-ও ছিলেন একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। নবিজি নিজেই তাকে যাতুস সালাসিলের যুদ্ধে সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন। নবিজি তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন, 'কুরাইশদের মাঝে সবচেয়ে নেককার হলেন আমর ইবনুল আস।'[৪৫৯]

দেখা যাচ্ছে দুদিকেই দুজন যোগ্য মানুষকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। তাদের দুজনকে সালিশের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে ৩৭ হিজরির ২২ রজব আলি রা. কুফায় ফিরে এলেন। অনেকদিন তিনি কুফার বাইরে ছিলেন, তাই দ্রুত এখানে ফেরা জরুরি ছিল।

চুক্তিপত্র

সিফফিনের যুদ্ধের এক সপ্তাহ পর ১৭ সফর আলি রা. ও মুআবিয়া রা.-এর মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তির ধারাগুলো ছিল—

১। আলি রা.-এর শাসন চলবে ইরাকে, মুআবিয়া রা.-এর শাসন চলবে সিরিয়ায়। তারা উপস্থিত থাকেন বা অনুপস্থিত, এই শাসন বহাল থাকবে।

২। আলি রা.-এর পক্ষ থেকে আবু মুসা আশআরি রা. ও মুআবিয়া রা.-এর পক্ষ থেকে আমর ইবনুল আস রা. সালিশ পরিচালনা করবেন।

৩। উভয় প্রতিনিধি ও তাদের পরিবারের নিরাপত্তা দেওয়া হবে।

৪। উভয় দলের মাঝে যুদ্ধ বন্ধ থাকবে। এ সময় আলোচনা চলতে থাকবে।

৫। আলোচনার জন্য উভয় প্রতিনিধি ইরাক ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী কোনো স্থান নির্বাচন করবেন।

৬। সিদ্ধান্তের জন্য রমজান পর্যন্ত সময় নির্ধারিত, তবে উভয় প্রতিনিধি চাইলে এই সময় আরও বাড়াতে পারবেন।

৭। যুদ্ধবিরতি চলাকালে উভয় বাহিনীর জানমাল, পরিবার-পরিজন সবকিছু নিরাপদ থাকবে। কেউ কারও ওপর হামলা করবে না।

---

৪৫৮. *তারিখু খলিফা ইবনি খইয়াত*, ৯৭

৪৫৯. *তিরমিযি*, কিতাবুল মানাকিব, বাবু মানাকিবু আমর ইবনুল আস।

এই চুক্তিতে আলি রা.-এর পক্ষ থেকে স্বাক্ষর করেন হাসান রা., হুসাইন রা., আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা., আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা., আশআস ইবনু কাইস রা., সাহল ইবনু হুনাইফ রা., রাফি ইবনু খাদিজ রা., উকবা ইবনু আমির রা.। অপরদিকে মুআবিয়া রা.-এর পক্ষে স্বাক্ষর করেন হাবিব ইবনু মাসলামা ফিহরি, মুআবিয়া ইবনু হুদাইজ, আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস, আবদুল্লাহ ইবনু খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ প্রমুখ।[৪৬০]

এই চুক্তির ফলে আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধবিরতি শুরু হয়। ইরাকি ও শামি বাহিনী নিজ নিজ শিবিরে ফিরে যায়। আলি রা. চলে যান কুফাতে আর মুআবিয়া রা. চলে যান দামেশকে। মুসলিমবিশ্বে ফিরে আসে স্বাভাবিক জনজীবন। অপরদিকে সাবায়ি ও অন্য ষড়যন্ত্রকারীদের মাঝে দেখা দেয় অনৈক্য। তারা অভ্যন্তরীণ কোন্দলে জড়িয়ে পড়ে।
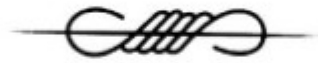
৪৬০. *আল-আখবারুত তিওয়াল*, ১৫২। *আনসাবুল আশরাফ*, ২/৩৩৪। *তারিখুত তবারি*, ৫/৫৪

তাহকিমের (সালিশের) ঘটনা—সত্য-মিথ্যার বেসাতি

সিফফিন যুদ্ধের ৮ মাস পর শুরু হয় দুই পক্ষের প্রতিনিধিদের আলোচনা। ৩৭ হিজরির রমজান মাসে ইরাক ও শামের সীমান্তবর্তী আজরুহ নামক স্থানে তারা একত্র হন। তাদের এই মজলিসকে পরে নামকরণ করা হয় 'মাজলিসুত তাহকিম' বলে।[৪৬১] এই মজলিসে অংশ নিতে মুআবিয়া রা. সিরিয়া থেকে ইরাকের সীমান্তে চলে আসেন। আলি রা.-ও হয়তো আসতেন, কিন্তু নব্য ফিরকা খারিজিরা আচমকা বিদ্রোহ করে বসলে তিনি তাদের দমনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সে সময় তিনি কুফা ত্যাগ করার অর্থ ছিল খেলাফতকে হুমকির মুখে ফেলে দেওয়া, তাই তিনি আর কুফা থেকে বের হননি। মুআবিয়া রা. প্রতিনিধি পাঠিয়ে আলি রা.-কে আসতে বলেছিলেন। আলি রা. বলেছিলেন, 'এখন আসা সম্ভব নয়। আমি আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা.-কে পাঠাচ্ছি। সে আমাকে বিস্তারিত জানাবে।' আলি রা.-এর পক্ষ থেকে আবু মুসা আশআরি রা.-সহ ৪০০ জনের একটি দল নির্ধারিত স্থানে চলে আসে।[৪৬২] মুআবিয়া রা.-এর সাথেও ৪০০ জন ছিলেন।

মাজলিসুত তাহকিম সম্পর্কে আমাদের সামনে যেসব বর্ণনা আছে তার মধ্যে নির্ভরযোগ্য সনদে বর্ণনা এসেছে খুবই কম। বর্ণনাগুলোর বেশিরভাগই জাল ও বানোয়াট। এর মাঝে কিছু কিছু তো এত জঘন্য যা বিশ্বাস করাও কোনো মুমিনের পক্ষে সম্ভব নয়। রাফিজিরা তাহকিমের ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রচুর জাল বানোয়াট বর্ণনা ছড়িয়ে দিয়েছে। এসব বর্ণনার সারকথা হলো, তাহকিমের মজলিসে আমর ইবনুল আস রা. নিজের ধূর্ততা দেখান, অপরদিকে আবু মুসা আশআরি রা. সরলতার কারণে পরাস্ত হন। অথচ বাস্তবতা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। একাধিক বিশুদ্ধ বর্ণনা থেকে যা বোঝা যায়, তা হলো, দুপক্ষই নিজ নিজ দলিল উপস্থাপন করেছিলেন, কিন্তু তারা কেউই কারও সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি।

এটি খুবই স্বাভাবিক ছিল, কারণ তাঁরা দুজনই ছিলেন ফিকহ, যুক্তিতর্ক ও প্রজ্ঞায় অতুলনীয়। ফলে দীর্ঘ আলোচনা করেও সমাধানের কোনো পথ খুঁজে পাওয়া যায়নি। প্রাথমিকভাবে যখন বিষয়টির নিষ্পত্তি করা যায়নি, তখন তারা চিন্তা করেন

---

৪৬১. *তারিখুত তবারি*, ৫/৬৭

৪৬২. *আনসাবুল আশরাফ*, ২/৩৪৬

তৃতীয় কাউকে খলিফা হিসেবে মনোনীত করতে। তখন উম্মাহর মাঝে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.। দুজন সালিশই তাঁর কথা চিন্তা করেন। আবু মুসা আশআরি রা. বলেন, 'এ কাজের জন্য তাঁর চেয়ে যোগ্য কাউকে আমি দেখি না।' আমর ইবনুল আস রা.-ও তাঁর কথায় সম্মতি জানান। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-কে এই প্রস্তাব দেওয়া হলে তিনি বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখাননি। তিনি সরাসরি বলে দেন, এই মহান দায়িত্ব আমাকে দেওয়া যায় না। আমি এর যোগ্যও নই। মূলত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বুঝতে পেরেছিলেন, তিনি দায়িত্ব নিলেও সমস্যার সমাধান হবে না। উসমান রা.-এর হত্যাকারীদের কিসাসের মাসআলা তো আসবেই। এখানে সামান্য দ্বিমত হলে শামবাসী আবার বিদ্রোহ করবে। তা ছাড়া রাজনীতিতেও ইবনে উমর রা.-এর তেমন কোনো আগ্রহ ছিল না। তিনি তাই ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু থেকে দূরে থাকাই পছন্দ করলেন।

কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে সংলাপ বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলো। বিষয়টি ছিল দুপক্ষের জন্যই বেদনাদায়ক। তারা সংকট নিরসনে আন্তরিক ছিলেন, কিন্তু কোনো উপায় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। তারা ঐক্য গড়তে চাচ্ছিলেন, কিন্তু এর কোনো সুযোগ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। এভাবে কোনো সমাধানে না পৌঁছেই আলোচনা সমাপ্ত হয়। আলোচনার শেষদিকে আমর ইবনুল আস রা. আবু মুসা আশআরি রা.-কে জিজ্ঞেস করেন, 'তাহলে আপনার মত কী (অর্থাৎ এখন কী করণীয়)?'

আবু মুসা আশআরি রা. বলেন, 'আমার দৃষ্টিতে আলি রা. এমন এক ব্যক্তি, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যার ওপর ইনতিকালের আগ পর্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। (অর্থাৎ নবিজি যেহেতু তার ওপর সন্তুষ্ট ছিলেন, আপনারাও তার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে বাইআত হয়ে যান।)' আমর ইবনুল আস রা. জিজ্ঞেস করেন, 'আমাকে ও মুআবিয়া রা.-কে আপনি কোন অবস্থানে রাখবেন? (অর্থাৎ, আমরা যদি আলি রা.-এর হাতে বাইআত না হই, তাহলে আমাদের ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত নেবেন?)'

আমর ইবনুল আস রা.-এর প্রশ্নটি ছিল খুবই কঠিন। কিন্তু আবু মুসা আশআরি রা. অত্যন্ত দূরদর্শিতার সাথে এই প্রশ্নের জবাব দিলেন। তিনি বললেন, 'আলি রা. যদি তোমাদের সাহায্য চান, তাহলে তাঁকে সাহায্য করার মতো যোগ্যতা তোমাদের আছে। যদি তিনি তোমাদের মুখাপেক্ষী না হন, তাহলেও কিছু যায়-আসে না। (তোমাদের ইসলাম গ্রহণের আগে) আল্লাহর আইন তোমাদের ছাড়াই চলে এসেছে।'[৪৬৩]

৪৬৩. *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, ৪৬/১৭৫

এই উত্তরে আবু মুসা আশআরি রা.-এর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়, যা থেকে তাঁর ওপর আরোপিত শিয়াদের বানোয়াট অভিযোগের অসারতাও বুঝে আসে। এই উত্তরে একদিকে তিনি আলি রা.-এর শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখেন, অপরদিকে বিরোধীপক্ষের সাথে আলোচনার সম্ভাবনাও নাকচ করেননি। তাঁর বক্তব্যে ইঙ্গিত ছিল প্রয়োজন হলে দুই পক্ষ একত্র হয়েও কাজ করতে পারে। নিঃসন্দেহে উঁচুস্তরের ফিকহি রুচিবোধ ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা না থাকলে এমন কথা বলা সম্ভব হতো না।

আমর ইবনুল আস রা. নীরব থেকে আবু মুসা আশআরি রা.-এর কথা সমর্থন করেন। এরপর দুপক্ষের লোকজন কোনো সংঘর্ষ ছাড়াই নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যায়। খলিফা ইবনু খইয়াত এই ঘটনার সমাপ্তি টানতে গিয়ে লিখেছেন, 'উভয় মধ্যস্থতাকারী কোনো বিষয়ে একমত হননি। ফলে জনগণ পৃথক হয়ে যায়।'[৪৬৪]

নিষ্ফল মাজলিসুত তাহকিম ও পরবর্তী অবস্থা

কোনো সমাধান ছাড়াই শেষ হলো মাজলিসুত তাহকিম। দুপক্ষই নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যায়। ৩৭ হিজরির জিলকদ মাসে মুআবিয়া রা. স্বাধীন রাষ্ট্রের গোড়াপত্তনের ঘোষণা দেন। পরের নয় মাস দুদলের মাঝে আর কোনো লড়াই হয়নি। সবাই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত ছিল। তবে এর পরেও মাঝে মাঝেই সীমান্তে দুদলের মাঝে সংঘর্ষ হতো। তবে এটি হতো দু-দলের ক্ষুদ্র কোনো অংশের মাঝে, যার বড় কোনো প্রভাব পড়ত না। ৩৮ হিজরিতে মুআবিয়া রা. মিশর দখল করেন। এর ফলে তার হাতে শাম ও মিশরের বিস্তীর্ণ এলাকা চলে আসে। যদিও বাহ্যত কোনো সুসম্পর্ক গড়ে ওঠেনি, তবে আলি রা. আর কখনো শামে যুদ্ধ করার কথা ভাবেননি। তবে তাঁর শাসনের শেষদিকে মুআবিয়া রা.-এর সাথে তাঁর একটি চুক্তি হয়, যার মূল কথা ছিল, 'কোনো পক্ষ তাদের সীমান্ত অতিক্রম করবে না এবং একে অপরের এলাকায় হামলা করবে না। এর ফলে দুপক্ষের এলাকায় ভারসাম্য ফিরে আসে।'

৪৬৪. *তারিখু খলিফা ইবনি খইয়াত*, ১৯২
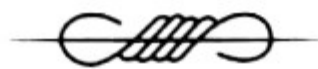
সংক্ষেপে জংগে সিফফিনসংক্রান্ত কিছু মৌলিক কথা

১। মুআবিয়া রা. কখনো খেলাফতের দাবি করেননি, কিংবা নিজেকে আলি রা.-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ দাবি করেননি। জংগে সিফফিনের পেছনে ক্ষমতার দাবি ছিল না, বরং এটি ছিল উসমান রা.-এর হত্যাকারীদের বিচারপ্রক্রিয়া নিয়ে সৃষ্ট মতবিরোধ।

২। মুআবিয়া রা. চাচ্ছিলেন আগে উসমান রা.-হত্যার বিচার হবে, তারপর বাইআত হবেন। অপরদিকে আলি রা. চাচ্ছিলেন, আগে সবাই বাইআত হবে, তারপর উসমান রা.-হত্যার বিচার হবে।

৩। তাহকিমের ঘটনা নিয়ে যেসব বর্ণনা আছে তার বেশিরভাগই শিয়াদের বানানো, নির্জলা মিথ্যা কথা।

জংগে জামাল ও জংগে সিফফিনে অংশগ্রহণকারী সাহাবিদের সংখ্যা

সাধারণত প্রচার করা হয় মুশাজারাতে সাহাবায় সকল সাহাবিই জড়িয়ে পড়েছিলেন। শীর্ষ সাহাবিদের কেউই এ থেকে বাদ যাননি। প্রকৃত বাস্তবতা এমন নয়। মুশাজারাতে সাহাবার কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন শীর্ষ সাহাবিদের অল্প কয়েকজন। এ ছাড়া অন্য সাহাবিদের বেশিরভাগ এই বিষয়ে জড়ানো থেকে বিরত থেকেছেন। এমনকি জংগে জামাল ও জংগে সিফফিনে সরাসরি জড়িয়েছেন এমন সাহাবির সংখ্যা বেশি নয়। মুহাম্মদ ইবনু সিরিন বলেন, সাহাবিদের মধ্যকার সংঘটিত ঘটনাবলির সময় ১০ হাজার সাহাবি জীবিত ছিলেন, তবে ১০০ বেশি সাহাবি এতে জড়াননি।[৪৬৫]

সে সময় বেশিরভাগ সাহাবির অবস্থা বর্ণনা করেছেন বুকাইর বিন আশাজ। তিনি বলেন, 'বদরি সাহাবিরা উসমান রা.-এর শাহাদাতের পর নিজেদের ঘরেই অবস্থান করতে থাকেন। নিজেদের কবরের উদ্দেশে বের হওয়ার আগে তারা আর বের হননি (অর্থাৎ চলমান অস্থিরতায় নিজেদের জড়াননি)।' ইমাম ইবনু তাইমিয়া বলেন, 'জমহুর সাহাবিদের অধিকাংশ এই অস্থিরতায় নিজেদের জড়াননি।'[৪৬৬]
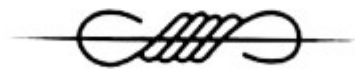
৪৬৫. বর্ণনাটির পুরো সনদ আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ, তাঁর পিতা আহমদ ইবনু হাম্বল থেকে, তিনি ইসমাইল ইবনু উলাইয়া থেকে, তিনি আইয়ুব সখতিয়ানি থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবনু সিরিন থেকে। ইমাম ইবনু তাইমিয়া এই সনদ সম্পর্কে বলেন, পৃথিবীর বুকে বিশুদ্ধতম সনদের মধ্যে এটি একটি। ইবনু সিরিনের মুরসাল বিশুদ্ধ মুরসালসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

৪৬৬. *মিনহাজুস সুন্নাহ*, ২/২৩৬

জংগে সিফফিনসংশ্রান্ত সংশয় ও সমাধান

ইসলামের ইতিহাসের যে-কয়টি বিষয় নিয়ে সবচেয়ে বেশি বিভ্রান্তি ও সংশয় ছড়ানো হয়েছে, সিফফিনের যুদ্ধ তার একটি। রাফেয়ি ও নাসিবি দুপক্ষই এই যুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করায় ছিল সক্রিয়। এই যুদ্ধকে কেন্দ্র করে এত বেশি বানোয়াট বর্ণনা আমদানি করা হয়েছে, যা হয়তো গণনা করাও সম্ভব নয়। বাংলায় প্রকাশিত বইপত্রেও এসব বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে বেশ জোরের সাথেই। বিশেষত আলিয়া মাদরাসা ও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে সিফফিনের যুদ্ধের ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে চরম বিকৃত করে। সুতরাং এ সংক্রান্ত সংশয়গুলো ভালো করে জানা থাকা দরকার।

সংশয় ১ – অনেকে বলে থাকেন, আম্মার ইবনু ইয়াসির রা.-কে হত্যা করেছে সাবায়িদের একটি অংশ। তার হত্যায় শামবাসী জড়িত ছিল না।

সমাধান – এটি সম্পূর্ণ ভুল। এটি মূলত আহলে বাইত বিদ্বেষী মারওয়ানি নাসিবিদের প্রচারণা। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআতের আলেমদের সর্বসম্মত মত হলো, আম্মার ইবনু ইয়াসির রা. সিরিয়ান বাহিনীর হাতে শহিদ হন। ইমাম ইবনু তাইমিয়া বলেন, 'চার ইমাম কিংবা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআতের কেউ এই মতের প্রবক্তা নন। বরং অনেক মারওয়ানি নাসিবি ও তাদের সমচিন্তার লোকেরা এটা বলে থাকে।'[৪৬৭] ইমাম কুরতুবি, ইমাম ইবনু কাসির, ইবনুল কাইয়িম প্রমুখও এই মতটি প্রত্যাখ্যান করেছেন।[৪৬৮]

সংশয় ২ – বাংলায় লিখিত অনেক বইপত্রেও দেখা যায়, সিফফিনের যুদ্ধ চলাকালে আমর ইবনুল আস রা.-এর পরামর্শে মুআবিয়া রা.-এর বাহিনী বর্শার মাথায় কুরআন কারিম বেঁধে নেয়। এতে আলি রা.-এর বাহিনী যুদ্ধ থামাতে বাধ্য হয়। এই বর্ণনার সত্যটা কতটুকু।

---

৪৬৭. *মিনহাজুস সুন্নাহ*, ৪/৪০৬

৪৬৮. বিস্তারিত জানতে দেখুন, *আস-সাওয়ায়িকুল মুরসালা*, ১/১৮৪।

সমাধান – মূল বর্ণনাটি এসেছে *তারিখুত তবারিতে*।[৪৬৯] এই বর্ণনা করেছেন আবু মিখনাফ, যে কিনা একজন প্রসিদ্ধ রাফিজি। তার সম্পর্কে এই বইয়ের শুরুতে আলোচনা করা হয়েছে। আবু মিখনাফের এসব বর্ণনার মাধ্যমে সরাসরি সাহাবিদের বড় ধরনের অপরাধী সাব্যস্ত করার সুযোগ আছে, তা গ্রহণযোগ্য নয়। এই ঘটনাটি ভিন্ন সনদেও পাওয়া যায়[৪৭০], যেখানে ইবনে শিহাব যুহরি মুরসাল সনদে বিবৃত করেছেন। উলুমুল হাদিসের স্বীকৃত মূলনীতি হলো, এমন স্পর্শকাতর প্রসঙ্গে যুহরির মুরসাল ধর্তব্য নয়। ইয়াজিদ ইবনু আয়াজ থেকে আরেকটি সনদেও এই ঘটনা পাওয়া যায়।[৪৭১] এই ইয়াজিদ ইবনু আয়াজও একজন দুর্বল ও মিথ্যুক রাবি। জারহ তাদিলের ইমামগণ তার বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করেছেন।[৪৭২]

এই ঘটনা মাসউদিও তার *মুরুজুয যাহাবে* এনেছেন, কিন্তু মাসউদি নিজেই গ্রহণযোগ্য নন, কারণ তিনি ছিলেন কট্টর রাফিজি, অপরদিকে তিনি এই ঘটনা এনেছেন সনদবিহীন।[৪৭৩] *আনসাবুল আশরাফ* গ্রন্থে বালাজুরি ঘটনাটি তার শাইখ বকর ইবনু হাইসাম থেকে বর্ণনা করেছেন। বকর ইবনু হাইসাম একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি। তার সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। এমন স্পর্শকাতর বিষয়ে অজ্ঞাত একজন ব্যক্তির বর্ণনা ধর্তব্য নয়।

সংশয় ৩ – শামের লোকদের একদিকে বলা হচ্ছে বিদ্রোহী, আবার মুআবিয়া রা.-কে বলা হচ্ছে মুজতাহিদ, এটি কী করে সম্ভব। বিদ্রোহ একটি অপরাধ ও কবিরা গুনাহ। অপরদিকে ইজতিহাদ একটি বড় দীনি খেদমত। এই দুটির একসাথে সমন্বয় হয় কী করে?

সমাধান – ইজতিহাদ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ফিকহি যোগ্যতা আছে এমন কেউ শরয়ি দলিল ও বাস্তব পরিস্থিতির পর্যালোচনার মাধ্যমে নতুন কোনো সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান বের করা। এ ক্ষেত্রে তার সিদ্ধান্ত ভুলও হতে পারে। কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারবেন না, তার সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল। বরং ফকিহরা বলেই গেছেন, মুজতাহিদ ভুল করতে পারেন, সঠিকও করতে পারেন।

---

৪৬৯. *তারিখুত তবারি*, ৫/৪৮-৫৬, ৫/৬৭-৭১

৪৭০. *তারিখুত তবারি*, ৫/৫৭

৪৭১. *আনসাবুল আশরাফ*, ২/৩৪৩

৪৭২. তার সম্পর্কে ইমামদের মত জানতে দেখুন, *তাকরিবুত তাহযিব*, জীবনী নং-৭৭৬১; *মাওসুআতু আকওয়ালিদ দারা কুতনি*, ২/৭২২; *আত-তারিখুল কাবির*, ৮/৩৫১; *আল-কামিল ফি যুয়াফাইর রিজাল*, ৯/১৪১

৪৭৩. *মুরুজুয যাহাব*, ৩/১৩৮

বোঝা যাচ্ছে মুজতাহিদ কর্তৃক ভুল ইজতিহাদের সম্ভাবনা থাকেই। এখন ভুল ইজতিহাদ হলে ইজতিহাদটি অবশ্যই কোনো না কোনো অবস্থানে থাকবে। যেমন ধরা যাক বিমানে ওঠার পর দুই ফকিহের মাঝে ইখতিলাফ হলো। একজন বললেন, বিমানেই নামাজ পড়তে হবে। অন্যজন বললেন, এখানে নামাজ হবে না, নেমে আদায় করব। তিনি বিমানে নামাজ আদায় করলেন না, এদিকে বিমান থেকে নামতে নামতে নামাজের সময় চলে গেল। এরপর অন্য আলেমদের ঐকমত্যে জানা গেল, তার ইজতিহাদটি ভুল ছিল। তাহলে কী দাঁড়াল ফলাফল, একদিকে তিনি ইজতিহাদ করেছেন, অন্যদিকে তিনি নামাজ কাজা করেছেন। এ ক্ষেত্রে সমাধান কী? এ ক্ষেত্রে সমাধান হলো, একদিকে বলা হবে ইজতিহাদ করেছেন, অপরদিকে বলতে হবে তিনি যেন কাজা নামাজ আদায় করে নেন।

শামবাসীর বিষয়টিও এমন। একদিকে তারা ইজতিহাদ করেছেন, যদিও তা ভুল, অপরদিকে তারা বিদ্রোহ করেছেন। ইজতিহাদের কারণে তাদের বিদ্রোহ বৈধতা পাবে না, শুধু এটুকু বলা হবে, স্বাভাবিক অবস্থায় বিদ্রোহ কবিরা গুনাহ, কিন্তু এখন ইজতিহাদের কারণে এ ক্ষেত্রে তাদেরকে অপারগ মনে করা হবে। আলি রা.-এর আচরণ থেকেও আমরা বিষয়টি সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশনা পাই। একদিকে তিনি জংগে জামাল ও জংগে সিফফিনে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করেছেন। স্বাভাবিক বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যে ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয় তাই নিয়েছেন, অপরদিকে তিনি বিরোধীপক্ষের নিহতদের জান্নাতিও বলেছেন। এ থেকে বোঝা যায়, একদিকে তিনি তাদের বিদ্রোহী ধরেছেন, অপরদিকে তাদের ভুল ইজতিহাদকেও স্বীকৃতি দিয়েছেন।

তবে একটি বিষয় পরিষ্কার করা প্রয়োজন। ইজতিহাদ শব্দটি আরোপিত হবে দুদলের শীর্ষ নেতাদের ওপর। কারণ তারা ছিলেন সাহাবায়ে কেরাম। সাধারণ সেনারা ছিল তাদের অনুসারী মাত্র। এই সাধারণ সেনাদের মধ্যে আবার সাবায়ি, ফিতনাবাজ, বিদ্রোহী, খারিজি সবাই ছিল। সুতরাং ইজতিহাদ যখন বলা হয়, তখন তা দুইদলের প্রধানদের ক্ষেত্রে বলা হয়। এমন নয় যে দুদলের সাধারণ সেনারাও মুজতাহিদ ছিলেন।

সংশয় ৪ – শামবাসী শুধু উসমানহত্যার বিচার চেয়েছিল। তারা তো আলি রা.-কে খলিফা হিসেবে মানতে অস্বীকৃতি জানায়নি। তবুও তাদের বিদ্রোহী বলা হবে কেন?

সমাধান – ফকিহদের মতে বিদ্রোহের জন্য খলিফার বরখাস্তের দাবি তোলা জরুরি নয়। বরং কেউ যদি কোনো এলাকা নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যায়, তাহলেই সে বিদ্রোহী বলে গণ্য হবে। স্বয়ং মুআবিয়া রা.-এর আমলও এমনটাই প্রমাণ করে।

তাঁর শাসনামলে বিশিষ্ট সাহাবি হুজর ইবনে আদি রা. তাঁর কিছু সিদ্ধান্তে ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বারবার বলতেন, 'আমি মুআবিয়ার বাইআতের ওপর স্থির আছি।'[৪৭৪] কিন্তু তিনি বেশ কিছু সশস্ত্র অনুসারী নিয়ে ছোট একটি এলাকা দখলে নেন। কিন্তু মুআবিয়া রা. তাঁকে কোনো ছাড় দেননি। তাঁকে বিদ্রোহী গণ্য করে মৃত্যুদণ্ড দেন।[৪৭৫]

এ থেকে স্পষ্ট হয়, বিদ্রোহের জন্য খেলাফত কায়েম করা বা খলিফাকে শতভাগ প্রত্যাখ্যান করা শর্ত নয়। বরং কোনো এলাকা নিজের নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার মানেই বিদ্রোহ করা।

আবদুর রহমান ইবনুল আশআসের ঘটনাই দেখা যাক। উমাইয়া যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই জেনারেল কিন্তু আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের বিরুদ্ধে সরাসরি অবাধ্যতার কথা বলেননি। তিনি শুধু এটুকু বলেছেন, 'হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফকে ইরাকের গভর্নরের পদ থেকে সরানো হোক। ইবনুল আশআসের সাথে ছিল আলেম ও নেককারদের এক বিশাল জামাত। ইবনুল আশআস বলতেন, 'আমিরুল মুমিনিনের নেতৃত্বের প্রতি আমরা বিদ্রোহ করিনি। আমরা তার বরখাস্ত চাই না। আমাদের কথা হলো, তিনি হাজ্জাজকে কেন আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন? আমরা শুধু তার বহিষ্কারাদেশ চাই।'[৪৭৬]

ইবনুল আশআসের এই দাবি অন্যায় কিছু ছিল না। হাজ্জাজ তো সেই খুনি রক্তপিপাসু দানব যার হাতে ১ লাখ ২০ হাজার মানুষ নিহত হয়েছিল।[৪৭৭] আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর রা. ও আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা.-এর মতো মহান সাহাবি নিহত হয়েছিলেন উমাইয়াদের পাপের খুঁটি এই দানবের হাতে। আনাস ইবনু মালিক রা. ছিলেন এই মানবরূপী শয়তানের হাতে নির্যাতিত।[৪৭৮] কিন্তু আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান এই সামান্য দাবিও সহ্য করেনি। বরং একে বিদ্রোহ বিবেচনা করে তার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেছে।

মূল আলোচনায় ফেরা যাক। শামবাসীর আচরণ অবশ্যই বিদ্রোহ ছিল। তারা শামে নিযুক্ত আলি রা.-এর গভর্নরকে বহিষ্কার করেছিল। শামে আলি রা.-এর কোনো ফরমান বাস্তবায়ন করতে দেয়নি। এমনকি পরে তারা মিশরও দখল করে নেয়। এসব সামনে রাখলে বোঝা যায়, তারা ছিল বিদ্রোহী। তবে তাদের নেতারা

---

৪৭৪. *আল-মুসতাদরাক আলাস সহিহাইন*, ৫৯৮১
৪৭৫. *আত-তবাকাতুল কুবরা*, ৬/২১৯
৪৭৬. *আত-তবাকাতুল কুবরা*, ৭/১৭৪
৪৭৭. *সুনানে তিরমিযি*, ২২২০
৪৭৮. *সহিহ বুখারি*, ৯৬৬, ৯৬৭, ৭০৬৮

ইজতিহাদ করেছিলেন, তাই সাধারণ বিদ্রোহীদের মতো কবিরা গুনাহগার হবেন না তারা।

সংশয় ৫ – সালিশের ঘটনা সম্পর্কে একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা হলো, আমর ইবনুল আস রা. আবু মুসা আশআরি রা.-কে বলেন, 'আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ পক্ষের দাবিদার বরখাস্ত করব।' এরপর আবু মুসা আশআরি রা. আলি রা.-কে বরখাস্ত করেন। তখন আমর ইবনুল আস রা. উঠে বলেন, 'যেহেতু আলি রা.-কে বরখাস্ত করার মাধ্যমে খেলাফতের আর কোনো দাবিদার রইল না, তাই মুআবিয়া রা.-কে খলিফা মেনে নেওয়া হোক।' এভাবে আমর ইবনুল আস রা.-এর ধূর্ত বুদ্ধির সামনে পরাস্ত হন আবু মুসা আশআরি রা.। এই বর্ণনার সত্যতা কতটুকু?

সমাধান – এই ঘটনাটি যুহরি মুরসাল সনদে এনেছেন। আগেই বলা হয়েছে, যুহরির মুরসাল গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং ঘটনাটিও গ্রহণযোগ্য নয়।

সংশয় ৬ – সালিশসংক্রান্ত বিভিন্ন বর্ণনায় দেখা যায়, আবু মুসা আশআরি রা. ও আমর ইবনুল আস রা. একে অপরকে গালাগালি করেছেন, বাজে কথা বলেছেন, এমনকি মারামারিও হয়। এসবের বাস্তবতা কী?

সমাধান – এসব বর্ণনার বেশিরভাগই এসেছে আবু মিখনাফের কাছ থেকে। সে ছিল কট্টর রাফিজি। তার এসব বর্ণনা গ্রহণযোগ্য না। কিছু বর্ণনা এসেছে যুহরি থেকে মুরসাল সনদে। যুহরির মুরসালও গ্রহণযোগ্য নয়। কিছু সনদে আবু বকর ইবনু আবি সাবুরা আছে, যার বিরুদ্ধে রয়েছে হাদিস তৈরির অভিযোগ। কিছু বর্ণনার সনদে আছে নাসর ইবনু মুজাহিমের নাম। সে ছিল কট্টর রাফিজি। সেও পরিত্যাজ্য। ফলত এসব বর্ণনার কোনো গ্রহণযোগ্যতাই নেই।
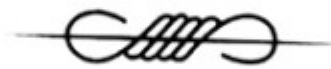
জংগে জামাল ও জংগে সিফফিন সম্পর্কে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাতের অবস্থান

এ অধ্যায়ে আমরা জংগে জামাল ও জংগে সিফফিন সম্পর্কে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাতের আলেমদের কিছু মতামত তুলে ধরব, যা থেকে বিষয়টি সম্পর্কে আমাদের অবস্থান নির্ধারণ করতে সুবিধা হবে।

১। ইমাম আবু মানসুর ইসফায়ারিনি বলেন, 'হক ছিল আলি রা.-এর সাথে। মুআবিয়া রা. ও তার সাথিরা ভুল করেছিলেন, কিন্তু এই ভুলের কারণে তাদের কাফের বলা যাবে না।'[৪৭৯]

২। কাজি ইবনু ইয়াজ বলেন, 'জমহুরের মত আলি রা. ও তার সাথিরা হকের ওপর ছিলেন।'[৪৮০]

৩। ইমামুল হারামাইন আবুল মুআল্লা বলেন, 'আলি রা. ছিলেন খলিফা। তার সাথে লড়াইকারীরা ছিল বিদ্রোহী।'[৪৮১]

৪। ইমাম বাইহাকি বলেন, 'আলি রা. যাদের সাথে লড়াই করেছিলেন তারা ছিল বিদ্রোহী।'[৪৮২]

৫। ইমাম নববি বলেন, 'তারা প্রত্যেকেই ন্যায়নিষ্ঠ (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম), তাদের পরস্পরের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ, অন্যান্য বিবাদ (আমাদের নিকট) ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। এই কারণে তাদের কেউই আদালত তথা ন্যায়নিষ্ঠ হওয়া থেকে বিচ্যুত হননি।... এজন্য আহলুল হক আলেমগণ এবং যাদেরকে ইজমা করার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য মনে করা হয়, তারা সাহাবিদের সকলের সাক্ষ্য, বর্ণনা কবুল হওয়ার ও পূর্ণ আদালাত তথা ন্যায়নিষ্ঠতার ব্যাপারে একমত পোষণ করেন।'[৪৮৩] অন্যত্র তিনি বলেন, 'আলি রা. ছিলেন হকের ওপর। মুআবিয়া রা. তাঁর সাথে বিদ্রোহ করেছিলেন।'[৪৮৪]

---

৪৭৯. *আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক*, ৩৪২

৪৮০. *আকমালুল মুওয়াল্লিম বি-ফাওয়ায়িদিল মুসলিম*, ৮/৪২২

৪৮১. *কিতাবুল ইরশাদ*, ৪৩৩

৪৮২. *আল-ইতিকাদ*, ৩৭৫

৪৮৩. *শারহুল মুসলিম*, ১৫/১৪৯

৪৮৪. *শারহুল মুসলিম*, ১৬/৪৩২

৬। ইবনু হাযম বলেন, 'এই ইজতিহাদে যদিও আলি রা. সঠিক ছিলেন, কিন্তু মুআবিয়া রা. ও আয়েশা রা. ভুল হওয়া সত্ত্বেও ইজতিহাদের কারণে একটি সওয়াব পাবেন এবং আলি রা. দুইটি সওয়াব পাবেন। তবে এ ক্ষেত্রে কারওই গুনাহ হয়নি।'[৪৮৫]

৭। হাফেজ যাইনুদ্দিন ইরাকি বলেন, 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল- জামাআতের অবস্থান হলো, আলি রা.-এর বিরুদ্ধে লড়াইকারী দলই বিদ্রোহী। যদিও অপরপক্ষ ব্যাখ্যা করছিলেন এবং নিজেদের সাধ্যমতো সত্যসন্ধানী ছিলেন। তাদের নিন্দা করা যাবে না, বরং এখানে অবস্থানরত সাহাবিদের তো ইজতিহাদের সওয়াবই মিলবে। তাদের প্রতি সুধারণা রাখা ওয়াজিব।'[৪৮৬]

৮। ইমাম আবু বকর জাসসাসও আলি রা.-এর অবস্থানকেই সঠিক বলে গণ্য করেছেন।[৪৮৭]

৯। কাজি আবু বকর ইবনুল আরাবি বলেন, 'বিদ্রোহের কারণে শামবাসী কাফের হয়ে যায়নি। তাদের সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনও ছিন্ন করা হবে না।'[৪৮৮]

১০। ইবনে রুশদ বলেন, 'আলি রা. ছিলেন হকের ওপর। তালহা ও যুবাইর রা. ছিলেন ভুলের ওপর, যদিও এতে তাঁদের ইজতিহাদ ছিল। তাঁদের ওপর যা ওয়াজিব ছিল, তাঁরা তা করেছেন, যেহেতু তাঁরা মুজতাহিদ ছিলেন।'[৪৮৯]

১১। ইমাম যাহাবিও আলি রা.-কে হকের ওপর এবং মুআবিয়া রা.-এর দলকে বিদ্রোহী বলেছেন।[৪৯০]

১২। একই ধরনের মত দিয়েছেন আল্লামা যাইলায়ি[৪৯১], শামসুদ্দিন কুরতুবি[৪৯২], বুরহানুদ্দিন মারগিনানি[৪৯৩], আল্লামা তাফতাজানি[৪৯৪], ইবনুল উজির আল-কাসিমি[৪৯৫], ফকিহ আলাউদ্দিন কাসানি[৪৯৬], ইবনু কাসির দিমাশকি[৪৯৭], ইবনু হাজার হাইসামি[৪৯৮] ও কামালউদ্দিন ইবনুল হুমাম[৪৯৯] রহিমাহুমুল্লাহু জামিআ।

---

৪৮৫. *আল-ফাসলু ফিল মিলালি ওয়ান-নিহাল*, ৪/১৫৯
৪৮৬. *তারহুত তাসরিব*, ৭/২৭৮
৪৮৭. *আহকামুল কুরআন*, ৩/২৩২
৪৮৮. *আল-আওয়াসিম মিনাল কাওয়াসিম*, ১৭২
৪৮৯. *আল-বায়ান ওয়াত-তাহসিল*, ১৬/৩৬১
৪৯০. *আল-মুকাদ্দামাতুজ জাহরা*, ১৩
৪৯১. *নাসবুর রায়াহ*, ৪/৬৯
৪৯২. *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, ১৭/৪২৩
৪৯৩. *হিদায়া*, ৩/১২৩
৪৯৪. *শারহু আকায়িদিন নাসাফিয়্যা*, ৩৭৩
৪৯৫. *আল-আওয়াসিম মিনাল কাওয়াসিম*, ২/১৭০
৪৯৬. *আল-বাদায়িউস সানায়ে*, ১/৩২৩
৪৯৭. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৪/৫৩৮
৪৯৮. *মুখতাসারু তাহরিরিল জিনান*, ২৯

শেষকথা

মুশাজারাতে সাহাবা সম্পর্কিত বিশুদ্ধ বর্ণনাসমূহের আলোকে আমরা আলোচনা সমাপ্ত করেছি। এ ক্ষেত্রে বানোয়াট, জাল ও মিথ্যা বর্ণনাগুলো আমরা পরিহার করেছি। এই আলোচনার উদ্দেশ্য হলো সাধারণ মানুষের সামনে যেন ইতিহাসের এই অধ্যায় স্পষ্ট থাকে এবং একে কেন্দ্র করে কেউ তাদের বিভ্রান্ত করতে না পারে। এই আলোচনার উদ্দেশ্য এই নয় যে, সর্বক্ষণ মুশাজারাতে সাহাবার আলোচনা করতে হবে কিংবা এই আলোচনা জিইয়ে রাখতে হবে। বিশেষ করে এই আলোচনাকে কেন্দ্র করে সাহাবিদের দোষ ধরার চেষ্টা তো কোনোভাবেই করা যাবে না। এতে নিজের ইমান-আমলই ধ্বংসের মুখে পড়বে। সতর্কতার দাবি হলো, একান্ত অপারগ না হলে ব্যাপকভাবে এই আলোচনা পরিহার করা। কারণ সব মানুষের জানাশোনা, উপস্থাপন ও বোঝার ক্ষমতা এক নয়, ফলে শয়তান সহজেই অনেককে বিভ্রান্ত করতে পারে। এজন্য সালাফদের মাঝেও আমরা দেখি, তারা এই আলোচনা বেশিরভাগ সময় পরিহার করতেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে মুশাজারাতে সাহাবা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি কুরআন কারিমের আয়াত তিলাওয়াত করেন,

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾

হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে এবং ইমানে আগ্রহী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা করো এবং ইমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি দয়ালু, পরম করুণাময়।[৫০০]

হাসান বসরিকে মুশাজারাতে সাহাবা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন, 'এটা এমন এক যুদ্ধ যেখানে নবিজির সাহাবিরা উপস্থিত ছিলেন, আমরা ছিলাম

---

৪৯৯. *ফাতহুল কাদির*, ৭/২৬৩
৫০০. সুরা হাশর, ১০

না। তাঁরা পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতেন, আমরা জানতাম না। যেসব বিষয়ে তাঁরা একমত হয়েছেন, আমরা সেসবের অনুসরণ করি। যেসব বিষয়ে তাঁরা মতপার্থক্য করেছেন, যেসব বিষয়ে আমরা চুপ থাকি।'[৫০১]

উমর ইবনে আবদুল আজিজকে মুশাজারাতে সাহাবা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'এটা এমন এক রক্ত, যা থেকে আল্লাহ আমার হাতকে পবিত্র রেখেছেন, তাহলে আমি কি আমার জবানকেও পবিত্র রাখব না!' এরপর তিনি বলেন, 'সাহাবিরা হলেন চোখের মতো। আর চোখের চিকিৎসা হলো, চোখে হাত না লাগানো।'[৫০২]

এক ব্যক্তি ইমাম আবু যুরআ রাজির কাছে এসে বলেন, 'মুআবিয়ার প্রতি আমার অন্তরে বিদ্বেষ আছে।' আবু যুরআ রাজি বলেন, 'কেন?' সে বলে, 'কারণ তিনি আলি রা.-এর সাথে অযথা যুদ্ধ করেছিলেন।' আবু যুরআ রাজি বললেন, 'মুআবিয়ার প্রভু দয়াশীল। মুআবিয়ার প্রতিপক্ষও অনুগ্রহশীল। তাদের মাঝখানে ঢুকে তোমার কী কাজ?'[৫০৩]

আল্লাহ আমাদেরকে বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে সতর্কতার সাথে পথচলার তাওফিক দিন।

---

৫০১. *তাফসিরে কুরতুবি*, ১৬/৩২২

৫০২. *আল-ইনসাফ*, ৬৬

৫০৩. *ফাতহুল বারি*, ১৩/৮৬; *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, ৫৯/১৪১

কারবালার ইতিহাসপাঠ : প্রাসঙ্গিক কয়েকটি বিষয়

ইসলামের ইতিহাসে কারবালার ঘটনা এক ন্যক্কারজনক ঘটনা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে জন্ম নেয় নানা পক্ষ-বিপক্ষ। এক জুলুমের প্রতিরোধ করতে গিয়ে জন্ম নেয় আরও জুলুমের। একদিকে আহলে বাইতবিদ্বেষী নাসেবি গ্রুপ, অন্যদিকে সাহাবাবিদ্বেষী রাফেজি গ্রুপ। একের পর এক প্রান্তিকতা জন্ম নেয় তাদের হাত ধরে। হাজার বছরের বেশি সময় ধরে দুই দলই নিজেদের চিন্তাচেতনা উপস্থাপন করে আসছে। তাই মহররম মাস এলে একদিকে দেখা যায় ইয়াজিদের এমন প্রশংসা, যাতে মনে হয় হজরত হুসাইন রা.-ই ছিলেন প্রকৃত অপরাধী; অন্যদিকে দেখা যায় ইয়াজিদের দোষ তার পিতা হজরত মুয়াবিয়া রা. পর্যন্ত টেনে নিয়ে অন্তরের সাহাবাবিদ্বেষ উগরে দেওয়া। আল্লাহ আমাদেরকে এই দুই প্রান্তিকতা থেকেই হেফাজত করুন। আমিন।

এই লেখায় আমরা কারবালার ইতিহাসের পূর্বাপর-প্রেক্ষাপট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব না ঠিক, তবে এখানে আমরা কিছু মৌলিক কথা তুলে ধরব; যা জানা থাকলে কারবালার বিস্তারিত ইতিহাস না জেনেও আমরা আকিদা-বিশ্বাসের জায়গায় সঠিক অবস্থানে থাকতে পারব। যে মৌলিক কথাগুলো জানা থাকলে ইতিহাস পাঠের সময় ইতিহাসের চোরাবালিতে আটকানোর সম্ভাবনা কম থাকবে।

অধ্যয়নের মূলনীতি

কারবালার ইতিহাস বলি বা মুশাজারাতে সাহাবার ইতিহাস বলি, তা অধ্যয়নের আগে আমাদের দুটি মূলনীতি মাথায় রাখতে হবে :

১. সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আমাদের আকিদার মূল ভিত্তি কুরআন, হাদিস ও আকিদার গ্রন্থাবলি

তাই আমরা যখন মুশাজারাতে সাহাবা বা কারবালার ইতিহাস পাঠ করব, তখন প্রথমেই এই মূলনীতি নিজেদের মাথায় বসিয়ে নেব। সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আমাদের শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ভক্তির মূল রসদ সংগ্রহ করব কুরআনুল কারিম থেকে। এ উদ্দেশ্যে প্রথমে সুরা ফাতহের ২৯, সুরা হুজুরাতের ৩, ৭, সুরা মায়েদাহর ৫৪, সুরা হাদিদের ১০, সুরা বাকারাহর ১৩, সুরা আহযাবের ২৩, সুরা আলে

ইমরানের ১৫৫, ১৯৫, সুরা বায়্যিনাহর ৮ ইত্যাদি আয়াতগুলো তাফসিরসহ পড়ে নেওয়া খুবই উপকারী হবে আশা করি।

সাহাবিদের ব্যাপারে আমাদের অবস্থান কী হবে, তা নির্ধারণ করতে আমরা হাদিসের ভান্ডারও সামনে রাখব। যেমন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে আমার সাহাবিকে মন্দ বলে, তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ!'[৫০৪] অন্য হাদিসে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমার কোনো সাহাবিকে মন্দ বলো না, তাদের কাউকে গালি দিয়ো না। কেননা, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও দান করে, তবুও তাদের এক বা অর্ধ মুদ পরিমাণ দান করার যে সওয়াব, তার বরাবরেও পৌঁছতে পারবে না।'[৫০৫] আরেকটি হাদিসে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমরা আমার সাহাবিদের সম্মান করো। কেননা, তারা তোমাদের মধ্যকার উত্তম মানব।'[৫০৬]

সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আমাদের অবস্থান কী হবে, সে ব্যাপারে আকিদা ও ফিকহের ইমামগণ নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। ইমাম মালেক রহ. বলেন, 'যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো সাহাবির বিরুদ্ধে বলবে—হোক সে আবু বকর, উমর, উসমান, মুয়াবিয়া অথবা আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম—সে যদি তাদের ব্যাপারে বলে তারা পথভ্রষ্ট ও কাফের ছিলেন, তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। আর যে তাদের এই অপবাদ না দিয়ে কেবল অন্যান্য মানুষের মতো সমালোচনা বা নিন্দা করবে, তাকে বন্দি করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা হবে।'[৫০৭]

কাজি ইয়াজ বলেন, 'কোনো সাহাবির সমালোচনা করা কবিরা গুনাহ। আমাদের (মালেকি) মাজহাবের জমহুর আলেমদের মত হচ্ছে, এই প্রকৃতির মানুষকে শাস্তি দেওয়া হবে; তবে শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যাবে না।'[৫০৮] ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল বলেন, যদি কাউকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো সাহাবির সমালোচনা করতে দেখো, তবে তার ইসলামের ব্যাপারে সংশয় পোষণ

---

৫০৪. *মুসনাদে বাযযার*, ৫৭৫৩; *আল-মুজামুল আওসাত*, ৪৭৭১, হাদিসের সনদের মান হাসান।

৫০৫. *সহিহ মুসলিম*, ২৫৪১

৫০৬. *মুসান্নাফে ইবনে আবদুর রাযযাক*, ২০৭১০; *আস-সুনানুল কুবরা*, ৯২২২, হাদিসটির সনদ সহিহ; *তাখরিজু আহাদিসিল মাসাবিহ লিল-মুনাবি*, ৫/২৫৮

৫০৭. *আশ-শিফা*, ২/১১০৭-১১০৮

৫০৮. *শরহে সহিহ মুসলিম লিন-নববি*, ১৬/৩২৬; *তুহফাতুল আহওয়াযি*, ১০/২৪৯

করো।'[৫০৯] সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেন, 'আল্লাহর রাসুলের সাহাবিদের বিরুদ্ধে কোনো কটূক্তি দ্বারা যার জবান খুলে যায়, সে প্রবৃত্তির অনুসারী।'[৫১০]

কুরআন-সুন্নাহ ও আকিদার মানদণ্ডে নিজেদের অবস্থান ঠিক করে নেওয়ার পর আমাদের সামনে এমন যত বর্ণনাই আনা হোক, যার মাধ্যমে সাহাবিদের দোষারোপ করা হয়, নিন্দা করা হয়, আমরা তা গ্রহণ করব না। কুরআন-সুন্নাহর মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরামের যে অবস্থান নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে, তাকে ইতিহাসের কোনো বর্ণনা দ্বারা পরিবর্তন ও বিকৃত করব না। অনেকে *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া* বা *তারিখে তাবারি* কিংবা *আল-কামিল* গ্রন্থের কোনো বর্ণনা সামনে পেলে সেটা দ্বারা নিজের আকিদা বদলে ফেলে। অথচ ইতিহাসের বই কখনো আকিদার মানদণ্ড হতে পারে না। বরং ইতিহাসের যে অংশ আকিদার সাথে সাংঘর্ষিক দেখা যায়, তা পরিত্যাজ্য হয়। অনেকে সাহাবায়ে কেরামকে অপরাধী প্রমাণ করতে বিভিন্ন হাদিস নিয়ে আসে, ইতিহাসের কিছু বর্ণনা নিয়ে আসে। বস্তুত এমন বর্ণনা সম্পর্কে যদি আপনার বিস্তারিত জানাশোনা নাও থাকে, তবুও ধরে নিন বর্ণনাটি তিন অবস্থার কোনো এক অবস্থায় আছে :

ক. বর্ণনাটির ভুল অনুবাদ করা হয়েছে।

খ. বর্ণনাটির সঠিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়নি।

গ. বর্ণনাটি বানোয়াট। শিয়া, সাবায়ি বা মুনাফিকদের কোনো পক্ষ এটি বানিয়েছে।

সাহাবায়ে কেরামের সম্মানবিরোধী কোনো বর্ণনা সামনে পেলে ধরে নিন এখানে এই তিনটির কোনো একটি হয়েছে। তারপর বিস্তৃত অনুসন্ধান করুন, দেখবেন আপনার ধারণাই সঠিক।

সুতরাং মূলনীতি মনে রাখুন, কুরআন-হাদিস সাহাবায়ে কেরামের যে সম্মান ঘোষণা করেছে, ইতিহাসের কোনো বর্ণনা তা বদলাতে পারে না।

২. ইতিহাসের বর্ণনা আর ইতিহাসবিদের আকিদা এক নয়

এখানে এসে আমরা অনেকেই ভুল করি। আমরা ভাবি, একজন ইতিহাসবিদ তার গ্রন্থে যা কিছু উল্লেখ করেছেন, তার সবটাই তিনি বিশ্বাস করেন এবং সেটিই তার অবস্থান। পরবর্তীকালে রচিত বিশ্লেষণধর্মী গ্রন্থের ক্ষেত্রে এ কথা সত্য হলেও শুরুর দিকে রচিত সংকলনধর্মী ইতিহাসগ্রন্থের ক্ষেত্রে এই কথা সত্য নয়। ইবনে জারির তাবারির কথাই ধরা যাক। তারিখে তাবারিতে তিনি অনেক ধরনের বর্ণনাই

---

৫০৯. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৮/১৪২

৫১০. *শারহুস সুন্নাহ লিল-বারবাহারি*, ৪৪

এনেছেন। অনেক ক্ষেত্রে একই বিষয়ে দু-ধরনের বর্ণনাও এনেছেন। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, তিনি শুধু বর্ণনাগুলো জমা করেছেন, কোনোটার সত্যায়ন করেননি। কারণ, এক বিষয়ে বিপরীতমুখি দু-ধরনের মত লালন করা নিশ্চয় সম্ভব নয়! তারিখে তাবারির ভূমিকাতেও তিনি বলেছেন, 'আমার এই গ্রন্থে এমন অনেক বর্ণনা আছে, যা পাঠক অপছন্দ করবেন। কিন্তু এগুলো আমার নিজের পক্ষ থেকে নয়, বরং আমার কাছে যেভাবে পৌঁছেছে সেভাবে উল্লেখ করেছি মাত্র।'[৫১১]

তারিখে তাবারিতে মিথ্যুক শিয়া বর্ণনাকারীদের থেকেও অনেক বর্ণনা আছে। এই বর্ণনাগুলোয় আছে সাহাবিদের ব্যাপারে অন্যায় অপবাদ। অনেকে এসব বর্ণনা সামনে এনে বলে, 'দেখুন ইমাম তাবারির মতো বিজ্ঞ আলেমও সাহাবিদের এসব অপরাধের স্বীকৃতি দিয়েছেন!'

তাদের এ ধরনের কথা শুনে ধোঁকায় পড়বেন না; বরং এ ক্ষেত্রে আপনার মূলনীতি হবে এটা যে, ইতিহাসের বর্ণনা আর ইতিহাসবিদের আকিদা এক নয়। এই মূলনীতি মনে রেখে সাহাবায়ে কেরামের সম্মানে আঘাত করা থেকে আপনি বিরত থাকবেন। তারপর বর্ণনাটি নিয়ে তত্ত্বতালাশ করতে থাকুন। দেখবেন, ওই বর্ণনা যদি আহলুস সুন্নাহর কোনো আলেমের বইপত্রে এসেও থাকে, তবেও এসেছে সংকলন হিসেবে, তার নিজস্ব আকিদা-বিশ্বাস হিসেবে নয়।

অনেকে আছে মুশাজারাতে সাহাবার ইস্যু টেনে সাহাবিদের ওপর আক্রমণ করে বেশ তৃপ্তি পায়। এমন কারও সাথে যদি আপনার দেখা হয় এবং তার সবগুলো আপত্তির জবাব আপনার জানা না থাকে, তাহলে উমর ইবনে আবদুল আজিজের মতো বলে দিন, 'আল্লাহ যে রক্ত থেকে আমার হাতকে পবিত্র রেখেছেন, আমি সেখানে আমার জবানকেও পবিত্র রাখতে চাই।' মোটকথা আমাদের ভাষ্য সহজ যে, এলোমেলো গবেষণা করে আকিদা-বিশ্বাসে পদস্খলন ঘটানোর চেয়ে আলেমদের ওপর ভরসা করে সিরাতে মুস্তাকিমের ওপর অটল থাকাই নিশ্চয় উত্তম।

প্রাথমিক এই দুটি মূলনীতি মাথায় রেখে এবার আমরা কারবালা প্রসঙ্গে প্রবেশ করব। তবে আগেই বলেছি, এখানে কারবালার বিস্তারিত ইতিহাস আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়; বরং নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়ে বিভ্রান্তি দূর করাই উদ্দেশ্য।

---

৫১১. *তারিখে তাবারি*, ১/৭

ইয়াজিদের ব্যক্তিত্ব

অনেকে মনে করেন ইয়াজিদ নির্দোষ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। কারবালার ঘটনায় তার কোনো হাত নেই, তাই তাকে নিন্দাও করা যাবে না। তবে এটি ভুল ধারণা। এ প্রসঙ্গে আলেমদের কিছু মতামত দেখা যাক। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলকে ইয়াজিদ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি জবাব দেন, 'তিনি তো ওই ব্যক্তি, যিনি মদিনায় সবকিছু করেছিলেন! তিনি সাহাবাদের হত্যা করেন এবং মদিনা লুট করেন!'[৫১২] একবার ইমাম আহমাদের ছেলে বললেন, 'অনেকে ইয়াজিদের প্রশংসা করে।' এ কথা শুনে ইমাম আহমাদ জবাব দেন, 'কোনো মানুষের মধ্যে সামান্যতম কল্যাণ থাকলেও সে কী করে ইয়াজিদের প্রশংসা করে!'[৫১৩]

ইমাম যাহাবি বলেন, 'ইয়াজিদ ছিলেন নেশাখোর, নাজায়েজ কাজে অভ্যস্ত। ছিলেন এক নাসেবি। তার জীবনে কোনো বরকত হয়নি।'[৫১৪] আল্লামা ইবনে হাজার হাইতামি ইয়াজিদকে ফাসেক, নেশাখোর ও জালিম বলেছেন।[৫১৫] ইবনে আবেদিন শামিও ইয়াজিদকে ফিসকে লিপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য করেছেন।[৫১৬] আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি বলেন, 'নিঃসন্দেহে ইয়াজিদ ফাসেক ছিলেন।'[৫১৭] হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলি থানভি রহ. বলেন, 'ইয়াজিদ ফাসেক ছিলেন।'[৫১৮] ইউসুফ বিন্নুরি লিখেছেন, 'ইয়াজিদের ফাসেক হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।'[৫১৯] শাইখুল হাদিস আল্লামা সলিমুল্লাহ খান বলেন, 'ইয়াজিদ ফাসিক হওয়ার ব্যাপারে আমার কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই।[৫২০]

ইয়াজিদ সম্পর্কে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের অবস্থান এটিই। ইয়াজিদের ব্যক্তিত্ব ও তার কৃত অপরাধসমূহ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে পড়ুন আল্লামা আবদুর রশিদ নুমানি রচিত *আকাবির সাহাবা আওর শুহাদায়ে কারবালা পর ইফতেরা* ও *ইয়াজিদ কি শখসিয়্যত আহলে সুন্নত কি নজর মে*। পাশাপাশি নাসেবি চিন্তার খণ্ডন জানতে পড়ুন হজরতের লেখা *নাসিবিয়্যত তাহকিক কি ভেস মে*।

---

৫১২. *আস-সুন্নাহ*, (৮৪৫), রচনা : আবু বকর খল্লাল।
৫১৩. *আল-মাসায়িল ওয়াল-আজবিবাহ*, ৮০, রচনা : ইবনে তাইমিয়্যা।
৫১৪ *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ৫/৫
৫১৫. *আস-সওয়ায়িকুল মুহরিকা*, ২/৬৩২
৫১৬. *রদ্দুল মুহতার*, ৩/১৬২
৫১৭. *আল-আরফুশ শাযি*, ২/২১৩
৫১৮. *ইমদাদুল ফাতাওয়া*, ৪/৪৬৫
৫১৯. *মাআরিফুস সুনান*, ৬/৮
৫২০. *মাহনামা সফদর*, ১৪, সংখ্যা : ডিসেম্বর, ২০১৫

ইয়াজিদের মনোনয়ন

প্রশ্ন ওঠে, ইয়াজিদ যদি ফাসেক ও জালিমই হয়, তাহলে হজরত মুয়াবিয়া রা. তাকে খলিফা হওয়ার মনোনয়ন দিলেন কেন? এটা কি তার স্বজনপ্রীতি নয়? এ প্রশ্নের জবাবে নিচের কয়েকটি বিষয় খেয়াল রাখা উচিত :

১. হয়তো হজরত মুয়াবিয়া রা. জীবিত অবস্থায় ইয়াজিদের বড় কোনো পাপাচার প্রকাশিত হয়নি।[৫২১]

২. খেলাফতের জন্য যেই শরয়ি শর্ত দরকার, ইয়াজিদের মধ্যে তা ছিল; তবে সে সময় তার চেয়েও যোগ্য মানুষ জীবিত ছিলেন।

৩. সদুদ্দেশ্য নিয়ে নিজের সন্তানকে পরবর্তী খলিফা নির্ধারণ করে যাওয়া নাজায়েজ কিছু নয়। তা জায়েজ। তবে এতে একদিকে থাকে অপবাদের সুযোগ, অন্যদিকে এটা নিজের ও সন্তানের জন্য বিশাল পরীক্ষা। খোলাফায়ে রাশেদিন এজন্য নিজের সন্তানদেরকে খেলাফতের জন্য মনোনীত করেননি।[৫২২]

৪. আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর, হুসাইন ইবনে আলি, আবদুল্লাহ ইবনে উমর প্রমুখ হজরত মুয়াবিয়ার জীবদ্দশায় ইয়াজিদকে বাইয়াত দেননি। মুয়াবিয়া রা.-ও তাদেরকে আর চাপাচাপি করেননি।[৫২৩]

৫. হজরত মুয়াবিয়া রা. ইয়াজিদের পক্ষে বাইয়াত দেওয়ার জন্য কাউকে ঘুষ দেননি। এ-সংক্রান্ত যে বিশুদ্ধ বর্ণনাগুলো পাওয়া যায় তার বাস্তবতা হলো, আগ থেকেই হজরত মুয়াবিয়া রা. উনাদেরকে উপহার পাঠাতেন। এটি ইয়াজিদের বাইয়াতের সাথে সম্পর্কিত নয়।[৫২৪]

কনস্টান্টিনোপ আক্রমণের সুসংবাদ ও ইয়াজিদ

অনেকে ইয়াজিদের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন, 'সহিহ হাদিসে ইয়াজিদের জন্য সুসংবাদ আছে। নবিজি বলেছেন, "যারা কনস্টান্টিনোপল হামলা করবে তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত।" আর ইয়াজিদ কনস্টান্টিনোপলের অভিযানে উপস্থিত ছিল। সুতরাং এ থেকে বোঝা যায়, আল্লাহর দরবারে ইয়াজিদের ক্ষমা প্রমাণিত। তাই তার ব্যাপারে

---

৫২১. *মুয়াবিয়া আওর তারিখি হাকায়েক*, ১১৪; *তালিফাতে রশিদিয়্যা*, ২৪২; *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ১১/৩০৮

৫২২. *মুয়াবিয়া আওর তারিখি হাকায়েক*, ১১৪

৫২৩. *আত-তারিখুল আওসাত*, ১/১০৩; *তারিখু খলিফা ইবনি খইয়াত*, ২১৩,২১৪; *আল-মুজামুল আওসাত*, ৩৮৮৫, সনদের মান হাসান; *মাওসুয়াতু আকওয়ালি ইমাম আহমাদ*, ৪/১৫৭-১৫৮

৫২৪. *তারিখে উম্মতে মুসলিমাহ*, ২/৪২৩

কোনো খারাপ মন্তব্য করা যাবে না।' কিন্তু এই বিষয়টিও স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে নিম্নের আলোচনা দ্রষ্টব্য :

প্রথমত, হাদিসে সরাসরি কনস্টান্টিনোপলের কথা বলা হয়নি। হাদিসে বলা হয়েছে, 'আমার উম্মতের যেই দল সর্বপ্রথম কায়সারের শহরে জিহাদ করবে তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত।'[৫২৫] আর কায়সারের শহর বলতে কায়সারের রাজধানী উদ্দেশ্য। নবিজির যুগে কায়সারের রাজধানী ছিল দুটি। কায়সারের এশিয়ার রাজধানী ছিল সিরিয়ার হিমস শহর, আর ইউরোপের রাজধানী ছিল কনস্টান্টিনোপল। যদি এই হাদিস দ্বারা হিমস উদ্দেশ্য হয়, তাহলে ইয়াজিদ এই সুসংবাদের অন্তর্ভুক্ত নন। কারণ, হিমস বিজিত হয়েছে হজরত উমর রা.-এর শাসনামলে, ইয়াজিদের তখন জন্মই হয়নি।[৫২৬]

যদি এই হাদিস দ্বারা কনস্টান্টিনোপলের বাহিনী উদ্দেশ্য হয়, তাহলে আমরা দেখি, কনস্টান্টিনোপলে প্রথম হামলা হয় হজরত উসমান রা.-এর শাসনামলে, যখন ইয়াজিদের বয়স মাত্র ছয় বছর এবং বালক ইয়াজিদ এই বাহিনীতে উপস্থিতও ছিল না।[৫২৭] এই হামলার পরেও কনস্টান্টিনোপলে আরও একাধিক হামলা পরিচালিত হয়, কিন্তু সেখানেও ইয়াজিদ উপস্থিত ছিলেন না।[৫২৮] ইয়াজিদ কনস্টান্টিনোপলের শুধু একটি অভিযানে উপস্থিত ছিলেন, আর সেটি হলো হিজরি ৫২ সনের অভিযান, যা কোনোভাবেই কনস্টান্টিনোপলে মুসলমানদের প্রথম অভিযান ছিল না।[৫২৯]

প্রথমত স্পষ্ট হলো, হাদিসে কায়সারের শহর বলতে যে শহরই উদ্দেশ্য নেওয়া হোক, সুসংবাদটি ইয়াজিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না।

---

৫২৫. *সহিহ বুখারি*, ২৯২৪

৫২৬. বিস্তারিত জানতে দেখুন, *ফুতুহুশ শাম*, ১২২; *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৯/৬৪৯

৫২৭. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ১০/২৪৩

৫২৮. এসব হামলার বিবরণ জানতে দেখুন, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ১০/১৩০-৩৭০; *তারিখে তাবারি*, ৪/৩০৪; *আল-ইবার*, ১/২৪; *আল মুনতাজাম*, ৫/১৯; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়ার বিবরণ থেকে জানা যায়, হজরত মুয়াবিয়া রা. একাই কনস্টান্টিনোপলে ১৬টি অভিযান পরিচালনা করেছিলেন।

৫২৯. ইয়াজিদের উপস্থিতির প্রমাণ মেলে মাহমুদ বিন রবি থেকে বর্ণিত একটি বর্ণনায়। সেখানে তিনি বলেন, আমরা কনস্টান্টিনোপলের অভিযানে ছিলাম। এই অভিযানে হজরত আবু আইয়ুব আনসারি ইন্তেকাল করেন এবং ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া ছিলেন আমাদের সেনাপতি (*সহিহ বুখারি*, ১১৮৬)। এ বর্ণনা থেকে জানা যায়, ইয়াজিদ সেই অভিযানে অংশ নেন, যে অভিযানে আবু আইয়ুব আনসারি ইন্তেকাল করেন। আর সর্বসম্মত মত হলো, আবু আইয়ুব আনসারি ৫২ হিজরিতে ইন্তেকাল করেছেন।

দ্বিতীয়ত, কোনো বিষয়ে ব্যাপকভাবে কোনো সুসংবাদ দেওয়া হলে এটি জরুরি নয় যে, সকল সদস্যের ওপর সবসময়ের জন্য তা প্রযোজ্য হবে। সুসংবাদ লাভের প্রথম শর্ত হলো এর যোগ্য হতে হবে। কেউ যদি যোগ্যতা নষ্ট করে ফেলে, তাহলে সে এমনিতেই এটি পাবে না। বিভিন্ন হাদিসে দেখা যায়, নবিজি শহিদদের জন্য নানা ফজিলত ও ক্ষমার ঘোষণা দিয়েছেন। কিন্তু হঠাৎ দেখা যায়, নবিজির সাথে জিহাদ করা ব্যক্তি সম্পর্কেও বলা হচ্ছে যে, সে জাহান্নামে যাবে![৫৩০] অর্থাৎ যতক্ষণ ফজিলতের শর্তগুলো পূরণ করা হবে, ততক্ষণ তা প্রাপ্তির অধিকার বহাল থাকবে। কিন্তু শর্ত ভঙ্গ করা হলে ফজিলতপ্রাপ্তির অধিকারও আর প্রযোজ্য হবে না। কায়সারের শহরে জিহাদ করা-সংক্রান্ত এই হাদিসের ব্যাখ্যায় আল্লামা কাসতাল্লানি লিখেছেন, 'কোনো ব্যাপক সুসংবাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অর্থ এই নয় যে, বিশেষ কারণেও সে তার আওতামুক্ত হবে না। এই কথায় কারও দ্বিমত নেই যে, নবিজি কর্তৃক ঘোষিত ক্ষমাপ্রাপ্ত হওয়ার প্রথম শর্ত হলো, তার মধ্যে ক্ষমা অর্জনের যোগ্যতা থাকতে হবে। যদি কোনো ব্যক্তি এই জিহাদের পর মুরতাদ হয়ে যায়, তাহলে সে এই সাধারণ সুসংবাদের অন্তর্ভুক্ত হবে না।'[৫৩১]

ইয়াজিদকে কোনোভাবে টেনেটুনে যদিও কনস্টান্টিনোপলের প্রথম বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়, কিন্তু তার পরের জীবনে তিনি এত বড় বড় অপরাধ করেছেন, যার কারণে অবশ্যই তিনি এই মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হবেন। ইয়াজিদের নির্দেশেই তার সেনারা মদিনা আক্রমণ করেছে, সম্পদ লুণ্ঠন করেছে, রক্ত ঝরিয়েছে, মদিনার মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তাদেরকে মদিনা ত্যাগে বাধ্য করেছে। এই অপরাধ সাধারণ কোনো অপরাধ নয়। কারণ সরাসরি নবিজির ধমকি আছে এ বিষয়ে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মদিনায় কোনো জুলুম করবে, তার ওপর আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা ও সকল মানুষের পক্ষ থেকে লানত! তার কোনো ফরজ ইবাদত কবুল হবে না।'[৫৩২] অন্য হাদিসে নবিজি বলেন, 'যে ব্যক্তি মদিনাবাসীদের ভয় দেখাবে, আল্লাহ তাকে ভয় দেখাবেন। তার ওপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও সকল মানুষের পক্ষ থেকে লানত! তার কোনো ফরজ বা নফল ইবাদত কবুল হবে না।'[৫৩৩]

হাররার ঘটনায় ইয়াজিদ যেই ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করেছেন, তার কারণে তিনি চরম অপরাধী। তার ওপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ সকল

---

৫৩০. একব্যক্তি জিহাদের একপর্যায়ে আহত হয়ে আত্মহত্যা করে ফেলে। তার ব্যাপারে নবিজি এ কথা বলেন। দেখুন, *মুসনাদে আবু ইয়ালা*, ৭৫৪৪

৫৩১. *ইরশাদুস সারি*, ৫/১০৪

৫৩২. *সহিহ বুখারি*, ৩১৭৯

৫৩৩. *আল-মুজামুল কাবির*, ৭/১৪৩

বদদুআ প্রযোজ্য। তিনি কোনোভাবেই কায়সারের শহরে যুদ্ধের ফজিলত পাবেন না। কারণ, প্রথমত তিনি প্রথম বাহিনীতে ছিলেনই না। দ্বিতীয়ত, প্রথম বাহিনীতে তিনি থাকলেও পরের জীবনে তিনি এত বড় বড় অপরাধ করেছেন, যার কারণে তিনি অবশ্যই সেই ফজিলত থেকে বঞ্চিত হবেন।

প্রসঙ্গ কারবালা : ইয়াজিদ কি নির্দোষ?

১. ইয়াজিদ সরাসরি হজরত হুসাইন রা.-কে হত্যার নির্দেশ দেননি। এটি ছিল কুফার গভর্নর উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত।[৫৩৪]

২. ইয়াজিদ যদিও সরাসরি উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদকে হত্যার নির্দেশ দেননি, কিন্তু হত্যার পর তিনি তাকে কোনো শাস্তিও দেননি। এমনকি এই হত্যার কোনো বিচারও তিনি করেননি; যা থেকে বোঝা যায়, এই হত্যার মাধ্যমে পথের কাঁটা পরিষ্কার হয়েছে ভেবে ক্ষমতালোভী পাপাচারী ইয়াজিদ মনে মনে খুশিই ছিলেন। যদি সত্যি সত্যি ইয়াজিদ উবাইদুল্লাহর ওপর অসন্তুষ্ট হতেন, তাহলে তিনি অবশ্যই এই খুনের বিচার করতেন।

৩. উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদও টের পেয়েছিলেন ইয়াজিদের মনোভাব। তিনি জানতেন, হজরত হুসাইনকে সরিয়ে ফেললে ইয়াজিদ খুশিই হবেন। তিনি আরও জানতেন, ইয়াজিদ সরাসরি নির্দেশ না দিলেও খুনের পেছনে তার মৌন সমর্থন ঠিকই পাওয়া যাবে। এজন্যই উবাইদুল্লাহর মতো একজন আঞ্চলিক প্রশাসকও কোনো অনুমতির তোয়াক্কা না করে আহলে বাইতের রক্ত ঝরাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি। বস্তুত এক অপরাধী অন্য অপরাধীর মনস্তত্ত্ব ভালো করেই বোঝে। এদিক থেকে উবাইদুল্লাহ ও ইয়াজিদ ছিলেন মানিকজোড়।

৪. ইয়াজিদ সরাসরি হত্যার নির্দেশ দেননি—এ কথা বলে ইয়াজিদের অপরাধ আড়াল করার সুযোগ নেই। কারণ তিনি খুনিদের বিচার করেননি, এ অপরাধে জড়িত কাউকে অপসারণও করেননি। সর্ব বিবেচনায় দামেশকের দরবারে বসে হজরত হুসাইনের মৃত্যুর জন্য তার আফসোস একটি 'রাজনৈতিক অভিনয়' ছাড়া আর কিছুই ছিল না, তা বেশ স্পষ্ট।

৫৩৪. *মিনহাজুস সুন্নাহ*, ৪/৫৫৭; *আল-ফাতাওয়া লি-ইবনিস সলাহ*, ২১৬
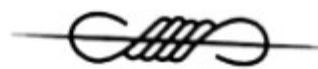
হাসান বসরির কথিত উক্তি পর্যালোচনা

ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান ও ড. এ টি এম সামছুজ্জোহা প্রণীত *ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি* ১ম পত্রের ২২৩ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, বিখ্যাত সুফিসাধক হাসান আল বসরি রহ. আমর ইবনুল আস রা.-কে ইসলামের অন্যতম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী বলে অভিহিত করেছেন।

যদিও লেখকদ্বয় এই এক বাক্য বলেই থেমে গেছেন, কিন্তু এর প্রভাব অনেক বেশি। এখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী বলা হচ্ছে আমর ইবনুল আস রা.-এর মতো মহান সাহাবিকে, আবার কথাটা বলা হচ্ছে হাসান বসরির মতো প্রথম সারির তাবেয়ির বরাত দিয়ে! ফলে বিষয়টির পর্যালোচনা করা জরুরি।

মূল আলোচনায় প্রবেশের আগে প্রাসঙ্গিক আরেকটি তথ্য জেনে রাখা ভালো। হাসান বসরির বরাত দিয়ে এমন আরেকটি তথ্য প্রচার করা হয়, যেখানে দেখা যায়, হাসান বসরি রহ. মুগিরা ইবনে শুবা রা.-কে ফিতনাবাজ বলেছেন। মাওলানা মওদুদির ব্যক্তিগত সহকারী জাস্টিস মালিক গোলাম আলি তার গ্রন্থে হাসান বসরির একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন[৫৩৫], সেখানে তিনি লেখেন,

> হাসান বসরির বর্ণনা বলে, জনগণের মধ্যে দুজন লোক ফেতনা-ফাসাদের আগুন জ্বালিয়ে দেয়, তাদের মধ্যে আমর ইবনুল আস একজন। লোকটি আমিরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বর্শার মাথায় কোরআন ঝুলানোর পরামর্শ দেয় এবং তদনুযায়ী কোরআন লটকানো হয়। ইবনুল ফারার উক্তি হলো, খারেজিদের তারা সালিস বানায়। আর এ সালিস এমন ধরনের ছিল, যার চর্চা কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। ২য় ফেতনাবাজ ছিলেন মুগিরা বিন শুবা।[৫৩৬]

---

৫৩৫. হাসান বসরির বক্তব্যটি তিনি উদ্ধৃত করেছেন আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভির মা *সাবাতা বিস-সুন্নাহ ফি আইয়ামিস সানাহ* গ্রন্থ থেকে।

৫৩৬. *খেলাফত ওয়া মুলুকিয়ত পর এতেরাজ কা তাজযিয়া*, ৩৮৫· *খেলাফত ও রাজতন্ত্র গ্রন্থের উপর অভিযোগের পর্যালোচনা*, ৩৬৪।

ধর্মীয় ঘরানার অনেকে এই বর্ণনা সামনে এনে আমর ইবনুল আস ও মুগিরা বিন শুবার মতো প্রসিদ্ধ দুজন সাহাবিকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চান। *ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি* বইয়ের লেখকরাও মূলত এই বর্ণনার প্রথম অংশকে সামনে এনেছেন। বর্ণনাটি পর্যালোচনার আগে আমরা কিছু মৌলিক আলোচনা করে ফেলি।

সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আকিদা

ইতিহাসের কোনো বর্ণনা দেখে সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আমাদের মৌলিক আকিদা জেনে নিতে হবে। দেখুন, ইতিহাসের কোনো বর্ণনা যদি আকিদার সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তাহলে প্রকৃতপক্ষে তা গ্রহণযোগ্য নয়। সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মৌলিক আকিদা ইমাম তহাবি বর্ণনা করেছেন এভাবে,

> আমরা সকল সাহাবিকে ভালোবাসি। তাদের কারও ভালোবাসায় বাড়াবাড়ি করি না, কারও থেকে নিজেদের দূরে সরাই না। যারা তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে, এবং সম্মানজনকভাবে তাদের আলোচনা করে না, তাদের প্রতি আমরা বিদ্বেষ রাখি। আমরা উত্তমভাবে সাহাবায়ে কেরামের আলোচনা করি। তাদের প্রতি ভালোবাসা আমাদের দ্বীন, ঈমান ও ইহসানের আলামত মনে করি। তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখা নিফাক, অবাধ্যতা ও কুফর মনে করি।[৫৩৭]

এবার আমর ইবনুল আস রা.-এর ফজিলত সম্পর্কে কয়েকটি হাদিস দেখা যাক—

১. নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমর ইবনুল আসের মাঝে অনেক কল্যাণ রয়েছে।[৫৩৮]

২. নবিজি আরও বলেন, মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে আর আমর ইবনুল আস ঈমান এনেছে।[৫৩৯]

৩. তালহা বিন উবাইদুল্লাহ বলেন, আমি নবিজিকে বলতে শুনেছি, আমর ইবনুল আস কুরাইশের নেককার মানুষদের একজন।[৫৪০]

---

৫৩৭. দ্রষ্টব্য : *আল আকিদাতুত তহাবিয়্যা*

৫৩৮. *মুসতাদরাকে হাকেম*, ৫৯১৬; *আল-মুজামুল কাবির*, ৫/১৮; *মুসনাদে আহমাদ*, ৮৭৬৩

৫৩৯. *সুনানে তিরমিযি*, ৩৮৪৪; *মুসনাদে আহমাদ*, ১৭৪১২; *আল-মুজামুল কাবির*, ৮৪৫

৫৪০. *মুসনাদে আবু ইয়ালা*, ৬৪৫; *মুসনাদে বাযযার*, ৯৬১

বর্ণনার উৎস সন্ধানে

হাসান বসরির এই উক্তিটি ইতিহাসের অনেক বইপত্রে এসেছে। আমাদের অনুসন্ধানে পাওয়া এমন কিছু গ্রন্থ হলো :

১. *তারিখুল খুলাফা*, ১৩১ - জালালুদ্দিন সুয়ুতি।

২. *তারিখুল ইসলাম*, ৫/২৭২ - ইমাম যাহাবি।

৩. *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, ১৭/২৭৯; ৩০/২৮৬ - ইবনে আসাকির।

৪. *সামতুন নুজুমিল আওয়ালি*, ৩/২০৬ - আবদুল মালিক বিন হুসাইন বিন আবদুল মালিক।

৫. *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ১১/৬৪৯ - ইবনে কাসির।

আমরা শুরুতেই বলেছি, সাহাবায়ে কেরামের শান-মর্যাদার সাথে সাংঘর্ষিক কোনো বর্ণনাকে চোখবুজে মেনে নেওয়ার অবকাশ নেই। কারণ, কোনো বর্ণনার মাধ্যমে সাহাবিদের কোনো দোষ বা অপরাধ সাব্যস্ত করতে হলে অবশ্যই তা সহিহ এবং মুতাওয়াতির হতে হবে। কিন্তু এবার এই বর্ণনার মান দেখা যাক।

ইবনে আসাকির ব্যতীত আর কেউ বর্ণনাটির পূর্ণ সনদ আনেননি। ইবনে আসাকিরই প্রথম এটি উল্লেখ করেন। পরে ইবনে কাসির তার বরাতে এটি উদ্ধৃত করেন। ইমাম যাহাবি পুরো সনদ উল্লেখ না করে শুধু শেষ দুজন বর্ণনাকারীর নাম ও শুরুর দিকের বর্ণনাকারীর নাম এনেছেন, যা সাধারণত বর্ণনাকে দুর্বল করে ফেলে। আর ইবনে আসাকির দুটি সনদে এটি উল্লেখ করেছেন—

১. আবুস সউদ আহমাদ বিন আলি বিন মুহাম্মদ থেকে ও আলি মুহাম্মদ বিন ওশশা রসসি থেকে।

২. আবুল কাসেম বিন সমরকন্দি থেকে।

এই তিনজনই শুনেছেন আহমাদ বিন মুহাম্মদ বিন নাকুর থেকে, তিনি ঈসা বিন আলি বিন ঈসা থেকে। তিনি আবু উবাইদ আলি বিন হুসাইন বিন হারব থেকে, তিনি আবুস সাকিন জাকারিয়া বিন ইয়াহিয়া থেকে, তিনি তার বাবার চাচা যুহার বিন হিসন থেকে, তিনি তার দাদা হুমাইদ বিন মুনহিব থেকে।

বর্ণনাটি দীর্ঘ। তাই পুরো উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকছি। বর্ণনার শুরুতে হাসান বসরি চারজন সাহাবির প্রশংসা করেন এবং পরে দুজনের নিন্দা করেন। এবার দেখা যাক, এই বর্ণনার রাবিদের সম্পর্কে জরাহ-তাদিল (হাদিস সমালোচনা) শাস্ত্রের আলেমগণ কী বলেন।

১. ইবনে আসাকিরের প্রথম বর্ণনাকারী আহমাদ বিন আলি বিন মুহাম্মদ নির্ভরযোগ্য নন। তিনি হাদিসশাস্ত্রে বেশিকিছু জানতেন না। শুধু লোকজনকে ওয়াজ-নসিহত করতেন।[৫৪১]

২. আলি মুহাম্মদ বিন ওশশা রসসি একজন অজ্ঞাত বর্ণনাকারী।

৩. ঈসা বিন আলি বিন ঈসা ছিলেন দার্শনিকদের অনুসারী। দর্শন ও যুক্তিশাস্ত্রে অতিরিক্ত মনোনিবেশের কারণে আলেমরা তার ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেছেন।[৫৪২] ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন কট্টর ইসনা আশারিয়া শিয়া তাইউল্লাহর দরবারি আলেম।[৫৪৩]

৪. জাকারিয়া বিন ইয়াহিয়া থেকে বর্ণনাকারী আবু উবাইদ আলি বিন হুসাইন বিন হারবের জন্মই হয়েছে জাকারিয়ার মৃত্যুর ২২ বছর পর। ফলে তিনি সরাসরি জাকারিয়া থেকে শোনার সম্ভাবনা নেই। তিনি অন্য কারও থেকে শুনেছেন নিশ্চিত, কিন্তু কার থেকে শুনেছেন তা উল্লেখ করেননি। অর্থাৎ, এখানে সনদের ইনকিতা (বিচ্ছিন্নতা) রয়েছে।

৫. যুহর বিন হিসন একজন অজ্ঞাত রাবি। ২০১ থেকে ২১০ হিজরির মধ্যে তিনি ইন্তেকাল করেন। তার সম্পর্কে জরাহ-তাদিলের ইমামগণ বেশিকিছু বলতে পারেননি।[৫৪৪] আর যে রাবির ব্যাপারে জরাহ-তাদিল (ভালোমন্দ) কিছুই জানা যায় না, এ ধরনের রাবিকে মাজহুলুল হাল বা অজ্ঞাত ধরে নেওয়া হয়। জমহুর আলেমগণ এ ধরনের রাবির বর্ণনাকে প্রত্যাখান করেছেন।[৫৪৫]

ইবনে আসাকির অন্য আরেকটি সনদে বর্ণনাটি এনেছেন[৫৪৬], সেখানে দুজন রাবি আবু বকর আল-মুয়াদ্দিব এবং আবু আমর বিন ইয়ুহ একেবারেই অপরিচিত। সিররি বিন ইসমাইল নামে আরেকজন রাবি মাতরুক বা পরিত্যাজ্য।[৫৪৭] পুরো বর্ণনা সমাপ্ত হয়েছে আরেকজন অজ্ঞাত ব্যক্তির মাধ্যমে, যার ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, তিনি মুগিরা থেকে শুনেছেন। অর্থাৎ, প্রতিটি সনদই খুব দুর্বল। এ ধরনের দুর্বল ও

---

৫৪১. *তারিখুল ইসলাম*, ৩৬/২৮
৫৪২. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৬/৫৫০
৫৪৩. *আল-আলাম*, ৫/১০৬
৫৪৪. *তারিখুল ইসলাম*, ৫/৭৫; *লিসানুল মিযান*, ২/৬৯
৫৪৫. *মুকাদ্দিমাতু ইবনিস সলাহ*, ১২২; *আল-কিফায়াহ*, ১৪৯-১৫০; *মারিফাতু উলুমিল হাদিস*, ২২৩
৫৪৬. *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, ৬৫/৪১০
৫৪৭. *তাকরিবুত তাহজিব*, ২২২১

অনির্ভরযোগ্য সনদ দিয়ে আমর ইবনুল আস বা মুগিরা ইবনে শুবার মতো মহান সাহাবিকে প্রশ্নবিদ্ধ করার সুযোগ নেই।

মুশাজারাতে সাহাবা সম্পর্কে হাসান বসরি রহ.-এর অবস্থান

যে বর্ণনাগুলোর মাধ্যমে আমর ইবনুল আস রা. সম্পর্কে হাসান বসরির মূল্যায়ন তুলে ধরা হয়, তা খুবই দুর্বল। লক্ষণীয় বিষয় যে, হাসান বসরি রহ. নিজেই মুশাজারাতে সাহাবা সম্পর্কে লাগামহীন মন্তব্য করা থেকে সতর্ক করেছেন উম্মাহকে। তিনি বারবার বলেছেন, এ ছিল এমন যুদ্ধ, যা সাহাবায়ে কেরাম দেখেছেন, আমরা দেখিনি। তারা বিষয়টি সম্পর্কে ভালো জানতেন, আমরা জানি না। হারিস আল-মুহাসিবি বলেন, 'আমরাও হাসান বসরির মতোই বলব, সাহাবায়ে কেরাম যা করেছেন, তারা তা সম্পর্কে আমাদের চেয়ে ভালো জানতেন।'

লেখকের পরিচিতি

তরুণ ইতিহাসবিদ, প্রত্যয়দীপ্ত লেখক, মাওলানা ইমরান রাইহান আমাদের সময়ের একজন ধীমান, বিচক্ষণ ও সময়সচেতন আলিম। মাথার মুকুট সালাফে সালেহিনের রেখে যাওয়া ইলমি আমানত, সময়োপযোগী ভাষায় এ অঞ্চলের মানুষের সামনে উপস্থাপনে তাঁর বিশেষ দক্ষতা রয়েছে। তাঁর প্রতিটি রচনায় কোমল ভাষায় দীনের প্রতি ফেরার মায়াবী আহ্বান থাকে। এই সময়ে দীনি অঙ্গনে বিশুদ্ধ ইতিহাসচর্চা ও সালাফের ইলমি তুরাসের প্রসারতা নিয়ে যারা নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন, তিনি তাঁদের পথিকৃৎ। ইতিমধ্যে প্রায় বিশটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা উপহার দিয়েছেন। চেতনা প্রকাশন এ যাবৎ তাঁর অনেকগুলো বই প্রকাশ করেছে। আল্লাহর রহমতে এ ধারা সামনেও অব্যাহত থাকবে।

ইতিহাসপ্রেমী এই তরুণের জন্ম নোয়াখালিতে, নব্বইয়ের শুরুতে। বেড়ে উঠেছেন ঢাকায়। পড়াশোনা কওমি মাদরাসায়।

‘মুশাজারাতে সাহাবা’ ইসলামের ইতিহাসের এমন এক সত্য যা বিব্রতকর, কিন্তু একে এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। এটি এমন এক স্পর্শকাতর বিষয়, যেখানে বোঝার সামান্য ভুল ডেকে আনে আকিদার বিচ্যুতি। ‘মুশাজারাতে সাহাবা’ নিয়ে আমাদের সমাজে যে আলোচনা প্রচলিত বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা ভুল তথ্য ও ভুল বিশ্লেষণে পরিপূর্ণ। ‘মুশাজারাতে সাহাবা’ সাহাবায়ে কেরামের মধ্যকার সেই ইখতিলাফ যা নবিজির ইনতেকালের ৩০ বছরের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল। যেখানে দুপক্ষেই শীর্ষ সাহাবিরা অবস্থান করছিলেন। এই ইখতেলাফের ফলে জংগে জামাল ও জংগে সিফফিন নামে দুটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যেখানে দুপক্ষেরই রক্ত ঝরে। ‘মুশাজারাতে সাহাবাকে’ কেন্দ্র করেই আকিদার ক্ষেত্রে নতুন নতুন দল-উপদল গড়ে ওঠে, পরবর্তী সময়ে যারা আকিদার বিচ্যুতি ছড়ায় সমাজে।
সাহাবায়ে কেরামের এসব মতভিন্নতা উম্মাহ কিভাবে দেখবে এবং কিভাবে গ্রহণ করবে তা জানতে হলে পড়তে হবে ‘মুশাজারাতে সাহাবা’